স্বামীর সাফল্যে স্ত্রীর ভূমিকা

সম্পাদনা ও ভাষান্তর

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ● ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রকাশক :
কে. নাথ/এস. নাথ
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৫৯

প্রচ্ছদ :
কুমার অজিত

মুদ্রক :
স্বর্ণলতা ঘোষ
ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫৭/২, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

ডেল কার্নেগীর

বই যাঁরা ভালবাসেন

তাদেরই জন্যে

"মন হইতে প্রবৃত্তির উৎপত্তি, মন যদি নিষ্কলুষ থাকে, সুখ ছায়ার মত তোমার পিছনে থাকিবে—"

শা ম.

॥ মুখবন্ধ ॥

নিজের জীবনকে যাঁরা সত্যিই প্রকৃত অর্থে রূপময় সফলতায় মুখর করে তুলতে চান, তাঁদের কাছে এমন একটি বই নিঃসন্দেহে অমূল্য এক সম্পদ হয়ে উঠবে বলাই বাহুল্য। শ্রীমতি কার্নেগী অতি সুষ্ঠু আর চমৎকার ভঙ্গীতে সেই সব রমণী ও তাদের স্বামীদের কথা বলতে চেয়েছেন যারা প্রকৃত অর্থেই সফল আর যশ অর্জন করতে পেরেছেন। কেবল তাহ-ই নয় এই সব নারী পুরুষ কর্মজীবনে সত্যিকার প্রতিভার প্রমাণ রাখতেও পেরেছেন। এই সব কর্মবীর বা দক্ষ মানুষদের জীবনের পাতা থেকেই অসংখ্য উদাহরণ রেখেছেন লেখিকা।

একটা কথা অবশ্যই পাঠকদের বলা দরকার, আর তা হল এই সব মানুষ কিন্তু আমার বা আপনার কাছে আদৌ অচেনা বা অপরিচিত কেউ নন বা কোন সুদূরের বাসিন্দাও নন। এ'রা প্রকৃত অর্থেই আমার আপনার সমাজের এবং অত্যন্ত কাছাকাছি থাকা সব মানুষ। এই সব কৃতি মানুষদের আপনারা ভালভাবেই চেনেন। আপনাদের কাছাকাছি তাই দেখতে পাবেন হয়তো মিসেস লাওয়েল টমাস, ম্যামি আইসেনহাওয়ার, এলিনর রুজভেল্ট বা এমনই সমস্ত খ্যাতির চূড়োয় ওঠা স্ত্রী পুরুষকে।

মোটকথা শ্রীমতি ডেল কার্নেগীর লেখা এই বইটি, অর্থাৎ 'স্বামীর সাফল্যে স্ত্রীর ভূমিকা' আপনার কাছে এক নতুন জীবন ধারা গড়ে তোলার উদাহরণ স্বরূপ যে হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। এই বইতেই আপনি জানতে পারবেন একজন স্বামীর সাফল্যের মূলে স্ত্রীর প্রেরণা কতখানি।

আমি তাই নিঃসন্দেহে বলতে পারি এই বইটি হাতে নিলে আপনি না শেষ করে পারবেন না।

—ডেল কার্নেগী

কেন এই বই রচনা করি

আমি বেশ কিছুকাল ধরেই শিক্ষাদান কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলাম। আমার কাজ ছিল কোন ব্যবসায়িক বিষয় সংক্রান্ত এক প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের শিক্ষাদান করা। বিশেষ করে এই শিক্ষাদান তাদের চরিত্র গঠণের কাজেই আগানো হত। এই সংক্রান্ত শিক্ষা লাভ করার ফলে ১৬ থেকে ২০ বছর বয়সী সব তরুণীরা তাদের ভবিষ্যত জীবনে আত্মনির্ভরতা লাভ করতে সক্ষম হত। তারা শিক্ষালাভ করতে আসত ব্যবসা সংক্রান্ত বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সম্পর্কে। এই শিক্ষালাভ করার ফলে কোন চাকরি লাভ করতে গেলে তা দারুণ ভাবেই কাজে আসত। তরুণীরা এর মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হত।

আমার শিক্ষাদানের মুখবন্ধ হিসেবে ওই ব্যবসা সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত মেয়েদের কাছে আমি কিছু প্রশ্ন রেখে তার উত্তর চেয়েছিলাম। শর্ত ছিল উত্তরপত্রে তারা তাদের নাম বা ঠিকানার উল্লেখ করবেন। এই শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য ছিল মোটামুটি সাধারণভাবে মেয়েদের মনের আকাঙ্ক্ষা জেনে নেওয়া।

যে সব প্রশ্ন করেছিলাম তার মধ্যে একটা প্রশ্ন রেখেছি মানে এই : 'তুমি কি কয়েক বছরের মধ্যে বিয়ে করে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে ইচ্ছুক?' আমি যে উত্তর পাই তাতে সকলেই বিয়ে করে সংসারে ঢুকতেই ইচ্ছুক বলে জানিয়েছিল।

এরপর আরো একটা প্রশ্ন রাখি এই রকম : 'তুমি কুমারী জীবন আর বিবাহিত জীবন, এ'দুয়ের মধ্যে কোন্ জীবন গ্রহণযোগ্য বলে মনে কর।' আশ্চর্য ব্যাপার হল এই প্রশ্নেরও উত্তর একই পাই, অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেকেই বিবাহিত জীবনকেই আশ্রয় করতে চেয়েছিল আর তাকেই সবচেয়ে বেশি গ্রহণীয় বলেও রায় দিয়েছিল।

মেয়েদের কাছ থেকে তাদের ওই মতামত পেয়ে আমি বেশ আনন্দিত হই তা বলাই বাহুল্য। এই মতামত জানার ফলে আমার

কাজও সহজ হয়ে গেল। আমি তাই ঠিক করে নিয়েছিলাম এই সব তরুণীদের আমি তাই বৈষয়িক বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা না করে ভবিষ্যত জীবনে তারা যাতে আদর্শ স্ত্রী হয়ে এক সফল আনন্দিত জীবনে প্রবেশ করতে পারে সেইভাবেই অনুপ্রাণিত করব। এতে আমি চমৎকার সাফল্যও লাভ করেছি। এ ব্যাপারে কণামাত্রও সন্দেহ নেই যে বেশির ভাগ মেয়েই বিবাহিত জীবন যাপন করাকে এক অবশ্য কর্তব্য আর জীবনের উদ্দেশ্য বলেই মনে করতে চায়। এছাড়াও প্রতিটি মেয়েই আবার মনে মনে আশা পোষণ করে তার বিবাহিত জীবন হবে সুখের। এরই সঙ্গে আবার মেয়েরা আশা করে তাদের স্বামীরা হবে কর্মঠ, কর্তব্যপরায়ণ আর জীবনে সফল।

এরই সঙ্গে একটা কথা আমার মনে উদয় না হয়ে পারেনি। আর সেটা হল, কোন নতুন সংসার জীবনে প্রবেশ করেছে এমন নারীর বেলায় এই সাফল্যলাভ আর উদ্দেশ্যসাধনে কাজে লাগানো কিছু নীতি কি সত্যিই কাজে আসে? আমার উত্তর হল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারে।

মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতি, মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে ডেল কার্নেগী শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা শুরু করে-ছিলেন, আমি সেখানে শিক্ষালাভ করেছি। আমার শিক্ষার বিষয় ছিল বেশ ব্যাপক। ওই শিক্ষাকালে বিশেষভাবে যে শিক্ষার উপর আমি জোর দিই তা হল স্ত্রীজাতির নানা সমস্যা সমাধান ও জ্ঞান অর্জন। এর মধ্যে বিশেষভাবে ছিল স্বামীর সাফল্য অর্জনে স্ত্রীর প্রেরণা আর ভূমিকা কি এবং কতখানি। এই বিষয়টাই আমার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি স্বামীর সাফল্য অর্জনে স্ত্রীর প্রেরণা আর প্রভাবই সবচেয়ে বেশি কাজ করে। অবশ্য এক্ষেত্রে স্ত্রীর মনোভাব ইতিবাচক অবশ্যই হতে হবে আর সেক্ষেত্রে তাকে সাধারণভাবে বেশ কয়েকটা নিয়মনীতিও মেনে চলতে হবে। আর তাই নয়, তাকে কাজেও লাগাতে হবে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়েই এই বইখানি আমি রচনা করতে প্রেরণা লাভ করি। আর আদর্শ গৃহিণী হিসেবে তরুণীদের গড়ে তোলার

উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কিছু নীতি সহ পর্যালোচনা সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধও করি। নানা তথ্য প্রমাণও আমি সন্নিবেশিত করেছি যাতে এই নিয়ম আর নীতিগুলি সাধারণ মেয়েরাও অতি সহজে বুঝে নিতে পারে ও তাদের ভবিষ্যত জীবনে কাজে লাগাতে পারে আর সফলও হতে পারে। মনগড়া বা কাল্পনিক কোন উদাহরণ না রেখে আমি এই বইতে সেই সব কৃতী মানুষের জীবনের উল্লেখই করতে চেয়েছি যারা এখনও অনেকেই আজও জীবিত। এইসব মানুষ নানাভাবে সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে উঠে জীবনে প্রতিষ্ঠিত আর প্রকৃত অর্থেই তারা সফল। আশ্চর্যের কথা, এইসব মানুষদের অনেকেই ডেল কার্নেগীর ছাত্র। এইসব কৃতী মানুষ তাঁদের জীবনের কাহিনী উপস্থাপিত করতে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন সেটা স্বীকার না করে পারছি না।

আমার পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ভেবে বসতে পারেন একমাত্র স্ত্রীরাই তাদের বিবাহিত জীবনের শুভাশুভ আর মঙ্গলের জন্য দায়ী আর এই মতটাই আমি সমর্থন করি। আমার অনুরোধ আপনারা আপাততঃ এটাই ধরে রাখুন আমি মনে করি এ ব্যাপারটি পুরোপুরিই পুরুষদের উপর নির্ভর করে। আর তারাই এর সাফল্যের জন্য পুরোদস্তর দায়ী। এখন একটা কথা আপনাদের আমি বলতে চাই, আর তা হল এই বইটিতে সেই সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে যে পথ অবলম্বন করলে যে কোন স্ত্রীই তার স্বামীর প্রেরণার উৎস হয়ে তার ধাপে ধাপে উন্নতি লাভের সহায়ক হবেন।

এখন সফলতা কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলেই মনে হয়। আমার মত হল সত্যিকার সফল মানুষ তাকেই বলা উচিত যিনি তার কাজকর্মের ফলশ্রুতিতে সকলের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারেন। এর সঙ্গে একথাও বলা দরকার, যে বা যিনি তার স্ত্রী আর পরিবারের বাকি সকলের সঙ্গে হার্দ্য সম্পর্ক বরাবর বজায় রাখতে পারেন।

আরও একটা বিষয়ের উল্লেখ না করেও পারছি না। সেটা হল অনেকে হয়তো বা বলবেন যে সব নীতি আর নিয়মকানুন দেখে আর উপলব্ধি করে আমি বইটি রচনা করেছি তার সবই হয়তো একই ভাবে

সকলের জীবনে কার্যকরী হবে না। কথাটা অস্বীকার করছি না, তবে এরই সঙ্গে জোর দিয়েই বলছি এই বই রচনা তাদেরই জন্যে যাদের মধ্যে আছে বেশ একটু বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, সামান্য রকম কিছু উৎসাহ উপকরণ আর তারই সঙ্গে মাঝারি ধরণের সামর্থ্য। এই রকম কিছু যে সব তরুণীর মধ্যে আছে তাদের শতকরা আশি নব্বই জনই এর উপকারিতা টের পাবেন। আমার কাজ হল ইচ্ছুক স্ত্রীদের সাহায্য করা। আমি এমন কথা কখনই বলতে পারি না যে এই বইয়ের নিয়ম কাজে লাগালেই কারও স্বামী একেবারে কোটিপতি, নামী মানুষ হয়ে উঠবেন। এ কাজটা কঠিন হলেও অবশ্য অসম্ভব নয়, তবে এর কোন সহজ পথ নেই। উন্নতির শিখরে ওঠা অপ্রশস্ত বলতেই হয়।

আমার এ বই, মনে রাখবেন বিশেষ করে তাদের জন্য; যে সব দম্পতির মধ্যে মনোভাবের বিভিন্নতার জন্য মনোমালিন্য লেগে থাকে। জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, তাই স্বামী স্ত্রীর মতবিরোধ দূর করে দুজনের গ্রহণযোগ্য পথ আবিষ্কারের জন্য এই বইয়ে বেশ কিছু উপদেশ পেতে পারেন। এ বই আপনাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। সুখী দাম্পত্য জীবন পেতে যারা সত্যিকার আগ্রহী, যারা দুজনের জীবন মধুরতর করতে চান, দুজনের ভালবাসা চিরকাল অটুট রাখতে চান। তাদের সাহায্যের আশা নিয়েই এই বইয়ের প্রতিটি পাতা লেখা হয়েছে।

এই বইয়ে তাই যে সব উপদেশ, কৌশল আর নিয়ম কানুনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি বারবার আপনাকে পড়তে অনুরোধ করি। আর শুধু পড়লেই হবে না, সেগুলো আপনার জীবনে কাজেও লাগাতে সচেষ্ট হতে হবে। মনে রাখবেন এর প্রতিটিই সত্যিকার জীবন থেকে নেওয়া। হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ এগুলো থেকে উপকৃত তাই আপনারও না হওয়ার কারণ নেই।

এই বই আপনাকে জানিয়ে দেবে স্বামীর উন্নতিতে আপনি কেমন কিভাবে প্রেরণাদাত্রী হতে পারেন। এই বই আপনাকে শিখিয়েও দেবে স্বামীকে আপনি ঢের বেশি কর্ম তৎপর আর কর্তব্যপরায়ণ কেমন করে তুলবেন। কিভাবে স্বামীর মনেরও পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন।

—ডরোথি ডেল কার্নেগী

প্রথম অধ্যায়

।। এক ।।

সাফল্যের প্রথম সোপান

দুজন মানুষের কাহিনী দিয়েই শুরু করা যাক। ১৯১০ সালের নিউইয়র্ক শহর। দুই বন্ধুকে দেখা গেল সেখানকার এক এলাকায় কম ভাড়ায় একখানা ঘর ভাড়া নিতে। বন্ধুদের একজন হলেন মিসোরী থেকে আসা ডেল কার্নেগী, আর অন্যজন তাঁর বন্ধু ম্যাসাচুসেটস থেকে আসা এক গ্রামের ছেলে জে. এফ হুইটনি। কার্নেগী আমেরিকার একাডেমী অব ড্রামাটিক আর্টসের প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ছিলেন।

ডেল কার্নেগীর কাছে আমি তাঁর ওই বন্ধু হুইটনির জীবন কাহিনী শুনেছি। হুইটনি তার জীবন শুরু করেছিলেন সামান্যভাবে এক কৃষি খামারে। সামান্য ওই কাজ করেও কিন্তু হুইটনির উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিসীম। তিনি ভাবতেন একদিন মস্ত এক প্রতিষ্ঠানের প্রধান হবেন।

কাজের আশায় ঘুরে ঘুরে হুইটনির শেষ পর্যন্ত একটা কাজ জুটেও গেল। সেটা কোন এক বিরাট খাদ্য সামগ্রীর দোকানে কর্মচারীর চাকরি। হুইট ওই কাজে মন প্রাণ ঢেলে উন্নতির চেষ্টা চালালেন, আর এজন্য মধ্যাহ্ন ভোজের সময়টা কাজে লাগাতেন। ওই সময়টায় হুইটনি পাইকারি জিনিস বিক্রি দপ্তরের কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাইতেন। একাজ তিনি করতেন কোন ধন্যবাদ বা পারিশ্রমিক না পেয়েই। এতে একদিন তাঁর যোগ্যতার দামও মিলে গেল। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ হুইটনির স্মরণাপন্ন হতে চাইতেন। এর পুরস্কারও তিনি পেলেন প্রধান সেলসম্যান হয়ে, তারপর হয়ে উঠলেন ডিপার্টমেন্টের প্রধান আর সেখান থেকে জেলার বিক্রয় অধিকর্তা। নিজের পরিশ্রম আর কৃতিত্বের ফলশ্রুতিতে ধাপে ধাপে এই ভাবেই হুইটনি একেবারে শিখরে উঠতে পেরেছিলেন।

হুইটনির জীবনে সব পথই কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি। অন্য এক প্রতিষ্ঠানে

কাজ করার সময় তিনি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি লাভ করতে পারেন নি যেহেতু কোম্পানীর অধিকর্তার আত্মীয়-স্বজনেরই তাতে ছিল একচেটিয়া অধিকার। অন্য এক প্রতিষ্ঠানেও তার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। সেখানে দীর্ঘকাল কাজ করার আগে পদোন্নতি ঘটত না। হুইটনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী, অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

হুইটনির উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেয়নি। বীচনাট প্যাকিং কর্পোরেশন তাঁকে তার যোগ্যতার মূল্য দিল। সেখানকার প্রেসিডেন্টের পদও তিনি তাই অলঙ্কৃত করতে সক্ষম হন। এরপর হুইটনি নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্লু মুন চীজ কোম্পানী।

হুইটনি এইসবের আগের ঘটনা তার সহপাঠিকে প্রায়ই বলতেন একদিন তিনি বিরাট কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হবেন। কথাটা মোটেই তার কাছে ফাঁকা বুলি ছিল না। নিজের উপর অসামান্য বিশ্বাস ছিল তার। জীবনের স্থির লক্ষ্য তার সামনে ধ্রুবতারার মতন বর্ণনাজ্জ্বল করতে চাইতো। এই আশাই তাকে জুগিয়েছিল বড় হওয়ার শক্তি।

জে এফ. হুইটনির এই অসামান্য খ্যাতি আর সাফল্যের মূল কথাটা কি? বহু মানুষই যেখানে ব্যর্থ হয়ে যান? তার মত কঠোর পরিশ্রম তো বহু মানুষই করতে পারেন, তবু তার সাফল্য এসেছিল কেন? এই রহস্যের মূল হল তিনি যে কাজ করতেন হৃদয় দিয়েই তাকে গ্রহণ করতেন। এর জন্য প্রচলিত শিক্ষার প্রয়োজন হয়নি। তার সামনে ছিল তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তিনি কোথায় যেতে চান তিনি জানতেন। নিত্য নতুন কাজে তার উৎসাহ ছিল অপরিসীম। কোন কাজকেই তাই তিনি তুচ্ছ ভাবতে চাইতেন না।

যে কোন মানুষের জীবনে উদ্দেশ্যহীনতা এক অভিশাপ। এই ধরণের উদ্দেশ্যহীনতাই আসলে ব্যর্থতার মূল। উদ্দেশ্যহীন মানুষেরা লক্ষ্য সামনে না রেখেই লক্ষ্যহীনভাবে এগিয়ে যেতে চায়, বিয়ে করে, কিন্তু এর পরিণতিতে তারা শুধু ব্যর্থতার গ্লানিই বয়ে বেড়ায়। এদের সামনে হাতছানি দেয় এক চরম অনিশ্চয়তা। এদের একমাত্র অভাব উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর সাফল্যের সুনির্দিষ্ট কোন পথ।

নিউ ইয়র্ক শহরে কর্মজীবিদের নানা পরামর্শ দেবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর নাম কেরিয়ার বেঞ্জিং ক্লিনিক। এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন মিস অ্যানী হেউড। এখানে যে সব চাকুরীজীবি নিজেদের কর্মজীবনে সন্তুষ্ট নন তাদের নানা পথের সন্ধানও দেওয়া হয়। চাকরীর নানা সমস্যা নিয়ে মিস হেউডের সঙ্গে আমি প্রচুর আলোচনা করেছি আর সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা কাটিয়েছি। মিস হেউড আমাকে বলেছেন তাঁর কাজের একমাত্র অসুবিধা হল তার ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগই জানেনা তারা কি চায় বা তাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই বা কি। শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি তাই প্রথমেই তাদের সঙ্গে যে আলোচনা করতে চান তা হল তাঁদের মনোগত ধারণার একটা বেশ পরিষ্কার ছবি ফুটিয়ে তোলা। যেমন, যে কোন তরুণী যখন বিয়ে করে স্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে তার প্রথমেই জানা দরকার তার স্বামী জীবনে কি চান। এ সম্পর্কে স্ত্রীর মনে একটা স্পষ্ট ছবি থাকা চাই-ই। এর পরের কাজটি হবে স্ত্রীকে স্বামীর সব কাজকে সমান করে তোলার জন্য সহযোগিতা করে যাওয়া। নিজেকে এর জন্য যোগ্যও করে তুলতে হবে।

'ম্যারেজ গাইড' নামে একখানা বই রচনা করেন স্যামুয়েল ও ক্রাথার কিং। তাঁরা বইটিতে বলেছেন যে কোন স্বামী স্ত্রীর সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য একটাই নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা চাই। এই লক্ষ্য বাসগৃহ তৈরি থেকে দেশভ্রমণ বা যা কিছু হতে পারে। উদ্দেশ্য যাই হোক, দুজনের মনে একই পরিষ্কার প্রতিচ্ছবিটি জাগরূক থাকা চাই-ই। স্যামুয়েল ও ক্রাথার কিংয়ের বক্তব্য হল আসল কাজ হল কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করা আর সেই লক্ষ্যকে পুরোপুরি রূপদান করা। স্বামী স্ত্রী, দুজনকেই একই চিন্তায় বিভোর হয়ে উদ্দেশ্যটি সফল করার চেষ্টা করতে হবে। কোন কারণে ব্যর্থতাও যদি আসে তবে তার দায় ভাগও কিন্তু দুজনকেই সমানভাবে বহন করতে হবে। এতেই আসবে সমব্যথীতার সমচিন্তার সুযোগ আর সুখ।

এই রকম একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। আমেরিকায় কানসাস শহরের মিঃ ও মিসেস উইলিয়াম এল গ্রাহামের সাফল্যের মূলে

এই ব্যবস্থাই চমৎকার কাজ করে। কানসাসে মিঃ গ্রাহামের নিজস্ব একটি বড় প্রতিষ্ঠান রয়েছে, নাম গ্রাহাম অয়েল কোম্পানী। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সেই মিঃ গ্রাহাম তেলের ব্যবসাতে অগাধ সম্পত্তি অর্জন করেছেন। বিল্ গ্রাহাম ও তাঁর স্ত্রী মার্জোরি গ্রাহাম সৌভাগ্যবানও, তাঁদের ছটি সন্তান, চমৎকার বাড়ি, অর্থ স্বাস্থ্য কোন কিছুরই অভাব নেই। চল্লিশ বছরের মধ্যেই মানুষ যা চায় তাই তারা পেয়েছিলেন। গ্রাহাম দম্পতিকে বহুদিন ধরেই জানতাম। একদিন বিল গ্রাহামকে আমি তাঁর সাফল্যের গোপন রহস্যটি কি জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'ভবিষ্যতের জন্য আগেভাগে করা পরিকল্পনা আর কাজ করে যাওয়া।' তিনি ও তাঁর স্ত্রী বিয়ের পর কমিশনে ঘর বাড়ি সম্পত্তির বেচাকেনার কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁদের অর্থ তেমন ছিলনা। যা ছিল তা হল সফলতা লাভ করার ঐকান্তিক আগ্রহ, কঠিন পরিশ্রম করার মানসিকতা। এইগুলো মূলধন করেই তারা কাজ করে যান। এই কাজের জন্য তাদের অফিস ঘর বলতে ছিল অব্যবহৃত একখানা ছোট্ট কামরা মাত্র, তাও অন্য একজন ব্যবসায়ীর। মার্জোরী অফিসের কাজ কর্ম দেখার ফাঁকে গ্রাহাম বাইরে কাজ করতে যেতেন। আয় তখন তাঁদের একেবারেই কম ছিল, অত্যন্ত বুঝেসুঝেই তাদের চলতে হত।

একটু একটু করে ভাগ্যলক্ষ্মী তাদের প্রতি যখন প্রসন্ন হলেন, গ্রাহাম দম্পত্তি তখন নিজেরাই বাড়ি কিনে বিক্রি শুরু করেন। তৈরি করেও বিক্রি শুরু করেন তারপর। ওতে গ্রাহাম দম্পতি প্রচুর উন্নতি করেন। এ কাজে বরাবর লেগে না থেকে তারা তেলের ব্যবসাতেও হাত লাগান। উন্নতি আর এরপর বাঁধ মানেনি। গ্রাহাম অয়েল কোম্পানী হয়ে উঠেছিল উপকথার সামিল। এখানেই থেমে থাকার মানুষ নন গ্রাহাম দম্পতি। আরও এগিয়ে চলাই তাঁদের ব্রত। তাই গ্রাহাম পরিবার ভাবতে চাইছিলেন বৈদেশিক ব্যবসার দিকে হাত বাড়াবেন।

গ্রাহাম দম্পতি সাফল্যের মূল কথা ছিল এই—কোন কাজ বা পরিকল্পনা হাতে নিলে তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো, যাতে নিশ্চিত

সাফল্য আছে। এই কাজে তাঁরা তাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনা আর পরিশ্রমকে উজাড় করে দিতেন। মিসেস গ্রাহাম বলেছিলেন তাঁর স্বামী যখন কোন নতুন পরিকল্পনা কাজে লাগানোর কথা ভাবতেন তখনও অন্য কোন পরিকল্পনা আবার তাঁর মাথায় থেকে যেত। এই ধরণের পরিকল্পনার কাজ করে চলায় তাঁর জীবনে সাফল্য আর নতুন নতুন পথও খুলে গিয়েছিল। গ্রাহাম দম্পতির জীবন সাফল্যলাভ করেছেন এমন আদর্শ দম্পতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। তাঁদের জীবন থেকেই বোঝা যায় ইচ্ছা আর পরিশ্রম যে কোন মানুষকে তার উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করে থাকে। এর মধ্যে আরও রয়েছে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই আসল কাজ, এর ফলে সফলতার কাছাকাছি পৌছান সম্ভব তাতে কোনই দ্বিমত থাকতে পারে না।

'সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা দুশ্চিন্তার এক প্রধান কারণ', কথাটা বলেছিলেন কলাম্বিয়া কলেজের ডীন হার্বার্ট ই. হকস্। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে হতবুদ্ধি হলে দুশ্চিন্তা ছাড়াও যা হয় তা হল এটাই সাফল্যের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা। এই কারণে বলতে বাধা নেই প্রত্যেক স্ত্রীর জানা দরকার তাদের স্বামীর কাজে সাফল্যলাভ করার পথে তাদেরই প্রেরণা জোগান দিতে হবে যাতে তাঁর স্বামী জীবনের স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারেন।

সাফল্যের অর্থ আপনার বা আপনার স্বামীর কাছে কি হবে? এর অর্থ কি শুধু বিপুল সম্মান? যশ? প্রচুর অর্থ? নির্বিঘ্ন জীবন? ক্ষমতার আশ্লেষ? অথবা খুব সন্তুষ্টি জনক কোন কাজ?

এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে আপনাকে আর আপনার স্বামীকেই। এর কারণ হল সাফল্যের অর্থ এক একজনের কাজে এক এক রকম। আপনাদের ধারণা অনুযায়ীই এগিয়ে যেতে হবে আপনাদের। স্বামী স্ত্রী এই দুজনের মিলিত আকাঙ্ক্ষাই, জেনে রাখবেন আপনার স্বামীর উন্নতির পথ নির্দেশ করতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামীর কর্তব্য হল কোন সুদূর প্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। একাজে আপনি দিতে পারেন প্রেরণা।

স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা, জেনে রাখা উচিত শুধু প্রেমের প্রসন্ন দৃষ্টির মধ্যেই থাকেনা—এক্ষেত্রে পরস্পরের হৃদয়কে, মনকে জানতে চাওয়াই হল আদর্শ দম্পতির সবসেরা প্রেম আর ভালবাসা। এর চেয়ে ভাল পরামর্শ বোধ হয় আর হবে না। কথাটা অবশ্যই আমার নয়, এটি বলেছিলেন একজন বিখ্যাত মানব প্রেমিক মানুষ।

অতএব মনে রাখবেন, কৃতকার্য হওয়ার প্রথম পদক্ষেপটি হবে স্বামীকে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে সাহায্য করা।

॥ দুই ॥

কোন কাজে সফল হলে অন্য কাজে নজর দিন

এক জনের কাহিনী দিয়েই এবার শুরু করি। তার নাম নিক আলেকজাণ্ডার। আলেকজাণ্ডারের প্রথম আর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কলেজের শিক্ষায় সাফল্যলাভ করা। ছেলেটির দুর্ভাগ্য যে ছোটবেলায় অবহেলায় এক ছোট অনাথ আশ্রমেই বেড়ে উঠেছিলেন। সেই অনাথ আশ্রমে ছোট শিশুদেরও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করেই জীবন কাটাতে হত। এর বদলে তাদের দুবেলা পেট পুরে খাওয়াও জুটতো না, যা জুটতো তাও খাদ্য নামের অযোগ্য। আলেকজাণ্ডারের লেখাপড়ায় যেমন আগ্রহ ছিল তেমনই ছিল ধীশক্তি। কিন্তু দারিদ্র এমন অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছিল ওর জীবনে যে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে হাই স্কুলের শিক্ষা শেষ হতেই তাকে জীবিকার জন্য চাকরি করা শুরু করতে হয়। একরকম বাধ্য হয়েই সে এক দর্জির দোকানে সেলাই করার চাকরি নেয়। ওই দর্জির দোকানে তাকে অমানুষিক পরিশ্রম করে চলতে হত। দীর্ঘ সময় কাজ করতে হলেও বিনিময়ে পারিশ্রমিক যা জুটত তা নেহাতই সামান্য। দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে নিক আলেকজাণ্ডার ওই নরকযন্ত্রণা ভোগ করে চলেছিলেন। শোচনীয় ওই জীবন যন্ত্রণাতেও কিন্তু সে ভেঙে পড়ে নি। এরপর ভাগ্য তার প্রতি মুখ তুলে চাইতে দর্জির দোকানটি সরকারী আদেশে তাদের মাইনে বাড়াতে আর কাজের সময় কমাতে বাধ্য হয়।

নিক আলেকজাণ্ডারের এরপর এক কিশোরীর সঙ্গে বিয়েও হয়। নিকের মনের কোণায় সামান্য এক বেদনাবোধ থেকে গিয়েছিল—সেটা হল কলেজে শিক্ষালাভ করার সুযোগ না পাওয়া। নিকের স্ত্রী মনে মনে ঠিক করে নেয় যে ভাবেই হোক স্বামীর জন্য ও কলেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। কাজটা বেশ কঠিন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৩২সালে অভাবিত একটা সুযোগ এসে গেল তরুণ দম্পতির জীবনে। একটা নিজস্ব ব্যবসা গড়ে তোলার সুযোগ। তরুণ আলেকজাণ্ডার দম্পতি বেশ ঝুঁকি নিয়েই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিজেদের সঞ্চিত সামান্য টাকা মূলধন করে দু'জনে এবার গড়ে তোলে আলেকজাণ্ডার রিয়েল এষ্টেট কোম্পানী ১০০ নম্বর ওয়েষ্ট প্রভিন্স স্ট্রীটে।

মাত্র দু'বছরেই ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল দুজনের। আলেকজাণ্ডার দম্পতি প্রভুর লাভের মুখ দেখতে আরম্ভ করে দেয়। আলেজাণ্ডারের স্ত্রী থেরেসা তার আগের ইচ্ছা ভুলে যেতে পারেনি, তাই তার ইচ্ছায় আলেকজাণ্ডার আবার নতুন উদ্দ্যমে শুরু করে তার কলেজের শিক্ষা।

কলেজের শিক্ষা নতুন উদ্দীপনাই এনে দিয়েছিল আলোকজাণ্ডারের মধ্যে। থেরেসার তো সুখের সীমা পরিসীমা ছিল না। দুজনে পূর্ণ উদ্যমে আবার ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নতুন পরিকল্পনা নিতেও দুজনের দেরী হল না। সমুদ্রের কাছে ওদের নতুন একটা বাড়ি গড়ে তোলার স্বপ্ন সফল হতে দেরী হল না। সমস্ত স্বপ্নই তাদের সফল হল। জীবনের অনেক পাওয়াই হাতের মুঠোয় পেয়ে আলেকজাণ্ডার দম্পতি কি ওখানেই থেমে গিয়েছিল ভাবছেন? মোটেই তা নয়। ইতিমধ্যে তাদের ছোট্ট ফুটফুটে একটি মেয়েও হয়েছিল। দুজনেরই একান্ত বাসনা মেয়ের শিক্ষার সব ব্যবস্থা করা। বাড়ি করতে গিয়ে যে ধার হয়েছিল সেটাও শোধ করার কথা। আলেকজাণ্ডার দম্পতি তাই নিজেদের বাড়ির মধ্যে আলাদা ভাগ করে ভাড়া দিয়ে সমস্যা মিটিয়ে ফেলল।

আলেকজাণ্ডার দম্পতির জীবন সত্যিই আদর্শ পরিশ্রমী কোন স্বামী স্ত্রীরই জীবন। দুজনেই ওরা সুখী। ওদের সাফল্যের মূল কথা একটাই—নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়া আর

কোন কিছুতেই ভেঙে না পড়া। দুজনে সত্যিই যেন জর্জ বার্নার্ড শ'র এই কথাটি মেনে চলেছে 'আমি কৃতকার্য ব্যাপারটাকে নেহাতই ভয় করি। কৃতকার্য হওয়া মানেই সংসারে নিজের কাজ শেষ করে ফেলা। যেমন স্ত্রী মাকড়সা মিলন শেষ হলেই পুরুষ মাকড়সাকে গিলে ফেলে। আমি অবিরাম বেঁচে থাকা ব্যাপারটাই পছন্দ করি---অতএব আমার দরকার হল অনবরত সামনের দিকে তাকানো, পিছনের দিকে মোটেও না।' পৃথিবীতে এমন বহু লোক আছে যাদের জীবনে কোন রকম নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। তারা মোটের উপর অর্ধেক জীবনই যাপন করে চলে। এইসব মানুষেব কোন পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধনও ঘটে না। গতানুগতিক জীবন যাপনই তাদের জীবন দর্শন। আবার অন্যদিকে যারা সব সময় সুযোগকে আঁকড়ে ধরতে পারে, জীবনকে সঞ্জীবিত করা তাদের পক্ষেই সম্ভব। এইসব মানুষের একটা নির্দিষ্ট জীবনবেদ আর লক্ষ্য থাকে।

সরকার যেমন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করে কাজ করার ব্যবস্থা করেন মানুষের জীবনেও সেই ধরণের পঞ্চবার্ষিকী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সাফল্যের কাজ সহজ করে তোলে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনা চাই। যে কোন মানুষ তাই ধরা যাক, এই রকম পরিকল্পনা নিতে পারে যেমন প্রথম পাঁচ বছরে লাভ করতে হবে কলেজের শিক্ষা, আর চাকরিতে উন্নতির চেষ্টা। পরের দশ বছরেব কাজ হবে কোন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বা কর্ণধার হওয়ার চেষ্টা।

আসল কথাটা হল পরিকল্পনাবিহীণ কোন কাজে বা জীবনেও সহজে সফল হওয়া কখনই সম্ভব হয় না। যে কোন মানুষেরই সামনে থাকা চাই ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য আর তা সফল করার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা।

বাইবেলে লেখা আছে এই রকম একটা উপদেশও, সেটা এই রকম 'যে কাজেই হাত দাও সেই কাজেরই পরিণতির কথা স্মরণে রাখতে ভুলো না, তাহলে অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।' যে সত্যিকার সফল মানুষ তারও ধর্ম এটাই—কোন কাজে সফল হলেই

অন্য একটি কাজে মন দেওয়া। অতএব যে কোন স্ত্রীরই মনে রাখা উচিত তাঁর স্বামী কোন কাজে সফল হওয়া মাত্রই অন্য কোন কাজে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

॥ তিন ॥

উদ্দীপনা আর স্ত্রীর কর্তব্য

প্রয়াতঃ ফ্রেডারিক উইলিয়ামসন কোন এক সময়ে নিউ ইয়র্ক সেণ্ট্রাল রেলওয়েজে চেয়ারম্যান পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এক বেতার সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় কোন ব্যবসাতে কৃতকার্যতার গোপন রহস্যটি কি?

এর উত্তরে উইলিয়ামসন বলেছিলেন, 'আমি আমার সারা জীবনেই মনে রাখব যে কোন কাজে কৃতকার্য হতে গেলে চাই একমাত্র উদ্দীপনা। এই উদ্দীপনাই হল সাফল্যের গোপন রহস্য। যে কোন কাজে কৃতকার্য হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করে দুজন বিভিন্ন মানুষের বাস্তব দক্ষতা, শক্তি আর বুদ্ধিবৃত্তির পার্থক্যের উপর। এটা কোন সুদূরপ্রসারী ব্যাপার বা প্রচণ্ড ক্ষমতার ও নয়। কোন সমান যোগ্যতাবিশিষ্ট দুজন মানুষকে ধরা যাক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হল। প্রতিযোগিতার শেষে নিশ্চয়ই দেখা যাবে দুজনের মধ্যে যে লোকটি সত্যিকার উদ্যোগী জয়লক্ষ্মী তারই করতলগত। পাল্লা তারই দিকে ঝুঁকবে। একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে যিনি খুবই উদ্যোগী পুরুষ তিনি যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিসম্পন্ন মানুষও হন তাহলেও তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা বিশিষ্ট অথচ উদ্যোগহীন কাউকে সহজেই প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবেন।'

এখন একটা কথা পরিষ্কারভাবেই উপলব্ধি করা দরকার, আর তা হল উদ্যোগ ব্যাপারটা কি? উদ্যোগ মানেই হল নিজের কর্মক্ষমতার উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখে কোন কাজে উৎসাহের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। এক্ষেত্রে কাজ হয়তো কারও কাছে সামান্য বা অসামান্য হতে পারে, কোন লোকের কাছে কাজটিই আনুষঙ্গিক বলে মনে হওয়া চাই—সে

কাজ যতই কষ্টসাধ্য বা বা সহজ হোক না কেন। আমেরিকার মনীষী রালফ ওয়ালডো এমার্সন বলেছিলেন: পৃথিবীর কোন মহৎ বা শ্রেষ্ঠ কাজ উদ্যোগ ছাড়া সম্পন্ন হয়নি। এই কথাটির মত সত্যি আর কিছুই নয়। যার মধ্যে উদ্যোগ দেখা যায় তারই কাজে আসে উদ্দীপনা। উদ্যোগ যেমন উদ্দীপনার জন্ম দেয় সেই রকমই এর ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় সাফল্য।

এই বইতে তাই প্রত্যেক স্ত্রীকে এই কথাই জানাতে চাই যে অন্য কিছু না পেলেও যা আপনি পেতে পারেন তা হল আপনার স্বামীকে কৃতকার্যতার দিকে চালনা করার, তাঁর কাজে উদ্দীপনা সৃষ্টি করার প্রেরণা। আপনার ভূমিকা একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে তাই অনন্য। মনে রাখবেন উদ্যোগই একমাত্র গুণ যে গুণ সমস্ত সফল মানুষের মধ্যেই রয়েছে। এক্ষেত্রে কাজের দাম বা চরিত্র আদৌ মুখ্য নয়— আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত কাজটি উদ্দীপনা নিয়ে সুসম্পন্ন করা।

উদ্দীপনা অনেকটা সঞ্জীবনীর মত। যে মানুষের মধ্যে উদ্দীপনার বীজ সুপ্ত থাকে সে কাজে উদ্দীপনাবোধ করলে দুর্দম হয়ে ওঠে, কাজটি সমাধা করার জন্য তার আবেগ বাধা মানতে চায় না। এ বিষয়ে অতি জনপ্রিয় অধ্যাপক উইলিয়াম ফ্লেকস তাঁর বিখ্যাত 'দি একসাইটমেণ্ট অব টিচিং' গ্রন্থে লিখেছেন, 'শিক্ষকতার কাজ আমার কাছে যে কোন কলাবিদ্যা বা ব্যবসার চেয়ে অনেক অনেক প্রিয়। শিক্ষকতার মধ্যে আমি মানসিক উত্তেজনার খোরাক পাই। আমার কাছে শিক্ষাদান ব্যাপারটি শিল্পীর ছবি আঁকা গায়কের গান গাওয়া আর কবির কাব্য রচনা করার মতই প্রিয়। শিক্ষাদান করতে আমি আনন্দ পাই। ভোর বেলা বিছানা ছেড়ে ওঠার পর আমি এক অপরূপ আনন্দে আমার ছাত্রদের স্মরণ করতে চাই। তাই আমি মনে করি আর বিশ্বাস করি জীবনে কৃতকার্য হওয়ার প্রধান উপায় নিঃসন্দেহে নিজের কাজে দৈনন্দিন আগ্রহ বজায় রাখা, শক্তি অর্জন করা আর এই কাজের মধ্যেই উদ্দীপনা খুঁজে পাওয়া।'

একজন আদর্শ গৃহিণী হিসেবে তাই আপনার কর্তব্য হবে আপনার

স্বামীর জীবনে, তার কাজের মধ্যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা খুঁজে পাওয়ার ব্যবস্থা করে যাওয়া। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই গৃহিনী হিসেবে আপনি প্রশ্ন করবেন 'কিভাবে সেটা করবেন।' খুবই বাস্তব সম্মত প্রশ্ন স্বীকার করছি। এ বিষয়ে পরের পরিচ্ছেদে কিছু নির্দিষ্ট সংকেত আপনাদের সামনে রাখব। এখানে কেবল বলতে চাই আপনার কাজ হবে স্বামীর কাজ সম্পর্কে জেনে তাকে সেই কাজে উদ্যোগী হয়ে উঠতে। যে কোন প্রতিষ্ঠানে উদ্যোগী কর্মী মেলা সত্যিই কঠিন। এ ব্যাপারটা ভাল ভাবেই জানেন যারা নিয়োগকর্তা। তাই আপনার স্বামীর মধ্যে উদ্দীপনার রেশ জাগিয়ে তোলা সত্যিকার কার্যকরী ভূমিকা হতে পারে। 'চার্লস্ সামশর উলওয়ার্থ বলেছেন, কোন লোকই সাফল্যলাভ করতে পারে না যদি না তার নিজের কাজে সে উৎসুক হয়ে ওঠে। নিছক যন্ত্র কোন কাজেই সফল হতে পারে না।' বিখ্যাত চার্লস্ শোয়াবও বলেছেন, 'মানুষ তার প্রতিটি কাজে কৃতকার্য হতে পারে যদি কাজের প্রতি থাকে তার আনুগত্য আর সেই কাজের প্রতি উৎসাহ আর উদ্যম।' অবশ্য এই নিয়মের কিছু সীমারেখাও বর্তমান তা বলাও বাহুল্য। তবে জেনে রাখা চাই বাস্তবে যে মানুষ অনেকের চেয়ে বেশি মাত্রায় সচেতন আর উদ্দীপনাপূর্ণ আর্থিক বা আধ্যাত্মিক দুটি বিষয়েই সে অন্যকে ঢের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবেই। শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি তারই ভাগ্যে সন্দেহ নেই। উদ্দীপনা খুবই উঁচু দরের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেরও পথ হয়ে উঠতে পারে বলেও অনেকের ধারণা। এ বিষয়ে স্যার এডওয়ার্ড ভিক্টর যা বলেছেন তা হল; 'বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহ আর উদ্দীপনাকে যে কোন সাফল্যের চাবিকাঠি মনে করে ধীশক্তিরও আগে স্থান দিতে হবে। মনে রাখতে হবে এই পথ-প্রদর্শক।' এই ধরনের কথা কোন সাধারণ বললে ওকে অবশ্যই হাসির খোরাক হতে হত, কিন্তু কথাটি বলেছেন স্যার এডওয়ার্ড ভিক্টরের মত বিখ্যাত জ্ঞানী মানুষ তাই এর দাম অনেক। এবার আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই উদ্দীপনা এত বেশি রকম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তাহলে আপনার স্বামীর মত একটা সাধারণ মানুষের জীবনে

সেটা আশ্চর্য কোন কাজ করবে নাই বা কেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বিখ্যাত একজন জীবনবীমা ব্যবসায়ী ফ্রাঙ্ক বেটগারের জীবনের একটা উদাহরণ রাখা যাক। দারুণ চিত্তাকর্ষক উদাহরণ। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি ১৯০৭ সালে বেসবল খেলোয়াড় হিসেবে জীবন শুরু করি। এরপর কিছুদিন কাটলে আচমকা মারাত্মক ব্যাপার আমার জীবনে চরম আঘাত হয়ে নেমে আসে। আমাকে অযোগ্য আর অকর্মণ্য বলে বরখাস্ত করা হয়। আমাকে বলা হল আমি নিষ্কর্মা, আমাকে দিয়ে কোন কাজই করা সম্ভব নয়। ম্যানেজার আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন যে কাজ করব এবার থেকে যেন তার মধ্যে কিছুটা উদ্দীপনা ঢেলে দেবার চেষ্টা করি।

'ওখানে আমার মাসিক মাইনে ছিল ১৭৫ ডলার। চাকরিটি চলে যাওয়ার পর বাধ্য হয়ে নিছক জীবিকার জন্যই মাত্র মাসিক ২৫ ডলারের আর একটা চাকরি নিতে হল আটলান্টিক লীগে। সেটা পেনসিলভানিয়াতে। সামান্য ওই টাকায় আদৌ খুশি হতে পারিনি। কিন্তু আমি হতাশায় ভেঙে পড়িনি, যে কাজে যোগ দিয়েছি তাকে সফল করবই বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম। বিরাট উৎসাহ নিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। দশদিন ওখানে থাকার পরেই আমার ডাক আসে নিউ হ্যাভেন সংস্থা থেকে। এই নিউ হ্যাভেনে প্রথম দিনটিই আমার সৌভাগ্যের দরজা উন্মুক্ত করে দিল। ওই লীগে আমার কাছে প্রত্যেকেই ছিল একান্ত অপরিচিত। তা সত্ত্বেও আমি মনে মনে শপথ নিলাম যে করেই হোক সবচেয়ে উদ্দীপনাময় খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবোই। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল এটাই হবে আমার বেঁচে থাকার মূল কথা। খেলার মাঠে হাজির হওয়ার পরেই কেন বলতে পারি না অদ্ভুত একটা শিহরণ আর বৈদ্যুতিক শক্তির স্পর্শই যেন শরীর আর মনের মধ্যে দোলা দিয়ে যায় আমার। খেলা শুরু হওয়ার পর যে গতিতে আমি সারা মাঠে ঘোরাফেরা আর বল ছোঁবার কাজ করে চলেছিলাম তাতে আমার বিপক্ষের সবাই পর্যুদস্ত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, আমার দলের খেলোয়াড়রাও যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে

উঠেছিল। আমার সঙ্গে তাল দিয়ে তারাও পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ায় বিপক্ষ দল দাঁড়াতেই পারল না। আমার উদ্দীপনা যেন মন্ত্রের মতই কাজ করতে শুরু করেছিল। আমার উৎসাহ আর উদ্দীপনা এমন একটা পর্যায়ে আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল যে আমার নিজের সম্পর্কে কোন খেয়ালই আমার ছিল না।

'পরদিন সকালে খবরের কাগজ খুলতেই দেখতে পেলাম গতকালের খেলার যে বিবরণ ছাপা হয়েছে তার অধিকাংশই আমার প্রশংসায় ভরা। আমি উদ্দীপনাময় খেলা খেলেছি সকলেই তাতে অভিভূত। কাগজে লেখা ছিল, নতুন খেলোয়াড় বেটগার অসাধারণ উদ্দীপনাময়। সে দলের সব খেলোয়াড়কেও উদ্দীপিত করেছে। নিউ হ্যাভেন শুধু যে খেলায় বিজয়ী তাই নয় তারা এ মরশুমের সবসেরা খেলারই নিদর্শন রেখেছে। আমার মন যে এতে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহের ব্যাপারই ছিল না। আমার ওই উদ্দীপনা আমার ভাগ্যের দরজাও খুলে দিতে শুরু করল। দশদিনও লাগল না আমার মাইনে হয়ে গেল পঁচিশ ডলার থেকে একশ পঁচাশি ডলার। একলাফে আমার মাইনে বেড়ে যায় প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ। দু'বছর কাটতে না কাটতে আরও নামী ক্লাব লুই কার্ডিনালে সুযোগ পেতে দেরি হল না। সেখানে মাইনে বেড়ে গেল আরও শতকরা ত্রিশ ভাগ। আমি জানতাম আমার সৌভাগ্য কিসে এসেছিল—একমাত্র উদ্যম আর উদ্দীপনাই এর মূলকথা।'

কৃতি খেলোয়াড় মিঃ বেটগার কিন্তু হাতে আঘাত পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত বেসবল খেলা ছাড়তে বাধ্য হন। এরপর তিনি আসেন জীবনবীমা ব্যবসার চাকরিতে। তিনি চাকরি নেন ফাইডেলিটি মিউচুয়াল লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে। এক বছর কাজ করার পর কোন উন্নতি না দেখে মিঃ বেটগার নতুন উদ্যমে উদ্দীপনা নিয়ে কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বেসবল খেলার পুরনো অভিজ্ঞতা তিনি ভোলেন নি।

বর্তমানে মিঃ বেটগার জীবনবীমা জগতে একজন সফল ব্যক্তিত্ব বলেই চিহ্নিত। মিঃ বেটগার বলেন ; আমার ত্রিশ বছরের জীবনবীমা

বিক্রির অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেই উদ্দীপনা একজন বিক্রয় প্রতিনিধির জীবনে কতখানি। আর এতে তাদের আয় দ্বিগুন থেকে তিনগুণ হতে পারে। আবার উদ্দীপনার অভাবে বহু বিক্রয় কারীকে প্রায় দেউলিয়া হতেও দেখেছি।' একজন গৃহিণী হিসেবে তাই আপনাকে বলতে চাই এই উদ্দীপনা যদি একজনের জীবনে মন্ত্রের মতই কাজ করতে পারে তাহলে তা আপনার স্বামীর জীবনেই বা কাজ করতে পারবে না কেন? আপনার কাজ হল আপনার স্বামীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে যে সিদ্ধান্ত ফ্রাঙ্ক বেটগার, ফ্রেডারিক উইলিয়ামসন ইত্যাদি মানুষের জীবনে কাজ দিয়ে থাকে সেই উদ্দীপনাবোধ আপনাকেও উন্নতির সীমানায় নিশ্চয়ই পৌঁছে দেবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলেই চাই উদ্দীপনা। কোন মানুষের মধ্যে যদি এই গুণটি বেশ স্বাভাবিক পরিমাণে থাকে তাহলে তিনি যে কাজ সম্পন্ন করার কাজে এগিয়ে যাবেন সেকাজ যতখানি কঠিন আর কষ্টসাধ্যই হোক না কেন আনুষঙ্গিক কাজের মতই তা সহজ মনে হতে চাইবে।

আপনাকে তাই বলতে চাইছি সুগৃহিণী হিসেবে আপনি সত্যিই যদি কামনা করেন আপনার স্বামীর মধ্যে উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটুক তাহলে তাঁকে উদ্দীপনাময় কাজে উৎসাহ দিন। আপনাকে এটুকু বলা বোধহয় প্রাসঙ্গিক হবে আপনার স্বামী বর্তমান কাজের মধ্যেই তাকে উদ্যোগী হতে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করুন। এর ফলে তার কাজে যদি উদ্দীপনার প্রকাশ দেখেন তাহলেই বুঝতে পারবেন সুফল দেখা দিচ্ছে। পরের পরিচ্ছেদের ছ'টি নিয়ম মেনে চলতে পারলে আপনার উদ্যোগ নিশ্চয়ই সহজতর হয়ে উঠবে।

।। চার ।।

যে ছ'টি নিয়মের কথা এই পরিচ্ছেদে আপনাদের কাছে উল্লেখ করতে চাইছি সেগুলি ঠিক মত যদি অনুসরণ করতে পারেন, আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি এর সুফল আপনি নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ না করে পারবেন না।

বারবার নানা ভাবে অনেকের উপর এর সুফল আমি প্রত্যক্ষ করেছি। একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে আপনি এই নীতি আপনার স্বামীকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করুন। দেখবেন অল্প সময়েই তিনি এর কার্যকারিতা দেখতে পাবেন।

এই নিয়ম গুলি হল এই রকম :

১। আপনার কাজের জায়গায় শিক্ষা নিন। কাজের সব খুঁটিনাটি আর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সার্বিক সম্বন্ধ সম্পর্কে জেনে নিন।

যারা চাকরি করতে অভ্যস্ত তাদের শতকরা অন্ততঃ পঁচাত্তরভাগ মানুষই মনে করেন তারা কোন বিশাল যন্ত্রের একটা অংশ মাত্র। এর অর্থ হল তারা নিজেদের কাজের গুরুত্ব বা নিজেদেরও গুরুত্ব সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। এই ধরণের কর্মী শুধু দৈনন্দিন কাজেই লেগে থেকে নীরস জীবন কাটায়। নিজের কাজের বাইরে সেই কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত অন্য যে সব কাজ থাকে সে সম্পর্কে তার কোনরকম আগ্রহও থাকে না। সে কাজ বুঝে নেওয়ার কোন চেষ্টাও তার মধ্যে থাকে না।

এটা জানা কথা কোন বিশেষ কাজ বা জিনিস সম্পর্কে জানতে গেলে যা চাই তা হল অনুসন্ধিৎসা। অনুসন্ধিৎসা না থাকলে জানার ওই স্পৃহা গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও থাকেনা। এই সম্বন্ধে প্রখ্যাতা সাংবাদিক আইডা এম. টারবেল যা বলেন তা এই রকম, 'একবার মাত্র পাঁচশ শব্দের একটি রচনা লেখার জন্য আমি কয়েক সপ্তাহ পরিশ্রম করে রচনার বিষয়বস্তুর মালমশলা জোগাড় করেছিলাম। কিন্তু লেখার সময় আমার জোগাড় করা মালমশলার সামান্যই কাজে লাগাই। তবু আমি তাতে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলাম। যে মালমশলা বাইরে পড়েছিল সেগুলো থেকে আমার জ্ঞান বেড়ে গিয়েছিল অঢেল। আমার লেখাও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাওয়ায় দারুণ কার্যকরী হয়ে ওঠে।'

বিখ্যাত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনেও এই অনুসন্ধিৎসা দারুণ ভাবে কাজ করেছিল। ফ্রাঙ্কলিন জীবন আরম্ভ করেছিলেন এক

সাবানের কারখানায় মজুর হিসেবে। সেই কারখানায় ছড়ানো থাকত অতি দুর্গন্ধ। কিন্তু ভেঙে পড়েন নি তাতে ফ্রাঙ্কলিন। নিজের কাজে তার অনুসন্ধিৎসা প্রচুর ছিল, নানা ভাবেই তিনি জানতে চেষ্টা চালাতেন সাবান কিভাবে তৈরি হয়। নিজের করণীয় কাজে তার কণামাত্রও অনীহা ছিলনা। চমৎকার ভাবে নিজের কাজ শেষ করতে থাকায় মালিকও ফ্রাঙ্কলিনের উপর খুশি ছিলেন।

যে সব প্রতিষ্ঠানে তাদের উৎপন্ন মালপত্র বিক্রির জন্য বিক্রয় প্রতিনিধি রাখা হয় তাদের প্রতিটি উৎপন্ন জিনিসের তৈরি বিশদ বিবরণ শিখতে হয়। অথচ বিক্রি করার সময় সেটার কোন প্রয়োজন হয় না। আসলে এই বাড়তি জ্ঞান থাকার ফলে প্রতিনিধিরা খুবই দায়িত্ব সচেতন আর উৎসাহিত হয়ে পড়ে। এটা জানা দরকার কোন বিষয়ে যত বেশি জানা যায় সেই বিষয়ে আমাদের উৎসাহও ততটা বেড়ে যায়। এই জন্যই যে কোন আদর্শ স্ত্রীর জানা দরকার, তাঁর স্বামী তার কাজে উৎসাহিত না হলে ত্রুটি কোথায়। এই ত্রুটি খুঁজে বের করে স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করাই হবে স্ত্রীর কাজ। হয়তো দেখা যাবে স্বামীর নিজের কাজ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, বা আগ্রহও নেই। স্ত্রীর কর্তব্য হবে সেই সুপ্ত অজ্ঞানতাকে দূর করায় সাহায্য করা।

২। লক্ষ্য স্থির করে তাতে লেগে থাকুন।

আপনি যদি কোন কাজে সফল হবেন বলে ঠিক করেন তাহলে আপনার প্রথম কাজই হবে কাজটির দিকে স্থির দৃষ্টি রাখা। আপনাকে জানতে হবে আপনার কাজটির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। এরপরেই আপনার কাজ হবে একজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষের মত তারই পিছনে লেগে থাকা। কোন ভাবেই এই কাজের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। এই ধরণের মানসিকতা থাকলে জেনে রাখুন নানা বাধা বিপত্তি বা সাময়িক ব্যর্থতায় কখনও নিরুৎসাহ হবেন না।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেছিলেন, 'কেউ যদি নিজের কাজে সিদ্ধি লাভ করতে আগ্রহী হয় তাহলে নিজের কাজ আর কর্তব্য সম্পর্কে তাকে নিবিষ্ট হতেই হবে। জীবনে কৃতকার্য হতে গেলে এটা চাই-ই।'

একজন কর্তব্যপরায়না স্ত্রী হিসেবে তাই আপনার কাজ হবে আপনার স্বামীর কাজ সম্বন্ধে তার একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলায় সহায়তা করা। একাজ করতে হবে তাকে তার ভবিষ্যত আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে অবহিত করে তোলা—অবশ্য স্বামীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে। আপনাকে বাস্তব পরিস্থিতি মেনেই এটা করতে হবে—অবাস্তব স্বপ্ন দেখার চেয়ে এটা ঢের বেশি কার্যকর। সম্ভাব্য সব কিছু মেনে নিয়ে উদ্দেশ্য নিয়েই এগিয়ে চলুন।

৩। **ছোট খাটো গল্প করুন।**

ছোট খাটো গল্প করুন বলায় অদ্ভুত কিছু বলছি ভেবে বসবেন না। এর উপযোগিতা কিন্তু অসীম। কিন্তু গল্প বলতে কি রকম গল্পের কথা বলছি? ছোটবেলায় শোনা মজার গল্প? আসলে যে কোন ধরণের গল্পই হোক না কেন এতে মানুষের অনুসন্ধিৎ বাড়ে। অনেক সফল মানুষেরই মতে এই ধরণের গল্পের উপস্থাপনা মানুষের উদ্যম আর উদ্দীপনা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে। বিশিষ্ট সাংবাদিক এইচ. ভি. কেল্টেনবার্ন বলেন যে এক সময় তিনি যখন ফ্রান্সে জীবনবীমা বিক্রির কাজ করতেন তখন তিনি এই ধরণেব গল্প কাজে লাগিয়ে সফল হন।

এমনই ঘটনা ঘটে বিখ্যাত যাদুকর হাওয়ার্ড আনটর্নের জীবনেও। যে কোন যাদু প্রদর্শনের আগে তার কাজই ছিল গল্পের সূত্রপাত করা। এই গল্প বলার মধ্য দিয়ে আনটর্ন বেশ সজীবতা লাভ করতেন আর দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারতেন।

আসলে আমরা প্রত্যেকেই অর্ধজাগ্রত হয়ে দিন কাটাই। তাই আমাদের উচিত নানা ছোট ছোট ঘটনাকে মনে রেখে কাজের মধ্যে সজীবতা আর অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা। সজীব থাকাই যে কোন কাজ সুষ্টভাবে শেষ করার প্রথম ও একমাত্র চাবিকাঠি। ছোট ছোট সরসতায় ভরা গল্প তাই মানুষের মন সজীব করে তোলার কাজে খুবই কাজ দেয়।

৪। **অল্প স্বার্থপরতায় দোষ নেই।**

বিখ্যাত দার্শনিক, সম্রাট আলেকজাণ্ডারের শিক্ষাগুরু অ্যারিষ্টটল

বলেছিলেন, 'দোষ মুক্ত স্বার্থপরতা মানব কল্যাণ কর।' যাঁরা জীবনে উন্নতি করতে চায় তাদের জন্য এটি চমৎকার পথ।' কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই স্বার্থপর—আর সেই স্বার্থপরতা ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধিতেই ব্যস্ত থাকে। এই ধরণের মানুষের একটা চোখ থাকে ঘড়ির উপর আর অন্য চোখ থাকে তার নিজের আয়ের অঙ্কের উপর। এই সব লোক আসলে অলস, ক্লান্ত, তাই জীবন পথে সে সত্যিই ব্যর্থ। জেনে রাখবেন অন্যের স্বার্থ লক্ষ্য রেখে কাজ করা অনেক বেশি আনন্দ আনে। এতে মনে সত্যিকার উদ্যম সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে যেখানে বহু দক্ষ আর সক্ষম জ্ঞানী মানুষ যিনি সহজেই অর্থের আর সম্মানের দিক থেকে বিরাট কৃতী হতে পারতেন তিনি অন্যের জন্যেই নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেন। এই সব মানুষ আসেন সমাজ সেবা আর ধর্মের কাজে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়, তাই তাদের শুধু সামান্য স্বার্থপরতা বজায় রেখে চললে দোষ হয় না। আপনার স্বামীকে উদ্দীপনায় উৎসাহিত করতে হলে একটু স্বার্থপরতার আশ্রয় নিতে পারেন।

৫। **উদ্যোগী মানুষের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করুন।**

এমন মানুষের সঙ্গে মেশার চেষ্টা করবেন যার মধ্যে উদ্যোগী পুরুষের সব লক্ষণ চোখে পড়ে, জীবন সংগ্রামে যার প্রচেষ্টা সার্থক। এ কাজ করলে আপনারই লাভ কারণ আপনার নিরুৎসাহ ভাব তাতে দূর হবেই। মার্কিনী দার্শনিক রালফ ওয়ালডো এমার্সন বলেছিলেন, 'যে মানুষ আমাকে কর্তব্য আর কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারে তেমন মানুষকেই আমার প্রয়োজন।' একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে যদিও আপনি আপনার স্বামীর কাজের পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন না তাহলেও আপনি যা পারেন তার মূল্যও কম নয়। আপনি স্ত্রী হিসেবে স্বামীর বন্ধু হয়ে তাঁর সুপ্ত কর্মকুশলতা জাগিয়ে তুলতে পারেন। একাজ ঢের বেশি বাস্তব চিন্তা জোগাতে সাহায্য করে আর জীবন যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে। আপনার স্বামীকে যদি সত্যিই উদ্দীপনায় উত্তেজিত হতে দেখতে চান তাহলে কৃতী আর উদ্যোগী মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে

আপনার প্রভাবকে কাজে লাগান। এমন সব মানুষ যাদের জীবন উৎকর্ষতায় সজীব আর জাগ্রত। জেনে রাখবেন প্রত্যেক দেশেও সমাজে এমন মানুষের অভাব নেই। আপনার পরিচিতদের মধ্যেও তাদের অবশ্যই খুঁজে পাবেন। এই উদ্দীপনা ব্যাপারটা বেশ ছোঁয়াচে। তাই এর স্পর্শ আপনার স্বামীকেও উদ্বুদ্ধ করবে।

পার্সি এইচ. হুইটিং তার বিখ্যাত বই 'ফাইভ গ্রেট রালস ফর সেলিং-এ বলেছেন, 'যে সব মানুষের মধ্যে বিষন্নতা জেগে থাকে, তাদের আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করা যায়। যারা অনিচ্ছার সঙ্গে দৈনিক কাজ কোনরকমে সমাধা করতে চায় তাদের সংস্পর্শ বিষবৎ এড়িয়ে চলুন।'

৬। উদ্যোগী হতে মনে জোর আনুন, সফল হবেনই।

কথাটিকে আমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা বলে ভাববেন না যেন। কখনই তা নয়। বিখ্যাত দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমসই এই দার্শনিক তত্ত্বের উদ্গাতা। জেমস বলেছিলেন, 'যদি আপনার মনের মধ্যে আবেগপূর্ণ উদ্দীপনার স্রোত জাগাতে চান তাহলে ভাবতে থাকুন আর এমন ভাবে কাজ করতে থাকুন যেন ওই ভাব সত্যিই আপনার মনে সঞ্চার হয়েছে।' এটা সত্যিই পরীক্ষিত সত্য। এই ভাবে কাজ করতে শুরু করুন দেখবেন আপনার কাজে উদ্দীপনার জন্ম আপনা আপনিই হবে। উদ্যোগী হতে গেলে উদ্যোগপূর্ণ চিত্তে কাজে লাগুন। স্ত্রী হিসেবে আপনি আপনার স্বামীকে এই কথাই শোনান।

এই সূত্রগুলো মনে রাখবেন

১। সাফল্যের প্রথম সোপান : আপনার স্বামীর জীবিকা আর জীবনদর্শন নির্বাচনে সাহায্য করুন। কোন আদর্শ লক্ষ্য রেখে তাঁকে এগিয়ে চলতে আপনার প্রেরণা উজাড় করে দিন।

২। কোন কাজের সাফল্য এলেই অন্যটিতে নজর দিন : কোন

কাজে সফলতা লাভ করতে পারলে অন্য কাজ হাতে নিন। পাঁচ বছরের পরিকল্পনার ছক তৈরি করুন।

৩। স্বামীকে উদ্দীপিত করুন : স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করুন উদ্দীপনার মূল্য কতখানি। অন্যের জীবনের উদাহরণ রাখুন।

স্বামীর উদ্যম বৃদ্ধির জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করুন ঃ—

(১) স্বামীর প্রতিটি কাজে অনুপ্রেরণা দিন।

(২) কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির রেখে কাজে এগিয়ে চলুন আর তাতেই লেগে থাকুন।

(৩) প্রতিদিন স্বামীর কাছে টুকরো টুকরো গল্প বলুন আর তাকে অনুপ্রাণিত করতে থাকুন।

(৪) সামান্য স্বার্থপরতা অন্যায় নয়, তবে পরের কথা আগে ভাবতে শিখুন।

(৫) উদ্যমশীল লোকের সঙ্গে মেলামেশা করুন।

(৬) মনে রাখুন, উদ্যমের সঙ্গে কাজ করলে উদ্যমশীল হওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ পাঁচ ॥

মানসিক ভাবধারা গঠনের কথা শুনুন

১৯৫০ সালের একটা ঘটনার কাহিনী আপনাদের শোনাচ্ছি। আমেরিকার শিকাগো শহরের বিল জোনস নামে একজন লোক প্রচণ্ড মানসিক বিপর্যয়ের সামনে পড়ে আত্মহত্যার জন্য পাঁচতলা একটা বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে। একাজ করার কারণ হল দৈন্যদশা আর ভয়। তার এককালের বেশ লাভজনক ব্যবসা হঠাৎ নষ্ট হয়ে যাওয়াতেই আর কোন পথ না দেখেই সে আত্মহননের পথ বেছে নিতে চেয়েছিল। ব্যবসা নষ্ট হওয়ায় পাওনাদার আর অন্যান্যদের ধার শোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। নিজের মানসিক যন্ত্রনার কথা সে কিন্তু নিজের স্ত্রীকে আদৌ বলতে পারে নি। সে জানত স্ত্রী তার ব্যবসার উন্নতিতে বেশ গর্বিত। তাই সব কথা শুনলে সে যদি ভেঙে পড়ে তাহলে সে প্রচণ্ড আঘাত পেতে পারে ভেবেই বিল কথাটা স্ত্রীকে জানাতে পারেনি। এর ফলে কারও কাছ থেকে কোন সহানুভূতি না পাওয়ায় বিল জোনস নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে যায়। আর সেই নৈরাশ্যই তাকে টেনে নিয়ে যায় আত্মহননের পথে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করার পরই শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিল জোনস্। কিন্তু ঈশ্বর বোধ হয় মুখ তুলেই তার দিকে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে বিলের অকালমৃত্যু অভিপ্রেত ছিল না। তাই বিল ঝাঁপিয়ে পড়লেও ছাদের বাইরে বেরিয়ে থাকা কার্নিশের উপর ওর দেহ পড়ার ফলে কার্নিশ ভেঙে বিল রাস্তার উপর পড়ে যায়। কার্নিশের উপর পড়াতেই জীবন রক্ষা পেয়ে গেল বিলের। আশ্চর্য হওয়ারই কথা শুধু ওর একটা আঙুলের নখ ভেঙে যায়। সে অবশ্য ভয়ে জ্ঞান হারায়।

যখন জ্ঞান ফিরল বিল জোনস্ দেখল সে বেঁচে রয়েছে আর ছটফট করে চলেছে। ব্যাপারটা জোনসের অলৌকিক কোন ঘটনা বলেই

মনে হল। জীবন ফিরে পাওয়ায় জোনসের কাছে সমগ্র দুঃখকষ্ট তুচ্ছ মনে হতে লাগল। মাত্র পাঁচ মিনিট নিজের জীবন ওর কাছে দুর্বিসহ ভার মনে হলেও ঠিক ওই মুহূর্তে ও আনন্দে শিহরিত হল। এরপর ও বেশ শান্ত ভঙ্গীতেই দ্রুত বাড়িতে ফিরে এসে এবার আর কিছু গোপন না করে সব কথা স্ত্রীকে শুনিয়ে দিল। সমস্ত কথা শুনে জোনসের স্ত্রী প্রথমে প্রায় ভেঙে পড়লেও নিজেকে সামলে নিল। তার দুঃখ হল স্বামী তাকে সব কেন আগে বলেনি। ওর স্ত্রী স্থির ভঙ্গীতে এবার জোনসকে নানাভাবে ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্বন্ধে নানা পরামর্শ দিয়ে চলল।

এরপর নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করল বিল জোনস। ওর স্ত্রীর পরামর্শ আর প্রেরণাই জোনসকে পথ দেখাতে চাইল। নানা জটিলতার মধ্য দিয়ে চলতে হলেও সবল বাস্তব চিন্তায় ফিরে আসতে বেগ পেতে হয়নি বিল জোনসকে। একটু একটু করে সমস্ত দুশ্চিন্তা আর বিপদ কাটিয়ে উঠল বিল, আর ব্যবসাতেও যথেষ্ট উন্নতি হল। সমস্ত দেনা শোধ করে ফেলেছিল বিল। দুঃখ আর বাধা সে জয় করেছিল নিজের স্ত্রীকে সমব্যথী হিসেবে পাওয়ার পর। বিল জোনসের এই কাহিনী থেকে এই কথারই প্রমাণ মেলে যে স্ত্রীকে বিশ্বাস করে সব কথাই বলা প্রত্যেক স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য এ রকম ঘটনার ক্ষেত্রে বিল জোনসের দোষ নেই, কারণ অধিকাংশ স্বামীরাই এরকম অবস্থায় স্ত্রীকে এর মধ্যে জড়াতে চায় না। তাদের ধারণা স্ত্রী তাতে অকারণ উদ্বেগে ভুগতে থাকবে। আরও একটা কারণও থাকে স্বামীরা যে অক্ষম, অসহায় তারা সেকথা স্ত্রীর কাছে সম্ভবতঃ গোপন রাখতে চায়।

বহু পরিবারে আবার দেখা যায় স্বামী ক্লান্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে আসর পর অফিস সংক্রান্ত কোন কথা স্ত্রীকে বলার চেষ্টা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এর কারণ অনেক স্ত্রীই অফিস সংক্রান্ত কোনো কথা শুনতে চায়না, স্বামী কথা বলতে চাইলেই সে অন্য প্রসঙ্গ তোলে বা রান্নাঘরে কাজ আছে বলে সরে যায়। স্বামী বেচারি হয়তো কোন সমস্যার কথা ভেবে শান্তি পাচ্ছিলেন না বলেই অন্ততঃ স্ত্রীর কাছে

বলে হালকা হওয়ার ইচ্ছায় ছিল কিন্তু তার সে আশা এক্ষেত্রে পূর্ণ হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই একা কোন সমস্যার ভার বহন অসহনীয় হতে পারে, এরকম ক্ষেত্রে কারও স্ত্রীই হতে পারে মুশকিল আসান। একজন আদর্শ গৃহিণীর মনে রাখা উচিত কোন স্ত্রীই ভাল শ্রোতা হয়ে স্বামীকে সে গভীর প্রশান্তি আর স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে। স্ত্রী অনেক সময়েই অভাবিত ভাবে স্বামীর কাছে সুপরামর্শ দায়িনী হতে পারে। এক্ষেত্রে স্ত্রীই শুধু ভাল শ্রোতা হবেন না, স্বামীকেও মর্যাদা দিতে হবে স্ত্রীর মতামতকে, মন দিয়ে স্ত্রীর কথাও শুনতে হবে। দুজনকেই হতে হবে ভাল শ্রোতা। জনপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষেত্রেও এর দাম অনেক। ভাল শ্রোতা অনেক ক্ষেত্রে বিরক্তিকর লোকের কাছে প্রভাবিত হতে পারে। বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী মার্নালয় বলেছিলেন যে রাষ্ট্র সঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থায় নানা দেশ থেকে আগত নানা প্রতিনিধির কথা শুনে বিভিন্ন দেশ আর জাতির সমস্যা সম্পর্কে তিনি চমৎকার জ্ঞান লাভ করেন। মিস লয় আরও বলেছিলেন, 'অনেকেই হয়তো পর্দার আড়ালে থেকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে নানা মুখরোচক গল্পে মেতে থাকেন, কিন্তু আমার ধারণা এরকম করার চেয়ে একজন ভাল শ্রোতা হওয়া অনেক বেশি কাজের।'

ভাল শ্রোতা কেমন করে হবেন ?

সহজ কথায় একজন ভাল জাতের শ্রোতা হতে গেলে মোটামুটি তিনটি গুন থাকা দরকার—ভাল শ্রোতাকে তিনটে কাজ করতে হবে। যেমন, (১) শুধু কানকে কাজে না লাগিয়ে শ্রোতাকে তারই সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে চোখ মুখ আর সারা শরীরকেও।

শ্রোতাকে প্রথমতঃ খুব মনোযোগী হতে হবে। মনোযোগ মানেই হল সমস্ত কাজের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে তোলা। ধরুন একজন শ্রোতা বিশেষ রকম অস্থিরচিত্ত। যে কোন কথা শোনার সময় তার চোখ নানা জায়গায় ঘুরতে চায়, তার হাত নিশপিস করে, শরীর বেঁকে থাকে। এমন ধরনের শ্রোতার আদপেই মনোসংযোগ থাকে না।

মনে রাখবেন সত্যিকার ভাল শ্রোতা হতে গেলে শ্রোতাকে বক্তার মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়। আমরা এক্ষেত্রে আপনা থেকেই সামনে ঝুঁকে পড়ি, বক্তার কথার সঙ্গে আমরা প্রতিক্রিয়াশীলও হয়ে যাই। আমাদের তাই ভাল শ্রোতা হতে গেলে আমাদের এমন কাজ করতে হবে যাতে বোঝা যায় শ্রোতার দিকে আমরা আকৃষ্ট হয়েছি। শরীরের ভঙ্গীর মধ্যেও সেই ভাবটি পরিস্ফুট হতে হবে। বিড়াল যখন ইঁদুর ধরার জন্য ইঁদুরের গর্তের সামনে অনড় হয়ে বসে থাকে তাকে দেখে ধারণা করে নিতে পারেন একাগ্রতা কাকে বলে। আদর্শ স্বামী আর স্ত্রীকেও পরস্পরের কাছে এই রকম ভাল শ্রোতাই হতে হয়।

(২) **ভাল, কার্যকর প্রশ্ন করুন।**

শ্রোতার পক্ষে বক্তার কাছে প্রশ্ন করা ব্যাপারটা দুজনের মধ্যে চমৎকার বোঝা পড়ার বাতাবরণ সৃষ্টি করে তোলে। প্রশ্ন এমন ভাবে উপস্থাপিত করা চাই যাতে প্রশ্নকর্তা যে রকম উত্তর আগে থেকেই ভেবে রাখেন বক্তাকে দিয়ে প্রায় সেই উত্তরই দেওয়ানো যায়। অর্থাৎ শ্রোতা এক্ষেত্রে বক্তাকে পরিচালনা করবেন। এই ধরণের কৌশলী প্রশ্ন সরাসরি না হওয়াই কিন্তু উচিত। প্রশ্ন হবে এমন যাকে বলা হয় 'পরিচালক প্রশ্ন। পরিচালক প্রশ্ন সব সময়, মনে রাখবেন আলোচনার মনোভাব জাগিয়ে তোলায় সাহায্য করে।

কিন্তু সরাসরি আরও পারিচালক প্রশ্ন কি রকম? হ্যাঁ, এটা চমৎকার প্রশ্ন। কোন শ্রোতা ধরা যাক, বক্তাকে প্রশ্ন করল, 'কাজ নির্বাহ আর কাজ পরিচালনা একাজ দুটি কি একই সঙ্গে করা যায়?' এ হল সরাসরি প্রশ্ন। কিন্তু বক্তা যদি প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি মনে করেন যে ক্ষেত্রবিশেষে কাজ নির্বাহ আর কাজ পরিচালনা এই দুয়ের সমন্বয় সাধন কি সম্ভবপর?' এই ধরনের প্রশ্নকে বলা হয় পরিচালক প্রশ্ন। কোন লোক যদি একজন ভাল জাতের শ্রোতা হতে চায় তার কাছে এই ধরনের পরিচালক প্রশ্ন করা অবশ্যই চমৎকার নৈপুণ্য সন্দেহ নেই। একজন আদর্শ স্ত্রীর পক্ষেও এই ধরনের ভাল শ্রোতা হওয়াও

খুব কার্যকর। স্বামীর কথা শোনার আগ্রহ যে কোন পরিবারেই শান্তি নিয়ে আসে। কোন স্বামীকে তার স্ত্রী এই ধরনের পরিচালক বেশ কৌশলী ভঙ্গীতে করতে পারে : 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় আরও বিজ্ঞাপন দিলে সত্যিই কি জিনেসের বিক্রি বাড়ে?' এরকম প্রশ্নের মধ্যে উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গী মোটেই থাকে না, অথচ এতে কাজ হয় চমৎকার। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় বক্তার মধ্যে বেশ একটু ইতস্ততঃ আর লজ্জার ভাব থাকে, এক্ষেত্রে শ্রোতার উত্থাপন করা ভাল যোগ্য প্রশ্ন খুবই ফলপ্রসূ হয়। এরকম প্রশ্ন বেশ মন্ত্রের মত কাজ করে। যেকোন মানুষই যখন কোন ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করে তখন অনেক ক্ষেত্রেই সে কিছুটা আত্মবিস্মৃত হয়। অবশ্য এ ধরনের ব্যাপার ঘটে বিষয় বৈচিত্র্যের উপর। যেমন ধরা যাক আবহাওয়া, কোন অসুখের বিষয় বা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা বা প্রশ্নে এরকম হয় না। এক ভাব অন্যভাবকে আকর্ষণ করে।

(৩) **কখনও বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণা নয়।**

আমাদের সমাজে বহু পুরুষ আছেন যারা স্ত্রীর সঙ্গে বৈষয়িক বা অন্য কোন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন না, বা পছন্দ করেন না। আসলে তাঁরা স্ত্রীকে বিশ্বাস করেন না। তাদের ধারণা স্ত্রী সব কথা নানাজনের কাছে প্রকাশ করে ফেলবে। একথার মধ্যে যে সবটাই অতিশয়োক্তি রয়েছে সেটা বলাই বাহুল্য। তবে এ ধরণের ঘটনারও অভাব নেই। যেমন এমন হতে পারে কোন একজন মানুষের মনের ইচ্ছা ছিল তার অফিস ম্যানেজার অবসর নেওয়ার পর পদটি তিনিই পাবেন। ভদ্রলোক কথায় কথায় গোপনে স্ত্রীর কাছে ব্যাপারটা বলেছিলেন। যেভাবেই হোক কথাটা ভদ্রলোকের একজন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর কানে পৌছে যায়। ব্যাস ভদ্রলোক আর প্রমোশন পেলেন না। শোনা যায় একজন কার্য পরিচালক নীতি গ্রহণ করে তাঁর অধীনস্থ সব কর্মচারীকে আদেশ দিতেন যে বাড়িতে ফেরার পর স্ত্রী বা কারও সঙ্গে অফিস সংক্রান্ত কোন আলোচনা চলবে না। তাঁর মত ছিল,

অফিস সংক্রান্ত এই ধরনের খোলামেলা আলোচনা, বিশেষ করে মহিলা মহলে যদি করা হয়, তাহলে প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়।

একটা আশ্চর্য বিষয় সম্বন্ধে আদর্শ স্বামী স্ত্রীকে অবহিত থাকতে অনুরোধ করছি। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ত্রী যথেষ্ট শিক্ষিত, বুদ্ধিমতী ও সহানুভূতিসম্পন্না হয়েও স্বামীর অফিস সংক্রান্ত বিষয়ের কথাবার্তা শুনতে চান না। বহু স্বামীই চান স্ত্রীর কাজে কাজের বিষয়ে আলোচনা করতে কিন্তু স্ত্রীর কাছ থেকে তেমন সাড়া না মেলায় তার মধ্যে চাপা ক্ষোভের জন্ম হতে থাকে। কোন আর্কিটেক্ট বা স্থপতির কাজ স্ত্রীর হয়তো আগ্রহ না থাকাই অবশ্য সম্ভব। কিন্তু একজন অ্যাকাউন্ট্যান্টের স্ত্রীও কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিকের স্ত্রীর মতই স্বামীর কাজের বিষয়ে অজ্ঞ থেকে যায়। অথচ এমন উদাহরণও আছে যেখানে স্ত্রী স্বামীর প্রত্যেকটি কাজেরই খুঁটিনাটি বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই ধরনের স্বামী তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে দারুণ গর্ব অনুভব করবেন তাইতো স্বাভাবিক। এই ধরনের স্ত্রী বাড়ির পরিবেশকে চমৎকার রমণীয় করে তুলবেন তা তো বলারই দরকার হয় না।

নিচের তিনটি নিয়ম যদি মেনে চলতে পারা যায় তাহলে অবশ্যই যেকোন গৃহিণী আদর্শ আর সত্যিকারের ভাল শ্রোতা হয়ে উঠতে পারেন :

১। মুখের কথা আর শারীরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে মনোযোগ আকর্ষন করুন।

২। বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন করুন।

৩। কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না।

॥ ছয় ॥

স্বামীর কাজে সাহায্য করুন

বিখ্যাত লর্ড চেষ্টারফিল্ড চমৎকার একটি মন্তব্য করেছিলেন। সেটা হল এই রকম : 'প্রত্যেকটি মানুষই বাস্তবিকপক্ষে দুজন মানুষ—বর্তমানে সে যে রকম মানুষ হিসাবে রয়েছে, আর ভবিষ্যতে সে যে রকম মানুষ হতে চায়।'

মানুষ আশ্চর্য রকম জীব। যে যা নয় অনবরত সে তাই হয়ে উঠতেই ইচ্ছা করে। যেমন যে অসম্ভব ভীরু সে চায় সাহসী হতে। আবার যে বহু মানুষের কাছেই অপ্রিয় সে আবার চায় সকলের প্রিয় হয়ে উঠতে। এমন মানুষ, যে নিজের শক্তিতে কোন রকম বিশ্বাস রাখতে পারে না সেও চায় আত্মবিশ্বাসী হতে। এই আত্মবিশ্বাস অর্জন করা বা সাহসী হয়ে ওঠা কঠিন কাজ হলেও কিন্তু মোটেই অবাস্তব বা অসম্ভব কাজ নয়। যে কোন দোষ ত্রুটি যুক্ত এই ধরণের মানুষকে বদলে দিতে গেলে চাই সহানুভূতির সঙ্গে তাকে বিচার করা আর পরিবর্তনে সাহায্য করা। এই কাজটি সবচেয়ে সহজে করতে পারেন তারই আদর্শ স্ত্রী। স্ত্রী সে কাজ কখনই পাশের ফ্ল্যাটের কৃতী পুরুষকে দেখিয়ে তুলনার মধ্যে তা কখনই করবেন না, বরং স্বামীকে সুপরামর্শ দিয়ে তার সুপ্ত মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টাই করবেন। এবিষয়ে মার্জোরি হোমস বলেন, 'এমন কোন পুরুষ বা স্বামী নেই যিনি স্ত্রীর প্রশংসা শোনার পর আনন্দে উচ্ছ্বাসিত না হন।' আসলে এ ব্যাপারটা মানুষের বৈশিষ্ট্য। তাই স্ত্রীই সকলের চেয়ে ঢের বেশি রকম স্বামীর পরিবর্তনে যোগ্য আর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেন।

পৃথিবীর সব দেশেই একথা পরীক্ষিত সত্য। অনেক কৃতি মানুষই তাদের জীবন থেকে একথার সাক্ষ্য দিয়েছেন। মিঃ পার্কস নামে একজন মানুষ আমাকে বলেছিলেন, 'কোন মানুষ সে নিজে যা হতে চায় তাই যে হবে তার কোন কথা নেই, সে তার স্ত্রী যা চায় তাও হতে পারে। এ বিষয়ে আমি পরীক্ষা করার পর নিঃসন্দেহ যে ওই সব পুরুষ তাদের স্ত্রীর কাজ থেকে চমৎকার সহায়তা আর পরামর্শ লাভ করেছিল। কোন কাজে নিয়োগ করার আগে আমি ওই সব পুরুষের স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করি আর যখন সন্তুষ্ট হই তখনই তাদের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করি। এর আগে তা করিনি। আমি মনে করি স্বামীর জীবনযাত্রার উপর স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গী ও স্ত্রী যতদূর পর্যন্ত স্বামীর মনোবলের পরিচয় পান তার সাহায্যেই স্বামীর ক্ষমতার পরিমাপ বা সীমা নির্দেশ করা যায়।'

মিঃ পার্কস নিজের জীবনের প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন, 'আমার

নিজের জীবনেই এর উজ্জ্বল উদাহরণ পেয়ে যাবেন। আমার স্ত্রী হয়ে আসার আগে আমার স্ত্রী বেশ ধনীর গৃহের ছুলালীই ছিলেন, পয়সা-ওয়ালা বাবা মা, ভাল বাড়ি, গাড়ি, এর সবকিছুই তার ছিল। কিন্তু আমার এর কোনকিছুই ছিলনা,—অর্থ, শিক্ষাসম্পদ কিছুই না। আমার একমাত্র যে সম্পদ ছিল তা হল বড় হওয়ার অদম্য স্পৃহা, সফল হওয়ার বাসনা। আমায় স্ত্রীর আমার ওই কর্মশক্তির উপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। সেটাই ছিল আমারও প্রেরণা।

'আমাদের বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর এক নাগাড়ে অসাফল্য আর নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলতে হয়েছিল। আমার মনোবল ভেঙে না পড়ে অটুট ছিল একমাত্র আমার স্ত্রীর অনবরত উৎসাহদান আর প্রেরণা জাগানোর মধ্য দিয়ে। আমি ওই উৎসাহদান আর প্রেরণার জন্যই একটু একটু করে সাফল্য লাভ করতে থাকি। আজ আমি যে সফলতার মুখোমুখি হতে পেরেছি তার শতকরা নব্বইভাগই সম্ভব হয়েছে আমার স্ত্রীর অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা আর উৎসাহদানের জন্যই। বিয়ের পর কয়েক বছর আমার স্ত্রী নানা কঠিন রোগে ভুগেছিলেন, কিন্তু তবুও তার মনের জোর কণামাত্রও কমেনি। আজ এতদিন পরেও তার একমাত্র চিন্তা আমাকে সহায়তা করা। প্রতিদিন সকাল বেলা আমার স্ত্রী আমাকে নানা ভাবে সুপরামর্শ দিতে ভোলেন না। বাড়ি ফেরার পরেও তাকে কাছে পাই একজন বন্ধু হিসেবেই। আমার সৌভাগ্য আমার স্ত্রীই, একথা অকপটে স্বীকার করছি।'

এরই পাশাপাশি অন্য একটা ছবিও আমাদের নজরে পড়ে। এমন বহু স্বামী স্ত্রীর কথা আমি জানি যাদের পারিবারিক জীবন সত্যিই অশান্তিতেই ভরা। আর আশ্চর্যের কথা এক্ষেত্রে স্ত্রীর ভূমিকাই সব-চেয়ে সমালোচনার যোগ্য। এমন দেখা গেছে যে স্ত্রী স্বামীর মনো-ভাবের তোয়াক্কা না করে নিজের উৎকৃষ্টতর পোশাক, গাড়ি, বাড়ি নিয়েই অনুযোগ করতে অভ্যস্ত—এসবের খরচ স্বামীর পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই মেটানো সম্ভবপর হয় না। স্বামী একাজ সম্ভব করতে গেলে বিব্রত হয় আবার না করলে পারিবারিক অশান্তির আশঙ্কা থাকে। এই সব

স্ত্রীর অবশ্যই জানা উচিত স্বামীকে অনুযোগ জানালেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় না, বরং তাকে অনুপ্রেরণা জোগালেই সেটা হতে পারে।

স্বামীকে অনুপ্রাণিত করার উপায়।

যে কোন স্ত্রী নানাভাবেই স্বামীর ভবিষ্যত জীবন ধারাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। একাজ করার প্রাথমিক পথটি হল স্বামীর দোষ ত্রুটির কথা না তুলে তার প্রশংসা করা আর আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মানো। একাজ করার পথ হল স্বামীর সত্যিকার গুণের কথা উল্লেখ করে তাকে উন্নতির পথ দেখানো। স্বামীর আগেকার ভাল কাজের উল্লেখ এসব ক্ষেত্রে খুবই ভাল টনিকের কাজ দেয়। এতে স্বামীর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। বিশেষ করে সাহসিকতাপূর্ণ কাজের বেলায় এটা হবেই। যে সব স্ত্রী স্বামার কাজকর্ম বা কর্মস্থলের সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল থাকেন তার পক্ষে স্বামীর কাজে কিছু অতীত ইতিহাস টেনে চমৎকার অনুপ্রেরণার কাজটি করতে পারেন। যেমন কোনদিন হয়তো স্বামী বেশ সাহস করেই প্রতিষ্ঠানের অপচয়রোধের কোন পরামর্শ অযাচিত ভাবে কতৃপক্ষের কাছে বলেছিলেন। সেটা শেষ পর্যন্ত গৃহীতও হয়েছিল। এক্ষেত্রে স্বামী চমৎকার সাহসিকতার নজীর রেখেছিলেন। স্ত্রী এক্ষেত্রে স্বামীর পুরনো জীবনকথা তুলে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। বর্তমানে স্বামীর মধ্যে কোন ত্রুটি আর দুর্বলতা দেখতে পেলে এই পুরনো ইতিহাস তাকে সত্যিই সাহস আর শক্তি জোগাবে। স্বামীর অবশ্যই বিশ্বাস জন্মাবে যে কাজ তিনি কয়েক বছর আগে অনায়াসে করে থাকতে পারেন সেকাজ এখন পারবেন না কেন? এর চমৎকার একটা মনোজগতের দিকও আছে। মানসিক শক্তি জোগাতে এই প্রেরণা নিঃসন্দেহে জোরালো টনিক। স্বামী অকর্মণ্য হলেও স্ত্রীর সেকথা বলা কখনই উচিত নয়। এ বিষয়ে মার্গারেট কালকেন বলেন, 'স্বামীকে কোনভাবেই কোন সময় অকর্মণ্যতার অপবাদ দেওয়া উচিত নয়। বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে বা অন্য যে কোন সময়েই স্বামীর প্রশংসাই স্ত্রীর কর্তব্য।' একথা সব সময়েই

মনে রাখতে হবে স্বামীর প্রশংসা আর সময়ে সময়ে তাকে প্রেরণার বাণী শোনালে স্বামীর মনের শক্তি আর কাজ সমাধা করার জিদ বাড়াতে বাধ্য। কোন স্ত্রীর মুখনিঃসৃত সুনির্বাচিত কয়েকটা শব্দ একজন পুরুষের সারা জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কোন পথে তাকে চালিত করতে পারে।

মানুষের জীবনে এমন ঘটনার অভাব নেই যেখানে স্ত্রীর প্রশংসা তাকে অপরূপ আনন্দের আর সাহসের সন্ধান দিয়েছে। এমনই একটা উদাহরণ আমরা পাই টম জনষ্টন নামে একজনের জীবনের ঘটনায়। এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে যায় টম জনষ্টনের জীবনে। টম জনষ্টন খুবই দক্ষ সাঁতারু ছিলেন। কিন্তু দুর্ঘটনায় কিছুটা অকর্মণ্য হলেও ওই অবস্থাতেও সাঁতার কাটা ছাড়তে পারেননি। তিনি সাঁতারে অপরিসীম আনন্দ পেতেন।

এই ভাবেই জীবন কাটার মুখে কোন এক রবিবার টম জনষ্টন লক্ষ্য করলেন যে স্ত্রীর সঙ্গে হেম্পটন সমুদ্রসৈকতে রোদ উপভোগ করার সময় বহু স্নানরত মানুষ তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আঘাত লেগেছিল তাঁর পায়ে তাই সেখানে প্রচুর ক্ষতচিহ্নও ছিল। টম জনষ্টন লক্ষ্য করলেন লোকে তার ক্ষতচিহ্নে ভরা পা লক্ষ্য করে চলেছে। নিজের শারীরিক ত্রুটির কথাটা টম জনষ্টনের গেঁথে গেল এরপর।

পরের রবিবার মিসেস জনষ্টন আবার সমুদ্র তীরে যাওয়ার কথা বলতেই টম জনষ্টন যেতে রাজি হলেন না। তাঁর স্ত্রী ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, টম, আমি জানি তুমি কেন সমুদ্র সৈকতে যেতে রাজি নও। কিন্তু তোমার পায়ের ক্ষত তো সেরে গেছে।' টম জনষ্টন উত্তর দেন, তা জানি। তবু মানুষের অদ্ভুত দৃষ্টি—।' টম জনষ্টন পরে লিখেছিলেন ; আমার স্ত্রী এরপর আমাকে এমন কিছু কথা বলেছিলেন যাতে আমি আমার সমস্ত দুঃখ ভুলে যাই। আমার মন এক অনাস্বাদিত আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায় আর আমাকে সমুদ্রের তীরে যাওয়ার প্রেরণা জোগায়। তিনি বলেছিলেন, 'টম, তোমার পায়ের ক্ষতচিহ্ন যে তোমার সাহসেরই প্রতীক। তোমার গৌরবের

অংশ ওই ক্ষতচিহ্ন মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখ না। তোমার সৌভাগ্য এগুলো তুমি একদিন পেয়েছিলে, আজ ওগুলো গৌরবের সঙ্গে ধারণ করো। চল, আমরা আবার সমুদ্রের তীরে যাই।' টম জনষ্টন এরপর অন্য মানুষই হয়ে যান, তার মনে হতে থাকে সমস্ত ক্ষতচিহ্নই যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য।

আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকার বোস্টন শহরের চেম্বার অব কমার্সের সেল্‌স ম্যানেজার একটি বিক্রয় শিক্ষা-সংক্রান্ত ক্লাস খুলেছিলেন। প্রায় পাঁচশ বিক্রয় প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন। পাঁচদিনের শিক্ষা শেষে বিক্রয় প্রতিনিধিদের স্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয় যোগদানের জন্য। এই আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য ছিল তাদের স্বামীদের বিক্রয় প্রতিনিধির কাছে কিভাবে ঢের বেশি রকম বুদ্ধি ও মনোযোগের সঙ্গে কাজে উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়। যারা ওই প্রশিক্ষণে ছিলেন তাদের মধ্যে একজন হলেন 'লিভ এ নিউ লাইফ' গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ ডেভিড পাওয়ার্স। ডঃ পাওয়ার্স উপস্থিত প্রতিটি গৃহিণীকে অনুরোধ করেন যে তাঁরা যেন প্রত্যেকদিন সকালে এমন কাজ করেন যাতে তাঁদের স্বামীদের আবেগ-মণ্ডিত, আর আনন্দপূর্ণ অবস্থায় কর্মস্থলে পাঠানো সম্ভব হয়। এ রকম করার উদ্দেশ্য হল স্বামীরা যেন আরও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে নিজেদের, আর তারই সঙ্গে পরিবারেরও মঙ্গল করতে পারেন। কাজটা কঠিন হলেও কিন্তু অসম্ভব নয়। তাই গৃহিণীদের এই অনুরোধটি কাজে লাগাতে সচেষ্ট হতে হবে।

ডঃ পাওয়ার্সের মত এই রকম উঁচুদরের ও অভিজ্ঞ মানুষ যেহেতু মনে করেন যে এই পথ সত্যিই কার্যকরী হয় সেক্ষেত্রে এটা বিশ্বাস করাই উপযুক্ত। ঢের বেশি সুখী আর অনুরক্ত স্বামী লাভের ক্ষেত্রে এই ফর্মুলা দারুণ কাজ দেবে কোন সন্দেহ নেই। মানুষের ইতিহাসের পাতায় এরকম বহু কাহিনীই আছে যেখানে চেষ্টার ফলে বহু অকৃতকার্য অনায়াস ভাবেই সফলতায় মণ্ডিত হয়ে ম্যাজিকের মতই কাজ দিয়েছে। কথাটা হয়তো পাঠকপাঠিকারা অতিরঞ্জন বলেই ভাবতে চাইবেন।

কিন্তু জেনে রাখুন এর মধ্যে কণামাত্রও অতিরঞ্জিত বা অতিশয়োক্তি নেই। এই প্রসঙ্গে পৃথিবী বিখ্যাত ব্রিজ খেলোয়াড় আর ব্রিজ সম্পর্কে গ্রন্থ রচয়িতা এলি কালবার্টসনের কথা আপনাদের সামনে হাজির করছি। মিঃ কালবার্টসন আমার স্বামীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে ১৯২২ সালে তিনি যখন আমেরিকায় আসেন তখন সব কাজেই তিনি ব্যর্থ হতে শুরু করেন। কোন তাসের প্রতিযোগিতা বা খেলায় তার সাফল্য আসেনি। কিন্তু একটু একটু করে তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে যখন তিনি বিয়ে করলেন যোশেফাইন ডিলন নামে একজন মোহিনী শক্তিসম্পন্না ব্রিজ শিক্ষয়িত্রীকে। তাঁর স্ত্রী তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। স্ত্রী তাঁকে এই ভাবে আত্মবিশ্বাসী করে তোলেন যে তার মধ্যে ব্রিজ খেলোয়াড়ের সমস্ত রকম প্রতিভা সুপ্ত রয়েছে। স্ত্রীর প্রেরণা আর শিক্ষায় কালবার্টসন দক্ষ ব্রিজ খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে ব্রিজ খেলাকেই ব্যবসা আর জীবিকা হিসেবে গ্রহণও করেন। শেষ পর্যন্ত ইতিহাসই সাক্ষী কালবার্টসন দম্পতি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্রিজ খেলোয়াড়।

এই পদ্ধতিই তাই প্রয়োগ করা উচিত যে অপরের বা স্বামীর ত্রুটির কথা না বলে তার যোগ্যতার স্ফুরণ ঘটানোই হবে আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য।

ফোর্ড ব্যর্থ হয়েও সাফল্যের আশা রাখুন

উনিশ শতকের শেষদিকের এক কাহিনী। আমেরিকার মিশিগান রাজ্যের ডেট্রয়েটের ইলেকট্রিক লাইট কোম্পানীতে কাজ করতেন এক-জন মিস্ত্রি। তার প্রতি-সপ্তাহের মাইনে ছিল মাত্র এগারো ডলার। কার-খানায় কাজের সময়ও নেহাত কম ছিল না, রোজ দশ ঘণ্টা। সারাদিন পরিশ্রমের শেষে তিনি বাড়ি ফিরে আসার পর রাতের বেলা বাড়ির পিছনের একটা চালাঘরে বিশেষ একটা কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কাজটা আর কিছু নয়, তার চেষ্টা ছিল বিশেষ এক ধরণের এঞ্জিন তৈরী করা।

তার বাবা ছিলেন একজন কৃষক। বাবার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে-ছিল তার ছেলে নেহাত বাজে কাজেই সময় নষ্ট করে চলেছে। শুধু এটাই নয়, আশেপাশের সকলেও তাকে পাগল বলে হাসিঠাট্টা করতে চাইতো। কেউ বিশ্বাস করতে পারত না ওর ওই এঞ্জিন কোনদিন কাজে আসতে পারে। একমাত্র আশাবাদী ছিলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। তিনি বিশ্বাস করতেন তার স্বামী সফল হবেনই। স্বামীকে সাহায্য করার জন্য স্ত্রী প্রতিদিন সাংসারিক কাজের পর চালার নিচে স্বামীকে নানা ভাবে সাহায্য করতেন। প্রচণ্ড শীতের দিনে তিনি তেলের বাতি ধরে রেখে দাঁড়িয়ে থাকতেন যাতে স্বামী কাজ করতে পারেন। ঠাণ্ডায় স্ত্রীর দাঁতে দাঁত লেগে যেত, হাতপা নীল হয়ে যেতে চাইত। এসব কষ্ট তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না আর ভাবতেন তার স্বামী সফল হবেনই। স্ত্রীর এই অসামান্য ভূমিকা স্বামীর মধ্যে এনেছিল দারুণ প্রেরণা, তিনি স্ত্রীকে ডাকতেন বিশ্বাসিনী বলে। তিন বছর অমানুষিক পরিশ্রম করার পর এঞ্জিন কাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। ১৮৯৩ সালে এক বিচিত্র ঘটনা সকলকে স্তম্ভিত আর চমকে দেয়। যুবকটির ত্রিশতম জন্মদিনের মাত্র কয়েকদিন আগে অদ্ভুত কিছু ক্রমাগত শব্দ শুনতে পেয়ে পাড়া পড়শীরা আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা রাস্তায় তাকিয়ে প্রায় স্তম্ভিত—তাদেরই পড়শী সেই পাগল যুবকটি অর্থাৎ যার নাম হেনরি ফোর্ড, তিনি আর তাঁর স্ত্রী ঘোড়াবিহীন একটা গাড়িতে রাস্তা দিয়ে

চলেছিলেন। গাড়িটা এগিয়ে যাওয়ার পর আবার ফিরেও চলে এল। পড়শীরা নিজেদের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না।

এই ভাবেই পরিশ্রম আর প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল এক নতুন যুগ। জন্ম নিয়েছিলেন একজন অনন্য প্রতিভাধর। এই মানুষটি একদিন শতাব্দীর চেহারাই বদলে দিয়েছিলেন। হেনরি ফোর্ড নামে ওই অসীম প্রতিভাধর মানুষটি যদি যুগন্ধর জন্মদাতা অ্যাখ্যা পেতে পারেন তাহলে প্রথম মোটর গাড়ি আবিষ্কারের মা হওয়ার দাবী অবশ্যই ছিল তাঁরই যোগ্যা স্ত্রী মিসেস হেনরি ফোর্ডের। হেনরি ফোর্ড কোনদিনই বোধহয় সফল হতে পারতেন না যদি না তাঁর স্ত্রী তাকে ক্রমাগত সাহায্য আর প্রেরণা জুগিয়ে যেতেন।

পঞ্চাশ বছর আগে হেনরি ফোর্ডকে একবার প্রশ্ন করা হয় তিনি কি পৃথিবীতে আবার জন্মগ্রহণে ইচ্ছুক। হেনরি ফোর্ড পুণর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তরে হেনরি ফোর্ড বলেছিলেন, 'যদি আমার স্ত্রীর সঙ্গে চিরদিন বাস করতে পারি তাহলে আমি আর অন্য কিছুই চাই না।' নিজের স্ত্রীকে তিনি চিরকাল 'বিশ্বাসকারিনী' বলেই স্নেহ ভরে ডাকতেন আর সকলের কাছেই অকপটে বলতেন যে তিনি যেন চিরকাল স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে পারেন। অবস্থা যখন কারও পক্ষে প্রতিকূল হয় তখন প্রত্যেক স্বামীই আশা করেন তার কর্মশক্তির উপর বিশ্বাস আছে এমন কেউ তাঁকে প্রেরণা দিক। আর এরকম কেউ একজন স্ত্রীলোকই হতে পারে এবং সেই স্ত্রীলোকটি আর কেউ নয় তারই স্ত্রী।

মানুষের জীবনে বহু সময়েই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন কোন কাজই সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না। এই পরিস্থিতিতে মানুষ শুধু দুশ্চিন্তার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে, সব কাজ নিষ্ফল হয়। এই সময় এমন স্ত্রীর দরকার হয় যে স্বামীর মধ্যে জাগ্রত করবে প্রতিরোধ শক্তি আর আত্মবিশ্বাস। সে স্বামীকে বুঝিয়ে দেবে স্বামীর উপর তার বিশ্বাস কণামাত্রও টলেনি। স্ত্রী ছাড়া স্বামীর কর্মশক্তিতে বেশি আস্থা কারই বা থাকতে পারে? বিশ্বাস স্থাপন হল বিশেষ ধরণের শক্তি। বিশ্বাসই মানুষকে এগিয়ে যেতে সাহস জোগায়। এই বিশ্বাসই আবার মানুষকে

আত্মবিশ্বাসী গড়ে তোলে। রবার্ট ডিউপার নামে একজনের অভিজ্ঞতা ছিল এই রকম .

রবার্ট ডিউপার চাইতেন একজন দক্ষ বীমার বিক্রয় প্রতিনিধি হতে। ১৯৪৭ সালে তিনি এই ধরণের একটি চাকরি পেয়েও যান। কিন্তু বিশেষ সাফল্যলাভ না করায় তাঁর প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা হতে থাকে। বিশেষতঃ বীমা বিক্রির ব্যাপারে অসাফল্যই তাঁর দুশ্চিন্তা আনে। একটা চিঠিতে তিনি আমাকে লেখেন :

'একদিন আমার নিশ্চিত মনে হল বীমা বিক্রিতে আমি ব্যর্থ। কিন্তু আমার স্ত্রী ডোরিন বারবার বলতে থাকে—'এ বাধা সাময়িক। আমি জানি চেষ্টা চালালে তুমি নিশ্চয়ই সফল হবে। তোমার মধ্যে বীমা বিক্রির ক্ষমতা আছে।' এরপর আমি একটা কারখানায় কাজ পাই। ডোবিনও ওই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত। ডোরিন কিন্তু আমাকে হতোদ্যম হতে দেয়নি। দেড় বছর ধরে সে আমার সমস্ত গুণের প্রশংসাই করে যেত আর বারবার সেই কাজে আমার প্রবণতার কথা আঙুল দিয়েই নির্দেশ করতে চাইত। আমি নিজেই আমার যে সুপ্ত ক্ষমতার কথা জানতাম না ডোরিন সেটাই চোখে আঙুল তুলে নির্দেশ করত। ডোরিন না বললে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যেতাম। হয়তো এরকম না হলে আমি হয়তো বীমার কাজে না ফেরার কথাই ভাবতাম। ডোরিন বারবার আমায় বলত, 'এই বীমা বিক্রির কাজে তোমার যা প্রয়োজন তার সবই তোমার আছে—যদি চেষ্টা কর তাহলে ঠিকই সফল হবে।'

ডোরিনের ওই গভীর বিশ্বাসের অমর্যাদা আমি করতে পারি নি। তার বিশ্বাসের জোরেই এই চাকরি ছেড়ে আমি আবার বীমা বিক্রির কাজে যোগদান করলাম। ধীরে ধীরে আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে এল —এর কারণ আমি জানতাম আমার পিছনে প্রেরণা দেওয়ার জন্য রয়েছে একজন বিশ্বাসী মানুষ। সেই বিশ্বাসী আমারই স্ত্রী।'

রবার্ট ডিউপার আরও লেখেন : 'আমার ইচ্ছামত জায়গায় পৌছতে এখনও কিছু দেরী আছে, কিন্তু আমার ডোরিনকে ধন্যবাদ কারণ,

একমাত্র তারই চেষ্টা আর অনুপ্রেরণায় আমি এগিয়ে যেতে পেরেছি। ডোরিন আমায় আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে একটা অক্ষম ইঞ্জিনকেই পূর্ণ শক্তিতে চালনা করতে পেরেছে। ইঞ্জিনের যেমন জ্বালানী দরকার—আমারও তেমনই দরকার ছিল প্রেরণার। আমার নির্জীব মানসিক শক্তিকে সেই পুরোপুরি জাগাতে পেরেছে। মানুষ মাত্রেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় ভেঙে পড়ে আর তখন যদি একজন পাশে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোমার মধ্যে প্রচুর চাপা শক্তি রয়েছে, একাজ তুমি নিশ্চয়ই পারবে, তাহলে জয় তার অবশ্যম্ভাবী। আমি আমার নিজের জীবনেই এই সত্যকে উপলব্ধি করেছি। বাইবেলে তাই আছে, 'আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সার হল বিশ্বাস'—এর প্রমাণের অভাবও নেই।'

রবার্ট ডিউপারের এই কাহিনী থেকে এটাই স্পষ্ট যে একজন মানুষের স্ত্রী তার স্বামীর জীবনধারা কিভাবে সঠিক পথে চালনা করতে পারেন। স্বামীর প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস অনেক অসাধ্যই সাধন করতে পারে। স্ত্রী যে দৃষ্টিতে স্বামীর সবকিছু দেখতে পায় অন্যের পক্ষে তা সম্ভব নয়। স্ত্রী এই ধরনের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, স্বামীকে উৎসাহদান করে, প্রেমের পরশে পৃথিবীকে রূপে রঙেও ভরে তুলতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই সূত্রগুলি তাই মনে রাখবেন

মানসিক ভাব গঠনের জন্য দরকার মৌলিক জ্ঞান অর্জনের

প্রথম নিয়ম :—

১। তৎপরতা ও মনোযোগের সঙ্গে স্বামীর বক্তব্য শুনুন।

২। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রশ্ন করুন।

৩। বিশ্বাসকে নষ্ট না করে কার্যকরী ভাবে শুনুন।

দ্বিতীয় নিয়ম :—

প্রশংসা ও উৎসাহদানের মধ্য দিয়ে স্বামীর সহায়তা করুন, পথ দেখান।

তৃতীয় নিয়ম :—

স্বামী কোন কাজে ব্যর্থ হলে স্বামীর শক্তিতে আস্থা স্থাপন করুন ও তার উল্লেখ করতে থাকুন।

॥ আট ॥

স্বামীর কাজে সহায়তা করুন ও অবহিত হোন

স্বামীর কাজে একজন স্ত্রী যে কতখানি বিমোহিত আর মগ্ন থাকতে পারেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ পাওয়া যায় মিসেস আইডা ফিশারের জীবন থেকে। আইডা ফিশারের স্বামী ছিলেন মেয়ার ফিশার। মিঃ ফিশার বিরাট এক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরি প্রতিষ্ঠানের সফল বিক্রয় প্রতিনিধি। মিসেস ফিশারের একমাত্র সাধনাই ছিল তার স্বামীর কাজে সহায়তা করা। এর মধ্যে প্রধান কাজই ছিল তার স্বামীকে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে সাফল্যের তোরণে পৌঁছে দেওয়া। এজন্য তিনি কোন পরিশ্রমই আমলে আনতেন না। মিসেস ফিশারের প্রেরণায় তাঁর স্বামী জীবনে অভূতপূর্ব উন্নতি করেন। মিঃ ফিশার স্ত্রীর সাহচর্যের জন্য তাকে আদর করে 'ক্রাইডে' বলে ডাকতেন। মিসেস ফিশার একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'আমার স্বামী আহারে, চলাফেরায়, ঘুমে যে কোন কাজেও তার কাজের জন্য দারুণ উৎসুক হয়ে চিন্তা করেন। গত পঁচিশ বছর স্বামীর সাহচর্য আমাকে একই পথে চালনা করেছে। আমিও তারই সাফল্যের চিন্তায় মশগুল থাকি। যে কোন কাজেই আমার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান স্বামীর সহায়তা করে যাওয়া। এ কাজ করতে আমি দারুণ আনন্দ পাই।'

মিসেস ফিশার এই দীর্ঘকাল ধরে স্বামীর কর্মশক্তিতে অগাধ আস্থা রেখে তার বিক্রি বাড়ানোর নানা পথ বাতলে এসেছেন। স্বামী কিভাবে আরও ভালভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন, কিভাবে সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে এই চিন্তাই তিনি অহরহ করে এসেছেন। বাড়িতে থাকার সময়েও মিঃ ফিশারকে প্রচুর চিঠিপত্র লিখতে হত, সেই কাজে সাহায্য করার জন্য মিসেস ফিশার টাইপ করা শেখেন। স্বামীর সঙ্গে ঘোরার জন্য আইডো ফিশার গাড়ি চালানোও শিখেছিলেন। তিনি গর্বের সঙ্গে বারবার বলেছেন ত্রিশটি রাজ্যই তার মোটরে চড়ে ঘোরা হয়ে গেছে, টাইকুম স্কোয়ার থেকে গোল্ডেন গেট পর্যন্ত। মিসেস ফিশার নিজে আমায় বলেছিলেন, 'এ

কাজ আমার কাছে আজ খুব সহজ আর আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতাও।' স্বামীর কাজকর্মে নিজেকে মগ্ন রাখা মিসেস ফিশারের এক নেশা আর সখ। তাঁর আরও মজার একটা সখও এরই সঙ্গে গড়ে ওঠে আর তা হ'ল পুরনো ইস্ত্রি কিনে নানা রঙীন বিজ্ঞাপন হিসেবে স্বামীর বিক্রির কাজের সময় সভা ইত্যাদিতে তাই ব্যবহার করা। স্বামীর সাফল্য একটা শিহরণ আনতে চায় স্ত্রীর জীবনে। একবার এক বিক্রয় সংক্রান্ত সভায় মিঃ ফিশার চমৎকার বক্তৃতা করার পর একজন শ্রোতা তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'মিঃ ফিশার, আপনার আজকের বক্তৃতায় সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট কে হলেন, আপনার স্ত্রী না বিক্রয় প্রতিনিধিরা?'

নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে বিমোহিত মনোযোগ আকর্ষণ নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতম আর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচার। এই কারণেই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে মিঃ ফিশার তাঁর স্ত্রীকে নিজের অচ্ছেদ্য অংশ বলেই ভাবতে চাইতেন। এটা প্রমাণিত সত্য যে কোন মানুষের উন্নতির পথে তার স্ত্রীর প্রেরণা আর সহায়তাই সবার আগে চাই। স্ত্রী কিভাবে কি রকম সহায়তা দিতে পারবেন সেটা নির্ভর করে স্বামীর কাজের বিভিন্নতার উপর। এরকম ক্ষেত্রে স্বামীকেও শুধু যন্ত্র হলে চলবে না, স্ত্রীর প্রেরণা আর সহায়তা পুরোপুরি পেতে গেলে স্ত্রীর সম্পর্কেও তার কিছু কর্তব্য থাকে বৈকি। স্ত্রীর পক্ষে কেবল স্বামীর কাজে সহায়তা করাই তো সব নয়, সংসারের নানা দায়িত্ব, সন্তান মানুষ করা স্ত্রীর প্রধান কাজও বটে। তাই এই সব পরিশ্রমের ফাঁকেই স্ত্রী পারেন স্বামীকে সাহায্য করতে। তাই এটাই ঠিক যে স্ত্রী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে সহায়তা দেবেন তাই হবে প্রকৃত সাহায্য।

এই বিষয়ে মিঃ ও মিসেস পিটারের জীবন কাহিনী চমৎকার আর জ্বলন্ত উদাহরণ। মিঃ পিটার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। এর নাম 'এসকন লিমুসিন সার্ভিস'। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ ট্যাক্সি, গাড়ি, ডাকামাত্রই তা সরবরাহ করা। এর আগেও এধরণের প্রচুর প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু পিটারের ব্যবহার, কাজের ধারা

এমনই জনপ্রিয়তা মাখানো যে লোকে তাকেই ডাকতে চাইত। টেলিফোনের মাধ্যমেও পিটারকে ডাকা চলত বলে পিটার একটা টেলিফোন সার্ভিসের ব্যবস্থা করেন তারই বাড়িতে। কিন্তু একই সঙ্গে টেলিফোন আর গাড়ির কাজ করা খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। এই অবস্থা লক্ষ্য করে পিটারের স্ত্রী রোজ বলে সে টেলিফোনের কাজ করতে পারবে। পিটার সেই রকম ব্যবস্থা করে তুলতেই একটা টেলিফোন বসানো হল আর রোজ তার দায়িত্ব নিল। পিটারের স্ত্রী রোজ চমৎকার দক্ষতাতেই কাজ চালাতে পেরেছিল। সংসারের যাবতীয় কাজ, বাচ্চাদের দেখা শোনা সব কাজও রোজ নিয়মিত করে যাওয়ার সঙ্গে টেলিফোন সার্ভিসও চমৎকার ভাবে শেষ করত। মিঃ পিটার বলেছিলেন, 'প্রচুর আর ভাল মাইনে দিলেও এমন চমৎকার টেলিফোন ডেসপাচার আমার পক্ষে পাওয়া কখনই সম্ভব হত না যে রোজের মত এমন সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে। রোজ আমার শ্রেষ্ঠ বস্তু। সে আমার সব গ্রাহকদের নাম ধাম সব জানে—সে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার মূল্য জানে। আমি বাড়িতে না থাকলেও সে কাউকে বসিয়ে রাখে না, তাদের যথাযোগ্য সেবা করে। ট্যাক্সি না থাকলেও রোজ অন্য কোম্পানী থেকেও ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দেয়। রোজ না থাকলে আমি কখনই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতাম না।'

এ বিষয়ে পিটারের স্ত্রী রোজ কি বলে শুনুন। সে বলে, 'যে কোন স্ত্রীরই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল স্বামীর কাজে সাহায্য করা। যদি কোন স্ত্রী স্বামীকে সাহায্য করতে চায় তাহলে সে বাড়ির কাজ সময় মত গুছিয়ে নিতেও পারে।'

যাদের বাড়ির কাজ তেমন বিশেষ করতে হয় না তারা অনায়াসেই স্বামীকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। নিউ ইয়র্ক শহরের ৩৩ ইষ্ট এণ্ড অ্যাভিনিউর মিসেস লুইস যা করেন সেটা এই রকম :

মিসেস লুইসের স্বামী একজন চিকিৎসক। এক সময়ে মিসেস লুইসের স্বামীর কোন সহকারী না থাকায় তাঁর স্ত্রী চিকিৎসালয়ে গিয়ে স্বামীর কাজে সাহায্য করতেন। এমন যোগ্যতার সঙ্গে সব কাজ তিনি

সমাধা করেন যে শেষ পর্যন্ত পাকাপাকি ভাবেই ওই কাজে তিনি থেকে যান। সারাদিন সংসারের কাজ করার পর সন্ধ্যায় মিসেস লুইস স্বামীর কাজে সাহায্য করতে যেতেন। ডঃ লুইস এ সম্পর্কে বলেন, 'একাজ আমার স্ত্রীর বাধ্যতামূলক কোন কিছু নয়—তবুও সে আমার প্রত্যেক রোগীর প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে অভ্যস্ত। একাজে ওর কোন তুলনা হয় না।' স্বামীর কাজে স্ত্রী যখন অংশ নেয় তখন স্ত্রী এক বিশেষ বাড়তি গুণই যে অর্জন করে তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। দুজনের মিলিত কাজে কেবল যে সব এক সূত্রে গেঁথে তোলে তাই-ই নয় বরং চিরজীবনের মতই সেটা রেখাপাতও করে। স্ত্রীকে দেখা যায় এই কাজে খুবই মনোনিবেশ করে চলে। এর উদাহরণ মেলে গার্ল গাইডদের কাজ দেখে। গার্ল গাইডরা বহু বিখ্যাত কৃতী মানুষের বহু পরিশ্রম লাঘব করেছে। বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক অ্যান্টনী ট্রলোপ বলেছেন যে তাঁর লেখা বই প্রকাশিত হওয়ার আগে তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কেউই ওই পাণ্ডুলিপির একছত্রও পড়ে দেখেনি বা সমালোচনাও করেনি। বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক এলকোনসের ভয় ছিল বিয়ে করলেই তার কল্পনাশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত জুলি এলার্ড নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তার সমস্ত ধারণাই বদলে যায়। তাকে বিয়ে করার পরেই তাঁর কটি ভাল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জুলির সাহিত্যিক জ্ঞান চমৎকার ছিল। এই কারণেই স্ত্রীর সমালোচনার উপর এলকোনস নির্ভর করতে পারতেন। এলকোনসের ভাই বলেছেন 'আমার ভাই এমন একটা পাতাও লেখেন নি যা জুলি পড়ে দেখেন নি বা বিশেষ পরিবর্তন করে সজীবতা আনেন নি।'

বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ আর মৌমাছি পালন বিশারদ হিউবার মাত্র সতেরো বছর বয়সে অন্ধ হয়ে যান। এই অন্ধ অবস্থায় থাকার সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে 'প্রকৃতির ইতিহাস' বইটি পড়ার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন আর শেষ পর্যন্ত তিনিই তা স্বামীকে পড়ে শোনান। স্বামীকে বিখ্যাত করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এটা করেছিলেন। স্বামীর ব্যবসা বা বৃত্তি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা না থাকলে স্বামীকে

ভালভাবে সহায়তার কাজটি বেশ কঠিনই হয়। এ ধরণের জ্ঞান যতই বাড়ে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে সাহায্য করা ততই সহজ হয়। একটা কথা অবশ্যই জানা দরকার যে স্বামীর কাজে স্ত্রী যদিও বা কোন নির্দিষ্ট ধরণের সাহায্য নাও করে তবুও স্বামীর কাজ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করলে স্ত্রী ঢের বেশি রকম সহানুভূতি সম্পন্ন আর সহিষ্ণু হবেন। তাছাড়া স্বামীর কাছে অনেক বেশি রকম বুদ্ধিমতী সহচরীও হতে পারবেন।

স্যার জেমস রচিত এক নাটক 'প্রতিটি স্ত্রী যা জানেন' নাটকের কোন এক দৃশ্যে দেখা যায় নায়িকা ম্যাগী উইলি শুতে যাওয়ার আগে বেশ ভারি কিছু বই নিয়ে চলেছে। তাকে তার ভাইয়েরা ব্যাপারটা নিয়ে প্রশ্ন করলে ম্যাগী জানাল তার স্বামীর নানা বিষয়ে সে জানতে চায় বলেই সে আইনের বই পড়ে নিচ্ছে। স্বামীর কাজ সম্বন্ধে স্ত্রীরা আরও বেশি আর ভালভাবে জানুক এটা আজ অনেকেই চাইছেন। বিশেষ করে স্বামীর কাজে স্ত্রীদের জ্ঞান থাকায় এত ক্রিয়াশীল আর উত্তেজনাপূর্ণ কার্যকারিতা দেখা গেছে যে বহু শিল্পপতিও ভাবতে শুরু করেছেন যাতে তার কর্মচারিদের স্ত্রীরা স্বামীদের কাজ সম্পর্কে বেশি করে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। কাজটা অবশ্যই কঠিন নয়। অনেক প্রতিষ্ঠানেই বিভিন্ন পত্রিকা ইত্যাদির সাহায্যে সিনেমা, বক্তৃতার মধ্য দিয়ে মহিলাদের তাদের স্বামীর কাজ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। বিখ্যাত পত্রিকা 'খারচুনে' এফ. কে. পোচার প্রকাশ করেছেন যে তিনি দুমাস অন্তর তার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের স্ত্রীদের নানা পত্র পত্রিকা পাঠাতে অভ্যস্ত। এই সব পত্রিকায় এমন বিষয়বস্তু থাকে যাতে ওই মহিলারা উৎসুক বোধ না করে পারবেন না।

বহু অভিজ্ঞ মানুষের মত হল যে সব স্ত্রীর মনে স্বামীর অবলম্বিত কাজের প্রতি উৎসুক ভাব থাকে সে তাঁর স্বামী আর স্বামীর নিয়োগকর্তা উভয় পক্ষেরই সত্যিকার সাহায্যকারীনী হন। সুইজারল্যাণ্ডের কোন কারখানার এই বিষয়ে ভারি চমৎকার এক নিয়ম চালু আছে। সেখানে সপ্তাহের কোন এক নির্দিষ্ট দিনে কারখানার

কর্মীদের স্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারপর তাদের ওই কারখানা ভাল করে ঘুরিয়ে দেখানো হয়। এই দেখানোর সময় তাদের কাছে বিভিন্ন যন্ত্রের কাজ, উৎপাদন সবই ব্যাখ্যা করা হয়। কারখানার কর্তৃপক্ষ তাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করে দেখেছেন যে এই কাজের ফলশ্রুতিতে চমৎকার বাতাবরণ তৈরি হয়। ওই সব মহিলারা অনেকেই খুব বুদ্ধিমতী হওয়ায় নানা উৎপাদন সম্পর্কে মতামতও দেন। এতে প্রতিষ্ঠানের বেশ উন্নতিও হয়েছে দেখা গেছে। অনেক আমেরিকান প্রতিষ্ঠানেও এই রকম নিয়ম পালন করে সুফল মিলেছে। আমেরিকার ব্রেক স্যু প্রতিষ্ঠানে এই নিয়ম চালু আছে। ওই কারখানার কর্মচারিদের স্ত্রীরাই কারখানার পর্যটন দপ্তরের পরিচালনা করেন। এই সব মহিলাদের অনুরোধ জানানো হয় কোম্পানীর নিয়ম কানুন, কাজের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে তাদের মতামত ও সুপারিশ জানাতে।

মার্টিন কোল 'টুডেজ উওম্যান' নামের এক গ্রন্থে বলেন যে একজন মহিলা নিউওয়েষ্টার্ন নামে কোন কারখানা পরিদর্শন করতে গিয়ে তার স্বামীকে কোন মেশিন চালাতে দেখেন। এরপর তাঁর স্বামী বাড়ি ফিরে আসার পর মহিলাটি স্বামীকে বলেন মেশিনটার মাথার দিকে লিভার না লাগিয়ে নিচের দিকে একটা পাদানি লাগানো থাকলে পরিশ্রম ঢের কমে যেত আর উৎপাদনও বেড়ে যেতে পারে। কথাটা তাঁর স্বামীর যোগ্য মনে হওয়ায় তিনি তা কর্তৃপক্ষকে জানালেন। কর্তৃপক্ষও তা মেনে নেওয়ার পর কার্যকর করলেন। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে সত্যিই তাতে উৎপাদন প্রায় বিশ ভাগ বেড়ে যায়। এই পরামর্শের জন্য কর্মীটিকে সাড়ে তিনশ ডলার পুরস্কার দেওয়া হয়। এটা ঠিকই যে কর্মীরা তাদের জীবনের বেশির ভাগই চাকরি জীবনেই কাটায়। স্বামীর দীর্ঘ এই কর্মজীবনে তাই স্ত্রীর অংশ নেওয়া সত্যিই তার পক্ষে লাভজনক। এই কাজের মধ্য দিয়ে শুধু যে কোন পরিবারেরই লাভ হয় তাই নয় বরং প্রতিষ্ঠানও লাভবান হয়। এর সাহায্যে বাড়তি পুরস্কার ও দাবী জানানোর পথ খুলে যায়।

একটা কথা আমার মনে পড়ছে। আমি ঋষি টলষ্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' বইখানা যতবারই পড়েছি ততবারই আমার মনে পড়েছে টলষ্টয়ের স্ত্রী এই বিশাল বইটি সাতবার হাতে লিখেছিলেন। তাই মনে রাখা দরকার যে আপনি যদি আপনার স্বামীকে অতিরিক্ত উৎসাহ দিতে চান তাহলে নিচের কথাগুলো অবশ্যই মনে রাখবেন।

১। সাধ্য অনুযায়ী স্বামীর কাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন।

২। স্বামীকে তার কাজের ব্যাপারে বাইরে থেকে সহায়তা দান করুন।

॥ নয় ॥

স্বামীর সেক্রেটারীর প্রতি কেমন ব্যবহার করবেন

যে কোন ছোট্ট মেয়ের বন্ধু হল তাঁরই মা, আবার ঠিক তেমনই কোন পুরুষেরও সময় বিশেষে প্রিয়তম বন্ধু তার সেক্রেটারী। একজন সত্যিকার যোগ্য সেক্রেটারীর সাহায্যে কোন পুরুষ তার দৈনন্দিন কাজের সমাধান চমৎকার আর সুচারু ভাবেই করে ফেলতে পারেন। একজন ভাল সেক্রেটারী অনেক আগেই তার নিয়োগকর্তার মনোভাব জেনে ফেলতে পারে আর তাকেই সে সুন্দর ভাবে কাজে লাগাতে পারে। সেক্রেটারীর কাজ পেন্সিল কাটা থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়ন সবই। সেই হয়ে ওঠে আসল ম্যানেজার। আমেরিকার সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই তাই লক্ষ্য করা গেছে যোগ্য সেক্রেটারী ছাড়া কাজকর্ম সুচারু ভাবে কখনই সম্পন্ন হতে পারত না।

এতে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে জীবনে অগ্রগামী হওয়ার ক্ষেত্রে সেক্রেটারীর সাহায্য একান্ত অপরিহার্য। এখন একটা প্রশ্ন এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই উঠতে চাইবে। একজন বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন স্ত্রী এর কি রকম অর্থ করতে পারেন? এর অর্থ হল এই রকম : সেক্রেটারী আর স্ত্রী, এই দুজনেরই উদ্দেশ্য কিন্তু অভিন্ন—আসল মানুষটির জীবনের অগ্রগতি বজায় রাখা। এই ব্যক্তিটির কাজকর্মের শেষ ফল লাভের মধ্যে স্ত্রী আর সেক্রেটারী দুজনেরই একটা সীমা

নির্দেশক স্থান থাকে। যেহেতু এই দুজনেরই কাজের মূল সুরটি এক তাই এটাই হওয়া দরকার যে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে হবেন পরস্পরের পরিপূরক।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু বহুক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে বা যায় যে এই দুজন স্ত্রীলোক কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব নিয়েই হাজির হন। ফলে আসলে যা হয় তা হল একে অপরের প্রতিপত্তিতে বিদ্বেষ পোষণই করে চলতে থাকেন। সেক্রেটারী হয়তো ভাবতে থাকেন স্ত্রী বড্ড স্বার্থপর আর প্রতি কাজে হস্তক্ষেপ করেন—অন্যদিকে স্ত্রী ভাবেন যে স্বামীর সঙ্গে সেক্রেটারী মহিলার অন্য কোন সম্পর্কই হয়তো গড়ে উঠছে।

এই বিষয়ে দুজন মহিলারই মনোভাব আমি উপলব্ধি করে দেখেছি। কি ভাবে শুনবেন? দুটি ভূমিকাই পালন করে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমার বিশ্বাস জন্মায় দুজনের সুসংহত সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে স্ত্রীর ভূমিকাই হয় সবচেয়ে জরুরী। একজন দক্ষ আর ভালো সেক্রেটারীকে তার চাকরি বজায় রাখতে গেলে লোকজনের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখেই প্রতিটি পা ফেলতে হয়।

এই কথা মনে রেখেই, আমি বিশ্বাস করি অল্প কয়েকটা নিয়ম মেনে চললেই স্ত্রী হিসেবে সকলেই স্বামীর সেক্রেটারী সম্পর্কে বিদ্বেষ ভাব থেকে মুক্ত হয়ে চমৎকার এক সম্পর্ক আর সহযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তুলতে পারি। যে নিয়মের কথা উল্লেখ করলাম তাহল এই:

(১) স্বামীর সেক্রেটারীর প্রতি স্ত্রীরা কি বিদ্বেষ পোষণ না করে পারেন?

প্রায় সবাই মলিন ফ্যাকাশে চেহারার সেক্রেটারীর বদলে সুশ্রী সুন্দরী সেক্রেটারীই যে চান তা বলাই বাহুল্য। আকর্ষণীয় পরিবেশের মধ্যে কাজ করাও আবার মানুষের স্বাভাবিক একটা প্রবণতা। তাই কোন প্রতিষ্ঠানে একজন সুন্দরী ফিটফাট চেহারার সেক্রেটারী একপাত্র প্রস্ফুটিত গোলাপের মতই অফিসকে শ্রীমণ্ডিত করে তোলায় সহায়তা করেন। বহু স্ত্রীই কিন্তু আগেই বলেছি যে সেক্রেটারী যদি মহিলা হন তবে তার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করেন। তাদের ধারণা সেক্রেটারীর কাজ

অতি সহজ। তাদের সবচেয়ে হাস্যকর ধারণাই হল যে সেক্রেটারীরা শুধু তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শনই করে আর পুরুষদের কাছে প্রিয় পাত্রী হওয়ার জন্যই তারা মোটা মাইনে আর সুযোগ পায়।

দুঃখের বিষয় এই যে কাজকর্মে যারা খুব কম দক্ষ সেই ধরনের মেয়েরা আবার এই অবস্থায় স্ত্রীদেরও ঈর্ষা করতে অভ্যস্ত আর তারাও বহুক্ষেত্রেই ওই চাকরি ছেড়ে সংসারী হয়ে পারিবারিক শান্তির নীড় খুঁজতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অথচ সেক্রেটারীর চাকরি পাওয়ার কাজটিও সহজ নয়। একজন ভাল জাতের অফিস সেক্রেটারীকে গৃহিণীদের মত কঠোর পরিশ্রম করেই কাজ করতে হয়, অথচ পুরস্কার পাওয়া তেমন কুসুমাস্তীর্ণ হয় না।

সেক্রেটারীদের তাই বেশ প্রফুল্লতা বজায় রেখে কাজ করতে হয়। স্ত্রীরাও কথাটা ভেবে দেখতে পারেন, কারণ জীবনধারণের ক্ষেত্রে সেক্রেটারীরা কিন্তু তাদের কাছে ভালো ব্যবহারই আশা করে। তাই আসুন, আমরা যারা স্ত্রী তারা সেক্রেটারীদের প্রতি বিদ্বেষের ভাবটি মুছে ফেলি।

(২) কোন সেক্রেটারীকে দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করানো উচিত নয়।

বহু প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্য করা যায় অফিসের কর্তা ব্যক্তিটি তার বহু ব্যক্তিগত কাজ পারলেই সেক্রেটারীকে দিয়ে করাতে চান। যেমন মধ্যাহ্নভোজের অবকাশে তাকে থিয়েটারের টিকিট কেনানোর জন্য তাকে লাইনে দাঁড়াতে বলা বা অন্য কিছু কিনতে পাঠানো। এ কাজটি অত্যন্ত অন্যায়। আর বেচারি সেক্রেটারীর পক্ষে এই অনুরোধ না মেনেও পারা যায় না। এ ধরনের কাজ প্রায় আদেশের সমান হয়ে দাঁড়ায়। অনেকক্ষেত্রে আবার সেক্রেটারী বেচারিকে বাধ্যও করা হয়, এইভাবে তার ন্যায্য পাওনা ছুটির অবকাশকে উপভোগও করতে দেওয়া হয় না। সেক্রেটারীরা এটা মেনে নিয়েই কাজে লাগে যে তাদের অফিস বসের বহু ব্যক্তিগত কাজই করে দিতে হবে। অনেক সময় তাদের আবার 'বসের' পারিবারিক অনুষ্ঠানেও যোগদান করে অতিথি

আপ্যায়নের কাজটিও করতে হয়। 'বসের' স্ত্রীর কাজও যে করতে হয় না তা নয়, অথচ এজন্য তার পুরস্কার জোটে না কখনও।

(৩) সেক্রেটারীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা দুর্ব্যবহার কোনটাই উচিত নয়।

অধিকাংশ পুরুষের স্ত্রীরাই স্বামীর সেক্রেটারীকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। তারা তাদের মনে করে স্বামীর কৃপার পাত্রী। এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই যেখানে কর্মকর্তার স্ত্রী সেক্রেটারীকে গাল দিতেও অভ্যস্ত। তারা এর সাহায্যে নিজেদের প্রাধান্য দেখাতে চান। তারা ভুলে যান সেক্রেটারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু 'বসের' স্ত্রীর চেয়ে কম শিক্ষিতা বা মর্য্যাদার অধিকারী নয়। তাই আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন কোন সেক্রেটারী এধরণের ব্যবহারে মর্মাহত হতেই পারেন। তাই স্বামীর সেক্রেটারীর প্রতি সুরুচিসম্পন্ন আচার আচরণ করাই হল প্রত্যেক স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য।

(৪) অতিরিক্ত কাজের মূল্য দিন।

এটা খুবই প্রচলিত সত্য যে মানুষ তার যোগ্য কাজের মূল্য চায়। সে আসলে চায় তার প্রাপ্য প্রশংসা। প্রত্যেক সেক্রেটারীর কোন কোন সময় এমন সব কাজ 'বসের' জন্য করে যা অনেকক্ষেত্রেই তার স্ত্রীরই উপকারে লাগে। যদিও অনুরোধ কখনই সেই স্ত্রীর কাছ থেকে আসে না।

এখানে আমার নিজের জীবনেরই কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। আমার স্বামীর অল্পবয়স্কা সেক্রেটারী মার্লিন বার্কির কথাটাই বলি। আমরা যখন কোন ছুটির অবকাশে বাইরে যাই তখন মার্লিন আমাদের জন্য খাবার তুলে রাখে। এছাড়াও সে যখনই পারে আমাদের জন্য থিয়েটারেরও টিকিট কেটে রাখে। আমার স্বামী বা আমি একবারের জন্যও মালিনকে কোনভাবে ব্যস্ত করিনা, সে যা করে সম্পূর্ণ নিজেরই ইচ্ছাতে করে। মার্লিন বলে সে এই কাজগুলো তার কর্তব্য বলেই মনে করে আর করেও সে আনন্দ পায়। মার্লিনকে তাই আমরা ভাল না বেসে পারি না।

সেক্রেটারীরাও মানুষ—তারা তাদের কাজের মূল্য পেতে আগ্রহী।

প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের জানা দরকার, টেলিফোনে ছোট্ট কথা কোন ধন্যবাদ দান বা সুনির্বাচিত কোন পুরস্কার ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই কারও গুণ সম্বন্ধে স্বীকৃতি হয়ে ওঠে।

যে সব স্ত্রীদের স্বামী খুব বড় প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত থাকেন তাদের কখনই স্বামীর সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের বড় একটা সুযোগ আদৌ থাকে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের বেলায় এটা ঘটে না। তাদের পক্ষে পারস্পরিক যোগাযোগ সহজ হয়। সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টাই তাই এক্ষেত্রে উচিত। তাই নিচের পাঁচটি সূত্র স্মরণ রাখুন :

(১) যে কোন রকম সন্দেহের ভাব ত্যাগ করুন।
(২) ঈর্ষার ভাব পোষণ করবেন না।
(৩) সেক্রেটারীকে কখনও ব্যক্তিগত কাজে লাগাবেন না।
(৪) কখনও সহানুভূতি বা তিরস্কার করবেন না।
(৫) যখনই পারবেন সেক্রেটারীর কাজের মূল্য দিন।

॥ দশ ॥

স্বামীকে জ্ঞানার্জনে উৎসাহ দিন

স্ত্রী হিসেবে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি। যেমন ধরুন, আপনার স্বামী কি কোন পদোন্নতির চেষ্টা করেছেন? বা তা যদি না করে থাকেন এ বিষয়ে তিনি কিছু ভাবনা চিন্তা করছেন কি? আবার আপনি একজন স্ত্রী হিসেবেই বা কি করছেন? এটা জানা কথা কোন মানুষ যখন তার কর্মজীবন আরম্ভ করে তখন তার এমন জ্ঞান থাকে না যা তার ভবিষ্যত জীবনের পাঁচ, দশ বা পনেরো বছর কাজ দিতে পারে। এর অর্থ একটাই মানুষ অনবরত জ্ঞান অর্জন করেই কর্মপথে এগিয়ে চলে। জীবনের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলতে চলতেই যে নানা অভিজ্ঞতা আর বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তাতেই তার জ্ঞান সঞ্চিত হতে থাকে।

আমেরিকার বিশিষ্ট সমাজবাদী ডব্লিউ লয়েড ওয়ার্নার বলেন আমেরিকার স্বপ্ন এই বিশ্বাসের উপরেই স্থাপিত যে 'মানুষ অগ্রগামী হতে সক্ষম' আর অগ্রগামী হওয়ার প্রধানতম পথ হলো 'বিদ্যা শিক্ষা'। মিঃ ওয়ার্নার আরও বলেছিলেন যে যেসব প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনায় রত তাদের উচিত কর্মরত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ আর পদোন্নতির তালিকা দেখেই কর্মপ্রার্থীদের সুযোগ দেওয়া। বর্তমানে বহু প্রতিষ্ঠানই নিজেদের খরচে কর্মচারীদের বিশেষ ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছেন। আবার এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্য বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলার নজীর আছে। এইসব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মীদের সমস্ত খরচ বহন করে ট্রেনিং নিতে পাঠিয়ে থাকেন।

এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে অনেক মহান চরিত্র অবসর সময়ে লেখাপড়া আর বিদ্যাজনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। এই রকম এক উদাহরণ হল চার্লস্ জি. ফ্রস্ট। তিনি ছিলেন একজন ভারমণ্ট

এলাকার চর্মকার বা চলতি কথায় মুচি। অথচ এমনই একজন মানুষ তাঁর অবসর সময়ে মাত্র একঘণ্টা পড়াশোনায় ব্যস্ত থেকে বিখ্যাত একজন গণিতজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এই রকম আর একজন মানুষ হলেন শ্রমিক জন হাণ্টার। তিনি তাঁর অবসরের সময়ে 'তুলনামূলক শারীরবিদ্যা' পাঠ করে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রতি রাতে মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমোতেন। ব্যাঙ্ক কর্মচারী লুবেক তাঁর অবসর মুহূর্তে পড়াশোনা করে হয়ে ওঠেন প্রাগৈতিহাসিক বিজ্ঞানী। বিখ্যাত জর্জ স্টিফেনসন যখন রাতের বেলায় ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে কাজে ব্যস্ত থাকতেন তখন অবসর পেলেই পাটীগণিত শিখতেন। এই ভাবেই তিনি পরে আবার রেলের ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জেমস্ ওয়াট যে সময় নানা ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরি করতেন তখনই আবার অবসর সময়ে রসায়ন শাস্ত্র আর গণিত শিক্ষা করতেন। পরে আবার তিনি বাষ্পীয় শকট আবিষ্কার করেছিলেন। একবার ভেবে দেখুন, এইসব জ্ঞানী মানুষ যদি নিজেদের কাজেই শুধু ব্যস্ত থাকতেন তাহলে জগতের কি অপূরণীয় ক্ষতিই না হত!

এই পৃথিবীর প্রতিটি কাজেই রয়েছে কেবল অসম প্রতিযোগিতা, তাই কেউ যদি শুধু নিজের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকে তাহলে নিজের বা দেশের সত্যিই অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এখন প্রশ্ন হল একজন পুরুষ বা স্বামীর এই বাড়তি শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে একজন স্ত্রী কতখানি সাহায্য করতে পারে? এটা পারা যায় একমাত্র স্ত্রী যদি স্বামীর মনোভাব বুঝে নিয়েই তাকে উন্নত করার জন্য মন প্রাণ ঢেলে দিতে পারে।

এ বিষয়ে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। উদাহরণটি নাইট স্কুল বা নৈশ বিদ্যালয়ের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যে মানুষটি সপ্তাহে দুই বা পাঁচ রাত নৈশ স্কুলে আগ্রহ নিয়ে নিজেকে নিয়োজিত করে সে নিশ্চয়ই নিজেকে উন্নত করে গড়ে তোলায় আগ্রহী সন্দেহ নেই। এই কাজের জন্য স্ত্রীকে অবশ্য বিশেষ অসুবিধা বোধ করতে হতে পারে আর তা হল একাকীত্ব। সারাদিন কাজের শেষে স্বামী আবার নৈশ স্কুলে শিক্ষায় ব্যস্ত থাকলে

এই একাকীত্ব স্ত্রীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এখানে বলি, স্ত্রী কিন্তু ওই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেন। স্ত্রী এই সময় নিজেও কোন শিক্ষা নিতে পারেন। এটা মনে রাখতে হবে স্ত্রীর অনুযোগের ফলে স্বামী যদি তার ওই শিক্ষালাভের কাজটি ছেড়ে দেন তাহলে কিন্তু দুজনেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। এই ধরণের স্ত্রীদের মনে রাখতে হবে স্বামীর অকৃত-কার্যতার জন্য তারাও অনেকটাই দায়ী। কারণ স্বামীর অমনোযোগিতা কৃতকার্যের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বহু স্বামী অবশ্য বিয়ের আগেই এই ধরণের প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকতে পারেন। তাদের পক্ষে গতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য বাইরের নানা বিষয় সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করা ভাল। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা অসীম। আমার পরিচিত একজন ডাক্তার বলেছেন চিকিৎসা জগতের নতুন নতুন আবিষ্কারের সম্বন্ধে তার পাঠ করতে যত সময় লাগে সেই সময় ওই সব পাঠ করলে আর রোগী দেখার সময় থাকবে না। কথাটা হয়তো ঠিকই।

এটা নিছক সত্যি যে প্রতিটি মানুষ কখনও শ্রেষ্ঠত্বের এভারেস্টে উঠতে পারে না—এমন বহু মানুষ থাকে যারা ছোট কাজেও আত্মনিয়োগে বাধ্য হয়। সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক কথা হল কেউই কিন্তু চিরকাল নিচে পড়ে থাকেনা—অবশ্য এই জন্য তার চাই বড় হয়ে ওঠার বাসনা। তাকে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা চাই। একজন আইনজ্ঞের জীবনের উদাহরণ এই রকম। এই আইনজ্ঞ মানুষটির নাম কে ও হারউইসা থাকতেন ওকলাহোমায়। খুব সামান্য ভাবেই তার জীবন শুরু হয়। প্রথমে তিনি চাকরি নেন সামান্য পদে কানসাস ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠানে। পরে চাকরি পেয়ে যান 'শেল অয়েল' প্রতিষ্ঠানে। এই সময় তিনি একটি মেয়ের পানিগ্রহণও করেন। কিন্তু এরপরেই তারা জীবনে নেমে আসে দুর্বিপাক। চাকরি হারাতে হয় তাকে যেহেতু বহু কর্মী ছাঁটাই হয়ে যায়, আর তিনিও তাদের একজন। হারউইগের শিক্ষা আর অভিজ্ঞতার ঝুলি এতই ছোট ছিল যে সামান্য কেরানীগিরিও তার জুটল না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই হারইউগ মজুরের চাকরি নিয়ে মাটী খোঁড়ার কাজ করতে শুরু করলেন। হারউইগ সেই সময়কার

জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন ; আমার স্ত্রীও বাধ্য হয়ে এক দোকানে চাকরি নেয়। দুজনের আয়ে কোন রকমে আমাদের দিন কাটতে থাকে। তারপর টুলসা নামে এক জায়গায় বদলি হলাম। আমাকে সেখানে দেওয়া হল হিসাব বিভাগে হিসাব রক্ষার কাজ। এই কাজের বিন্দুবিসর্গও জানতাম না। আমার তাই কিছু শিক্ষা দরকার ছিল বলে আমি ওকলাহোমার 'পাইন ও অ্যাকউন্টেন্সি' নৈশ স্কুলে ভর্তি হলাম। চাকরি আর শিক্ষা আমার একই সঙ্গে চলল। আমার দক্ষতা দরকার ছিল আর তাই আমি লাভও করলাম একটু একটু করে। তিন বছরের মধ্যে আমার আয় দ্বিগুণ হয়ে গেল। চার বছরের শেষে আমি একজন আইনবিদ হয়ে উঠলাম আর ওকালতি করার জন্য বিচার বিভাগের অনুমতি চাইলাম।

'এইটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আবার তাই নতুন করে নৈশ স্কুলে পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট পরীক্ষার বিষয়ে ভর্তি হই। তিনবছর শেষে 'জনগণের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার কোর্স শেষ করলাম। সর্বসাকুল্যে নাইট স্কুলে ট্রেনিং থেকে আমি যা পেয়েছি, বারো বছর আগে ঘণ্টায় চল্লিশ সেণ্ট মজুরীতে পরিখা খোঁড়ার কাজের থেকে শতকরা বারো'শ গুণ বেড়ে যায়।'

মিঃ হারউইগ এখন ওকালতি ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছেন। যে ওকলাহোমা 'ল' আর অ্যাকাউন্ট্যান্সী কলেজে তার শিক্ষালাভ আজ সেখানেও তিনি শিক্ষকের কাজ করছেন। তার জীবন যে কোন উৎসাহী একজন মানুষের কাছে ভবিষ্যতের আনন্দের বার্তা বয়ে আমারই সংকেত দেখাতে পাবে। এই জীবন গড়ে তোলার কাজে তাঁর স্ত্রীর ভূমিকাও দারুণ প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁর স্ত্রীর অনুপ্রেরণা আর নিঃস্বার্থ সেবা ছাড়া মিঃ হারউইগের এই সাফল্য সম্ভবপর হতো না।

একথাটা জানা দরকার যে সারাদিন কাজ করার পর প্রতিটি রাতে বিদ্যাশিক্ষা করে যাওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। একাজে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ চাই স্ত্রীর কাছ থেকে। যেন চলার পথে স্বামীর পদস্খলন না হয়। স্বামী কখন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন, ক্লান্ত হন বা কখনও

সাফল্য সম্বন্ধে হতাশা আসে, সে সম্পর্কে স্ত্রীকে সব সময়েই সতর্ক থেকে স্বামীকে অনবরত উৎসাহ দান করে যেতে হয়। স্ত্রীকেও যা করতে হবে তা আরও কঠিন কাজ। নিজেকে জৈবিক তাড়না থেকেও অবনমিত রাখতে হয়, এ সত্যিই কঠিন কাজ। সবচেয়ে সহজ কাজ হতে পারে স্ত্রীকেও কোন শিক্ষার কাজে নিযুক্ত রাখা। যাই হোক এই শিক্ষার কাজ খেলার মতই সহজ মনে হতে পারে যদি স্বামী স্ত্রী একই সঙ্গে একই ক্লাসে শিক্ষারত থাকতে পারেন। অবশ্য সন্তানসহ স্ত্রীর এরকম অবস্থা কাজে লাগানো কঠিনই হবে। এরকম কোন স্ত্রী অন্য উপায় কাজে লাগাতে পারবেন। বাড়িতে লাইব্রেরী থেকে বই এনে তিনি তার জ্ঞান বাড়তে পারেন। স্বামীর শিক্ষার কালে এই ভাবেই স্ত্রীও কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেন।

আমার স্বামী এক যাতুঘরের তিমি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলেন একজন সাধারণ মানুষ যদি তিমি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হতে চায় তাহলে তার কতদিন লাগতে পারে? বিশেষতঃ প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি যদি তিমির বিষয়ে নানা ধরণের বই পড়েন আর আলোচনাও করেন। এ বিষয়ে তিমি বিশেষজ্ঞ উত্তরে বলেন মোটামুটি তিন মাসেই যে কোন সাধারণ মানুষ এই তিমি বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারলে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করতে পারে। অর্থাৎ এর মধ্যে যে কথাটি রয়েছে তা হল জ্ঞানের স্পৃহাই মানুষকে তৎপর করে তুলতে পারে। তাই কোন অমূল্য সুযোগ হাতছাড়া করা সময় থাকতে উচিত নয়।

একজন স্ত্রী হিসেবে স্বামীর এই ধরণের শিক্ষা প্রচেষ্টার জন্য যদি আপনার সঙ্গতি থাকে তাহলে এই থেকেই প্রচুর আনন্দ আর প্রফুল্লতা লাভ করতে পারেন। আমেরিকায় এই ব্যাপারে একটু বাড়তি সুবিধাও রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ এ দেশে সবচেয়ে ভাল আর বড় সাধারণ পাঠাগার আছে। মানব জাতির জ্ঞানভাণ্ডার বাড়িয়ে তোলার কাজে এই পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অসীম।

শিক্ষার কাজ জ্ঞান বাড়ানো। চার বছর ধরে কোন ছাত্র যখন কলেজে পড়তে থাকে তখন যে শিক্ষালাভ হয় তাকে আরও বাড়ানো দরকার। কলেজী শিক্ষাই সব নয়। তাই স্ত্রী হিসেবে স্বামীর নতুন কোন শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা পূরণে উৎসাহ দিতে থাকুন আর তারই সঙ্গে নিজেও শিক্ষিত হয়ে উঠন। এর আনন্দই কিন্তু আলাদা। স্বামী যে কাজ করেন বা করতে ইচ্ছুক তার সাহায্যেই তার শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারণ হয়। স্ত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় হল : যে স্বামী জীবনে নিজের উন্নতির জন্য উৎসুক সেই স্বামীর কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা আর সেই ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। এটা মনে রাখবেন স্বামীর এই ধরণের শিক্ষালাভ অবশ্যই খরচ সাপেক্ষ আর সেই খরচ কখনই বাজে খরচ ভাবা ঠিক নয়। এই খরচকে মনে করতে হবে সম্পূর্ণ পরিবারেরই ভবিষ্যতের সঞ্চয়। অবসর সময়ে যখন এই বাড়তি শিক্ষার কাজটি শুরু হয় আর বেশ ক'বছর ধরে চলতে থাকে। তখন স্ত্রী অনেক সময়েই ভাবতে পারেন এটা অপব্যয় কিনা। কিন্তু স্বামীর সব সাফল্যই ভবিষ্যত জীবনে তাকে যে অপরিসীম সুখ আর আনন্দ দেয় তার তুলনায় বর্তমান কষ্ট স্বীকার তুচ্ছ বলেই মনে হবে। এইভাবেই স্বাবলম্বী মানুষ গড়ে ওঠে।

এ বিষয়ে পাঠক পাঠিকাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহলে সম্প্রতি আমেরিকান স্কুল ও কলেজ অ্যাসোসিয়েশন দেওয়া হোরেশিও এলজার এডওয়ার্ড পুরস্কারে ভূষিত মানুষদের দিকে একবার তাকাতে পারেন। এই সব পুরস্কার প্রাপক হলেন, অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেণ্ট হারবার্ট হুভার। হুভার ছিলেন আইওয়ার একজন কর্মকারের অনাথ সন্তান। এছাড়া হেনরি ক্রোষ্টন—যিনি এক সময়ে একজন সুইচবোর্ড অপারেটর ছিলেন আর বর্তমানে তিনি বিরাট এক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। টমাস জে ওয়াটসন নামে আর একজন সপ্তাহে মাত্র দু ডলার পারিশ্রমিকে জীবন শুরু করে বর্তমানে ইণ্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিনের প্রেসিডেণ্ট। পল ইবম্যান প্রথম জীবনে শ্রমিক হিসেবে জীবন আরম্ভ করে বর্তমানে হয়েছেন বোর্ড অব স্টুডিবেকার

কর্পোরেশনের প্রধান। তাই মনে রাখবেন আপনার স্বামীও শিক্ষার সুযোগ নিয়ে আপনারই উৎসাহ কাজে লাগিয়ে জীবনে চমৎকার প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন।

পৃথিবীতে এরকম ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে যেখানে একজন সত্যিকারের কর্মতৎপর মানুষ তার জ্ঞান ও কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করার কাজে অনেক বেশি আগ্রহশীল হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্নেষ্ট গ্রস এক রাতে আমায় বলেন যে নিজের জ্ঞানার্জনস্পৃহা বাড়ানোর জন্য তিনি নাইট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বিরাট চিঠিপত্র লেখার কাজে আরও বেশি রকম দক্ষতা অর্জন করা। আপনার স্বামী যদি একজন 'শিক্ষার্থী' হন তা হলে এর জন্য আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আর তাই তাকে উৎসাহ দেওয়াই কর্তব্য। এর ফলে আপনার স্বামীর কর্মক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ডঃ লরেন্স বলেন : 'একটিমাত্র জিনিসই মানুষের মনকে শিক্ষাদান করতে পারে—আর তা হল নিজের মনকে ইচ্ছা করে কাজে লাগানো। আপনি মনকে চালনা করে তাকে সহায়তা দিতে পারেন, তাকে পথ দেখাতে পারেন, পারেন প্রস্তাব দিতে। যা প্রতিদিনের চেষ্টায় পাওয়া যায় তাই প্রকৃত লাভ। মনের ইচ্ছাই তাই উন্নতির প্রকৃত সহায়ক।'

॥ এগারো ॥

আচমকা দুর্যোগে মন শক্ত রাখুন

একজনের জীবন কাহিনী এখানে আপনাদের শোনাব। নিউ ইয়র্ক শহরের জোসেফ আইজেনবার্গ এক কাপড় ধোলাইয়ের কারখানায় কাজ করত। হঠাৎই তাকে বরখাস্ত করা হয়। মধ্যবয়স্ক লোকটির পক্ষে কোন ব্যবসা বুদ্ধি বা কোন রকম প্রশিক্ষণ না থাকায় এমন লোকের পক্ষে চাকরি পাওয়া খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়াল। আইজেনবার্গ দম্পতি শুধু চিন্তায় ভেঙে পড়েন। শেষ পর্যন্ত জমা সামান্য পুঁজি দিয়ে তারা ছোট একটা রুটির কারখানা কিনে নিল। দাম অবশ্য কমই ছিল। কিন্তু সব সঞ্চয়ই তাদের শেষ হয়ে গেল এতে। তারা আগ্রহ নিয়ে কাজ শুরু করল। কোন কর্মচারি রাখার ক্ষমতা তাদের ছিল না, তাই তারা ভাবলেন নিজেরাই কাজ করবেন, মিসেস আইজেনবার্গ-ই কাজ করতে থাকেন। বাড়ির কাজকর্ম করেও তিনি রুটির কারখানায় কাজ করে চললেন। সেখানে খরিদ্দারদের সঙ্গে আদান প্রদান, দোকান সাফাই, ইত্যাদি নানা পরিশ্রমসাধ্য কাজই তাকে করতে হয়। এই কাজে প্রায় আট-দশ ঘণ্টা তার পরিশ্রম হত। এই পরিশ্রমে অন্য কেউ হয়তো নিরুৎসাহ হয়ে পড়তেন। মিসেস আইজেনবার্গ কিন্তু বলেন, আমি এই সব কাজ আনন্দের সঙ্গেই করি। কারণ আমি জানি এর মধ্য দিয়েই আমার স্বামী নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন। এই পাঁচ বছরে আমাদের অবস্থার বহু পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের ছোট্ট ব্যবসা আজ উন্নতিরও মুখ দেখেছে। আমাদের নিজেদেরই পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এই উন্নতি আর প্রসার হয়েছে বলে আমরা গর্ব বোধ করি।' দুঃখের কথা আইজেনবার্গ পরিবারের মত দুঃসময় আর দুর্যোগ কত পরিবারেই আসে। কিন্তু অনেকেই কোন পরিশ্রমের কাজে অপারগ হওয়ায় কত জীবনই ব্যর্থ হয়ে যায়। এসব

ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ত্রীরা স্বামীর কাজে সাহায্য করতে অনেক ক্ষেত্রে নারাজ।

অনেক স্ত্রীই ভাবে সৌভাগ্যের বা দুর্ভাগ্যের দিনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব স্বামীই একমাত্র বহণ করবে এবং এটা দেখার দায়িত্ব তারই। এই সব স্ত্রীরা কিন্তু ভুলে যান কোন গাড়ির হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে চাকা কাদায় বসে গেলে তাকে তোলার জন্য বাইরের শক্তির প্রয়োজন হয়। এই বিষয়ে আর একজন স্ত্রার কাহিনী আপনাদের শোনাব। তিনি নিজের সমস্ত উপার্জন ক্ষমতাই স্বামীর সাহায্যের কাজে লাগিয়ে ছিলেন। মহিলার নাম মিসেস উইলিয়াম আর কোলম্যান তিনি থাকতেন টেনেসিতে। মিসেস কোলম্যান যে কেবল স্বামীর কাজেই সাহায্য করেন তাই নয় নিজের অবলম্বিত ব্যবসার মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত উপার্জনই তিনি পরিবারের স্বচ্ছলতার কাজে লাগিয়েছিলেন। মিসেস কোলম্যান একজন নার্স। ১৯৩৬ সালে মিসেস কোলম্যান যখন মিঃ কোলম্যানকে বিয়ে করেন তখন উইলিয়াম কোলম্যান দিনের বেলা চাকরি আর রাতের বেলা নৈশ স্কুলে শিক্ষালাভ করতেন। মিসেস কোলম্যানও নার্সের কাজ করে আগের মতই উপার্জন করছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল বিল কোলম্যান যাতে রাতের পড়াশোনাতে ছেদ না ঘটান। আশ্চর্যের বিষয় হল মিসেস কোলম্যান যে রাতে তাদের কন্যা সন্তান প্রসব করেন সে রাতেও বিলকে স্কুলে যেতে অনুরোধ করেন যাতে এক রাতের জন্যও কামাই না হয়। সত্যিই মিঃ কোলম্যান একদিনও অনুপস্থিত থাকেন নি। ছ'বছরের মধ্যেও এটা ঘটেনি। ছ'বছর পর তিনি মা, স্ত্রী ও মেয়ের আনন্দের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। এমন একদিন ছিল যখন বিল কোলম্যান রঙ না করা লোহার রান্নার আসবাবপত্র বিক্রি করেছিলেন আর সে কাজে তাকে সাহায্য করতেন তারই স্ত্রী। দুজনে রান্না করা খাবারও একসময় বিক্রি করেন। এরপর একসময় বিলের বাবা মারা যান। বিলের ভাইয়ের একটি ছাপাখানা ছিল, বিল ও তাঁর স্ত্রী ভাইয়ের অংশ কিনে নেন। হেলেন কোলম্যান আমাকে লিখেছিলেন, 'আমি এটা বুঝতে পেরে আনন্দিত যে আমাদের

স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে তাহলে পাঁচ বছরের মধ্যেই আমাদের বাড়ি আর ব্যবসার ঋণ শোধ করতে পারব। তারপর আমার চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিল আর ছেলেমেয়েদের জন্য সেবার কাজ করতে শুরু করব।' মিসেস কোলম্যান আর মিসেস আইজেনবার্গের জীবনের এই উদাহরণ নিঃসন্দেহে সত্যিকার এক একজন বাস্তববাদী স্ত্রীরই কাহিনী। স্বামীর কাজে সহায়তা করে তার অংশীদার হওয়া আনন্দের কাজ এতে জীবন সুখময় হয়ে ওঠে। এমন অনেক সময় জীবনে আসে যখন স্ত্রীকে স্বামীর চাকুরিহীন বা অসুস্থতার জীবনে সাময়িকভাবে কাজে লাগতেও হয়। স্ত্রী যখন কাজ করেন তখন সেটা শুধু সখ নয়, বা আত্মসন্তুষ্টিও নয়। একাজ শুধু দুর্যোগ বা সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্যই।

আমার পরিচিত একজন মহিলার কথা উল্লেখ করব। ভদ্রমহিলা সঙ্কট এসে পড়ায় চমৎকার মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়ে কাজ করে যান আর পরিবারকে বাঁচানোর জন্য এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন। মহিলার নাম মিসেস জিনা স্টার্ন। তিনি নিউইয়র্কের ৪২২ স্ট্যানলী অ্যাভিনিউয়ের, ওয়েষ্টফিল্ডে স্বামী ও পাঁচটি সন্তান নিয়ে বাস করেন।

মিঃ স্টার্নের পেশা বিক্রি করা অর্থাৎ তিনি একজন সেলসম্যান। কয়েক বছর আগে কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তার আর কাজ করার মত ক্ষমতা ছিল না। পাঁচটি সন্তানের আর স্ত্রীর ভরণপোষণ তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

এই অবস্থায় মিসেস স্টার্ন খুবই চিন্তায় পড়ে যান। কিভাবে তার পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব? নিজের যোগ্যতার কথাই তিনি ভাবতে আরম্ভ করেন। তার কোন কাজে প্রশিক্ষণ বা অফিসে কাজ করারও যোগ্যতা ছিল না। তাঁর একমাত্র একটি গুণই ছিল আর তাহল চমৎকার রান্নার হাত। রান্না করতে মিসেস স্টার্নের ভালোও লাগত। ব্যাপারটা তিনি কথায় কথায় কয়েকজন পরিচিত মানুষদের বলেও ফেলেছিলেন। তারা তাদের দেওয়া পার্টির খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব এরপর মিসেস স্টার্নকেই দিতে আরম্ভ করলেন। মিসেস স্টার্নের রান্না করা চমৎকার সুস্বাদু খাবার লোকের দারুণ পছন্দ হতে লাগল।

অল্পদিনের মধ্যেই তার পরিচিতি আর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। এরপর অযাচিতভাবেই মিসেস স্টার্ন খাবারের বায়না পেতে লাগলেন। ফলে কাজের চাপ থাকায় মিসেস স্টার্ন কয়েকজন সাহায্যকারীকেও তৈরি করে নিলেন। মিসেস স্টার্ন সব খাবার তৈরি কাজটাই করতেন নিজের বাড়িতে। তাই তার স্বামী আর ছেলেমেয়েরাও তাকে সাহায্য করতে চাইত। একটু একটু করে ব্যবসা বেশ বেড়ে উঠল। এক সময়ে মিসেস স্টার্ন একজন বিখ্যাত খাদ্য সরবরাহকারিনী হয়ে উঠলেন।

বর্তমানে তাদের ব্যবসা এতই বড় হয়ে উঠেছে যে বাধ্য হয়ে তাদের কয়েকজন স্থায়ী কর্মীও নিয়োগ করতে হয়েছে। মিসেস স্টার্ন বর্তমানে তাঁর প্রসিদ্ধ 'শীতল বিস্কুটে'র প্যাকেটে ও পার্টি উপলক্ষে খাবার সরবরাহ করে থাকেন প্রায় পঞ্চাশ মাইল এলাকা জুড়ে।

মিসেস মার্গারেট স্টার্নের ওই চমৎকার পরিকল্পনাটি এমনই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বামী মিঃ স্টার্নকেও কাজে নামতে হল। তিনিই হয়ে উঠলেন স্ত্রীর প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। সারাদিন রাত তাকেও কাজ করতে হয়। মিসেস মার্গারেট স্টার্ন বলেন, 'আমি এখন নতুন নতুন খাবার আবিষ্কারের চেষ্টাতেই মগ্ন থাকি। কিভাবে আরও ভাল করে খাদ্য সরবরাহ করতে পারি তারই চেষ্টা করি। আমি খুবই খুশি যে আমার স্বামী ব্যবসার সব খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর রাখেন।'

এ কথা টের পাওয়া বা জানা বোধ হয় অনেক সময়েই প্রায় অসম্ভব যে মানুষের জীবনে খারাপ মুহূর্ত যেকোন সময় আসতে পারে। প্রধানতঃ এটা হল আর্থিক কোন দুঃসময়। এরকম কোন সময় এলে মানুষকে জীবন ধারণের জন্য অর্থ উপার্জনের একটা বিকল্প পথ অনুসন্ধান করতে হবে। এই রকম কোন অবস্থার জন্য সবাইকেই কিছু ভাবনা চিন্তা করতে হবে যাতে সঙ্কটের সময়ে সেই বাধা অতিক্রম করতে পারেন। আচমকা এমন দুর্যোগ এলে ভেঙে না পড়ে মন শক্ত রাখুন।

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে সূত্র

স্বামীকে অতিরিক্ত সাহায্য দানের এই চারটি নিয়ম মনে রাখবেন :

(১) স্বামীর কাজ সম্বন্ধে স্ত্রী হিসেবে অবহিত থেকে তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যান।

(২) স্বামীর সেক্রেটারীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন।

(৩) শিক্ষার সুযোগ নিয়ে স্বামীকে তাতে লেগে থাকতে অনুপ্রেরণা দিন আর উৎসাহিত করুন। নৈশ স্কুল বা এমনকি বাড়িতে বসেও তিনি যাতে বাড়তি শিক্ষালাভ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন।

(৪) আকস্মিক কোন দুর্যোগ বা অসুবিধার জন্য মনকে তৈরি রাখুন। প্রয়োজনে কাজে আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যেও নিজেকে তৈরি করুন। এজন্য নিজের কর্মকুশলতা বাড়াতে চেষ্টা করুন।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ বারো ॥

কিভাবে নিজেকে উপযুক্ত করবেন

বহু বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারেরা এক ধরণের মহিলার খুবই সমালোচনা করে থাকেন। তাদের মত হল এমন স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদের নিজের কাজের জায়গাতেই আবদ্ধ রাখতে চান—তারা কোন রকমেই স্বামীদের অন্য জায়গায় যেতে দিতে রাজি হন না। এর উদ্দেশ্য একটাই—তারা নিজেদের বন্ধুবান্ধবী পরিচিতজনদের ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি নন। ফিলাডেলফিয়ার 'আটলান্টিক রিফাইনিং' কোম্পানীর ম্যানেজার এই ধরণের স্বার্থপর মেয়েদের দু'চোখে পারেন না। তিনি বলেছেন যে এই ধরণের মেয়েরাই হয়ে ওঠে যেকোন পুরুষের উন্নতিলাভের প্রধান অন্তরায়। আর একজন ম্যানেজার এক তরুণ কর্মীর সম্পর্কে বলেছিলেন যে বেচারি শুধু স্ত্রীর জন্যই পদোন্নতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সে বলেছিল তার স্ত্রী ওই শহর ছেড়ে অন্য কোন শহরে যেতে রাজি হয়নি। তার স্ত্রীর বক্তব্য হল সে তার বাবা মা; পুরনো বন্ধুবান্ধবী; গির্জা আর প্রিয় সুন্দর বৈঠকখানাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে তার মন চায় না।

এটা ঠিক কথা যে নিজের পরিচিত গণ্ডী নিজের বাসস্থানটি ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে বেশ একটু সাহসের দরকার হয়। মেয়েরা কিন্তু এ ব্যাপারে প্রকৃতিগত দিক দিয়েই দক্ষ হতে পারে, কারণ সবদেশেই প্রায় বিয়ের পর তারা স্বামীর কাছেই চলে আসে। তাদের তাই এ ব্যাপারে একটু সহনশীলতার প্রমাণ রাখতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক ঘটনায় দেখা যায় যে বহু বিয়েই এক সেনানিবাস থেকে অন্য সেনানিবাসে যাওয়ার কষ্ট সহ্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই সব স্বামী স্ত্রীরা অনুন্নত পরিবেশ আর অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুখের সংসার গড়তে পারেনি, অথচ সামান্য সহনশীলতাতেই এটা হতে পারত। আবার

ঠিক উল্টো ঘটনাও কম ঘটে না। একজন সহনশীল স্ত্রীই তাদের চলার পথের সব বাধা ইচ্ছে করলেই কাটিয়ে উঠতে পারেন। এমন একজন মহিলা হলেন মিসেস লিওনার্ড কাসনার। উওম্যান'স ডে ম্যাগাজিন নামের এক পত্রিকায় মিসেস কাসনার নিজের কাহিনী লিখেছিলেন। তিনি যা লেখেন তা হল এই রকম : 'তু'বছর আগে আমার স্বামীর ডাক পড়েছিল এক নৌযুদ্ধে যোগদান করার জন্য। আমাকেও যেতে হল। কিন্তু আমাদের নতুন সুন্দর বাড়ি ছেড়ে মাত্র তু'বছরের ছোট ছেলেকে নিয়ে যেতে হবে জেনে, বিশেষ করে বিদেশে, আমার মন খুবই খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু কোন উপায় ছিল না তাই যেতে হল। স্বামীর সঙ্গে হাজির হলাম প্রথম সেনা ছাউনীতে নিবাসে।

আমি কেবলই ভাবছিলাম আমাদের চরম তুঃখের দিনই বোধ হয় এসে গেছে। কিন্তু নতুন আবহাওয়া আর নতুন নতুন জায়গায় ঘোরার পর ভেবে দেখতে লাগলাম ব্যাপারটা সত্যিই তো তেমন খারাপ হল না। বুঝতে পারলাম আমার আগের মনোভাব একেবারে ছেলে-মানুষী.তেই পূর্ণ ছিল। আমার স্বামী শীগ্‌গীরই কাজ থেকে অবসর নিতে চলেছেন। আমরা আবার ফিরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করার চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করেছি। ভবিষ্যত জীবনের হাতছানিতে রোমাঞ্চিত হয়েও কিন্তু বর্তমান জীবন থেকে সরে যাওয়াটাও খারাপ লাগতে আরম্ভ করেছে।

'যে তু'বছর এই নতুন জীবনে কাটালাম তার জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ না হয়ে পারছি না। এই তু'বছরে বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাদের সংশ্রবে বেশ আনন্দ পেয়েছি। দৈনন্দিন জীবনের ছোট খাটো সমস্ত অসুবিধা এখন আমি কাটিয়ে উঠতে শিখেছি।

'আজ আমি বুঝতে শিখেছি সুখের ঘর সংসার বলতে কেবলমাত্র কিছু সুযোগ সুবিধা আর বস্তুকেই বোঝায় না—বরং যে মানুষদের সংশ্রবে আমরা বাস করি তাদের পারস্পারিক সহযোগিতা আর সহমর্মিতাকেই বোঝায়। পারস্পারিক প্রীতি ও ভালবাসা, মূল্যবোধ

আর পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিয়ে জীবন উপভোগই আসল জীবনের মাধুর্য।'

তাই কোন কারণে পরিচিত পরিবেশ থেকে দূরে কোথাও যেতে হলে যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হন তাহলে নিচের চারটি পরিকল্পনার কথা মনে রাখতে ভুলবেন না :

(১) মনে কখনও এ আশা রাখবেন না যে পরিচিত পরিবেশই নতুন জায়গায় পাবেন। মানুষ যেমন আলাদা চরিত্রের, নতুন জায়গা ও তার পরিবেশও সেই রকম আলাদা হয়। স্বামীর আগের চাকরি বা কর্মস্থল যদি কোন ভাবেও বর্তমানের চেয়ে কম মর্যাদার হয় তাহলেও নিরুৎসাহ হবেন না। মনে রাখবেন বর্তমানও অতীতের চেয়ে বেশি মর্যাদা আনতে পারে।

(২) অভ্যস্ত আর পরিচিত সুযোগ সুবিধা থেকে হঠাৎ বঞ্চিত হতে হলেও ভগ্নোৎসাহ হবেন না। যা পাচ্ছেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে নিজের কর্মশক্তিকে পরীক্ষা করুন। হয়তো দেখবেন আপনার কর্মশক্তিতে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আত্মবিশ্বাসই মূল শক্তি।

আমার নিজের জীবন থেকে একটা উদাহরণ রাখছি।

এক গ্রীষ্মকালে আমার স্বামী উইওমিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাকোর্সে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। থাকার জায়গার অভাবে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম প্রবীণ সৈনিক ও তাদের পরিবারদের জন্য বানানো অস্থায়ী বাড়ির একটিতে। আমি স্বীকার করছি নতুন এই পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব বলে ভাবতে পারিনি। কিন্তু আমার ভুল খুব তাড়াতাড়িই ভেঙে গেল। ওখানে বাস করতে গিয়ে আমি আমার জীবনের এক মূল্যবান আর শ্রেষ্ঠ পুরস্কারই লাভ করেছিলাম। আমার সুন্দর এক অভিজ্ঞতাও লাভ হল। আমি দেখলাম আমাদের কাছাকছি যারা ছিল তারা কেমন নিশ্চিন্তে আরামেই জীবন কাটিয়ে চলেছে। দেখলাম ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, মায়েরা শিশুদের পরিচর্যা করছেন। সব দেখে নিজের মনোভাবের জন্য লজ্জিত বোধ করেছিলাম।

ওই গ্রীষ্মকালীন অবকাশেই বহু মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার অভিজ্ঞতাও ঢের বেড়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে কৃতকার্যতা এবং আনন্দের কণামাত্রও সম্পর্ক নেই। এর সবই মানসিক।

(৩) যে কোন রকম অবস্থার মধ্যেই পড়ুন না কেন কোনভাবেই বা কখনও সেই অবস্থার ভাল মন্দ না দেখে তার বিচার করবেন না।

আমার পরিচিত একজন মহিলার কাহিনী বলছি। মহিলাটির স্বামী পদোন্নতির ফলে অন্য জায়গায় বদলী হন। মহিলাটিও স্বামীর সঙ্গে বড় কোন শিল্প শহরে গেলেন। স্বামী ওই পদোন্নতির জন্য বহু দিন ধরেই অপেক্ষা করছিলেন। স্ত্রী কিন্তু ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি ওই শহরে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা থাকার পরেই অসহ্য বোধ হওয়ায় আবার আগেকার বাড়িতে, নিজের শহরে চলে এলেন। স্বামীকে এরপর দুজায়গার খরচ চালাতে হল আর সমস্ত আয়ই নিঃশেষ হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক আগেকার মাইনের আগের পদ ও জায়গায় ফেরার আবেদন জানালেন—ভদ্রলোকের স্ত্রী যেহেতু পদোন্নতির জায়গা পছন্দ করেন নি।

(৪) নতুন সুযোগ সুবিধার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন—পিছনে ফেলে আসা কিছুর জন্য চিন্তা করবেন না।

নতুন কোন জায়গায় যেতে হলে সেখানে প্রথমেই নিজে এগিয়ে গিয়ে সেখানকার মানুষের সঙ্গে আলাপ করুন, বন্ধুত্ব স্থাপন করুন। এই কাজ করার সময় গির্জা, ক্লাব বা সভা ইত্যাদিতে যান, এবং যোগদান করুন। এই ভাবেই মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠুন। যে সব কাজকর্ম আপনার রুচি বিরুদ্ধ তার সম্বন্ধে অনুযোগ না জানিয়ে সেগুলোর উন্নতি সাধনের চেষ্টা চালান। মনে রাখবেন এই দুনিয়ায় কোন কিছুই নিষ্কলঙ্ক নয়—প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির মধ্যেই সমান ভাবে থাকে দোষ বা গুণ।

আর একজনের কথা আপনাদের শোনাব। তিনি হলেন মিসেস রবার্ট ওয়াটসন। তিনি বর্তমানে থাকেন ওকলাহোমায়। তিনি তার

স্বামীর সঙ্গে প্রায় সারা দুনিয়াই ভ্রমণ করেছেন। তার স্বামী মিঃ ওয়াটসন কার্টার অয়েল কোম্পানীর ভূতাত্ত্বিক।

ওয়াটসন দম্পতি তাদের চারটি সন্তানকে নিয়ে পৃথিবীর সুদূর আদিম পরিবেশের মধ্যে থেকেছেন। ওই ভাবে অচেনা অজানা পরিবেশে বাস করে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করে তারা প্রচুর আনন্দও পেয়েছেন। সুখবোধও যে তারা না করেছেন তাও নয়। ওয়াটসন পরিবারের মত সত্যিকার আদর্শ পরিবার পাওয়া সত্যিই কঠিন।

মিসেস ওয়াটসন অত্যন্ত দক্ষ মহিলা। তিনি বলেন, 'যে কোন মুহূর্তে আমি আমার পরিচিত পরিবেশ আর বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে দ্বিধা বোধ করিনা। এ কাজ আমার কাছে অতি সহজ। আমার অনুভূতি আর প্রবণতাকে আমি সেই ভাবেই তৈরি রাখি। আমাদের পরিবার আজ বুঝতে পেরেছে যে পৃথিবীর যে কোন জায়গাই তাদের সকলকেই সমান আনন্দ, শিক্ষা আর উপভোগের সমস্ত রকম উপকরণই সরবরাহ করতে পারে। এজন্য যে আগ্রহ থাকা দরকার তার সবটাই আমাদের সকলের আছে।

আমরা সবাই যখন সুদূর বাহামা দ্বীপপুঞ্জে থেকেছিলাম তখন একদিন জানতে পারি একজন বিখ্যাত ডুবুরী সমুদ্রে ডুবুরীর কাজ সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক শিক্ষাদান করছেন। আমাদের মেয়ে সুমির ডুবুরীর কাজে খুবই আগ্রহ লক্ষ্য করে তাকে ওই মানুষটির কাছে পাঠালাম। এমন চমৎকার সুযোগ সহসা মেলেনা।

'আমরা সুমিকে পাঠানোর পর সে অল্প কদিনের মধ্যেই ডুব দেওয়ার কাজে চমৎকার দক্ষতা অর্জন করল। শেষ পর্যন্ত নানা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে সে কিছু পুরস্কারও পেয়ে গেল। আমরা অন্য কোথাও যদি থাকতাম তাহলে এমন আনন্দময় অভিজ্ঞতা কখনই লাভ করতাম না

মিসেস ওয়াটসন আরও বলেছেন, 'আমি একসময়ে কোন এক প্রতিষ্ঠানের কর্মপারচালককে মন্তব্য করতে শুনেছি তারা তাদের প্রতিষ্ঠানে সেই কর্মীদেরই নিয়োগ করেন যাঁদের স্ত্রীরা যে কোন জায়গায় সানন্দে যেতে প্রস্তুত।'

এই সব ঘটনা থেকে এটাই বোঝা যায় যে বিদেশে বা অপরিচিত কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকলে নিজেদের উন্নতির পথই পরিষ্কার হয়। তাই এ নিয়ে অনুযোগ না জানিয়ে বিদেশে চাকরির সমস্ত সম্ভাব্য সুযোগ আর সুবিধাই গ্রহণ করা উচিত।

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে 'সঞ্চয়নশীল প্রস্তর খণ্ডে শেওলা ধরে না'। কথাটা অতি সত্য। তাই প্রত্যেক স্ত্রীরই উচিত হবে স্বামীর কাজ এই ধরণের হলে তাকে সব সময় উৎসাহিত করা। অর্থাৎ স্বামীকে ওই প্রবাদের মতই সঞ্চরণশীল পাথর হতে।

এই নিয়ম গুলি তাই মনে রাখবেন :--

১। এ রকম আশা পোষণ করবেন না যে নতুন পাওয়া পরিবেশ আপনার আগেকার পরিবেশের মতই হবে।

২। আপনার অভ্যস্ত পরিচিত সুযোগ সুবিধার স্মৃতিতে অবগাহণ করে বিরক্তির শিকার হবেন না। অতীতের চিন্তা ত্যাগ করবেন।

৩। নতুন কোন কাজে নতুন জায়গায় আসতে হলে কখনই সেই কাজ আর পরিবেশকে ভালভাবে পরীক্ষা না করে কখনই এমন সিদ্ধান্তে আসবেন না যে 'এই কাজ বা জায়গা আপনার পোষাবে না।'

৪। নতুন পাওয়া সুযোগকে সুফলপ্রদায়ী করে তোলার চেষ্টা করতে থাকুন। আগেকার সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করে কাতর হবেন না।

॥ তেরো ॥

স্বামীর কাজে প্রীতির বন্ধন গড়ে তুলুন

বেশ কয়েক মাস আগেকার কথা। আমাদের একজন পুরোনো বন্ধু হঠাৎই দেখা করতে এসেছিলেন। তাকে খুবই ক্লান্ত আর বেশ দুঃখিত দেখলাম। তাঁকে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, 'খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছি। কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছি না। কয়েকমাস ধরে ওভার টাইমে কাজ করছি, এর কারণ হল আমাদের প্রতিষ্ঠানের একটা নতুন শাখা খোলার চেষ্টা। বাড়ি ফিরতে খুবই রাত হয়। প্রচুর খাটতে হচ্ছে, অবশ্য নির্দিষ্ট কাজটায় যদি সফল হই তাহলে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারব। কিন্তু ব্যাপার হল আমার এই বেনিয়মে বাড়ি ফেরার ব্যাপারে আমার স্ত্রী হেলেন খুবই দুঃখিত। তার মত হল বিকেলে সময় মত না ফিরতে পারায় বেড়াতে না পারার জন্য আমার স্বাস্থ্য হানি হচ্ছে। অথচ এই নতুন শাখা খোলা আমাদের দুজনের পক্ষেই অত্যন্ত দরকারী। ~~তা না বললেও চলে~~। কিন্তু দুঃখের কথা হল হেলেনকে কিছুতেই কথাটা বোঝাতে পারছি না। ওর কথা ভেবে আমি কিছুতেই নিজের কাজে মন দিতে পারছি না।'

আমাদের এই বন্ধুর সমস্যা হয়তো আজ অনেকেরই সমস্যা। বেচারিকে যে বোঝা বহন করতে হচ্ছিল তাতে সে সত্যিই যে ক্লান্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

ঠিক এমন সমস্যার মুখোমুখি আমাকেও এক সময় হতে হয়েছিল। সেই সমস্যা দেখা দেয় আমার স্বামী যখন একখানা বই লিখছিলেন। ওই সময় আমাদের দুজনের মধ্যে কার বেশি কষ্ট হয়েছিল সেটা প্রায় জানতেই পারিনি। যদিও আমার স্বামী বাড়িতে থেকেই তার লেখার কাজ করতেন, তাহলেও দেখতাম লাইব্রেরীতে কিছু না লিখে তিনি শুধু চুপচাপ বসে চিন্তা করে চলেছেন। আর সেটা চলত গভীর রাত পর্যন্ত।

কোন সামাজিক কাজ কর্মে বা অনুষ্ঠানে আমরা দুজন একই সঙ্গে

যেতে পারতাম না। এমন কি কোন বন্ধুবান্ধব বাড়িতে এসে পড়লেও তাদের তেমন অভ্যর্থনা করা হত না। কোন জায়গায় যাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল আমাদের। বন্ধুরা অবশ্য জানতেন আমার স্বামী কাজেই ব্যস্ত। আমার কাছে কিন্তু সময়টা নির্জন বাস বলেই মনে হত। তবে আমার একান্ত আপনার জন ডেল কার্নেগীর খাওয়া দাওয়া আর বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত না হয় সেদিকে আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

আমি অহঙ্কার করতে চাই না, তবে একথা ঠিকই যে কোন কাজ স্বামীর কাছে যতই চিত্তাকর্ষক বা প্রয়োজনীয় মনে হোক না কেন, কোন স্ত্রীর পক্ষে সেটা অম্লানবদনে মেনে নেওয়া নেহাতই কঠিন কাজ। এটা চড়ুইভাতি করার মত সহজ নয়।

তবু একজন স্ত্রী হিসেবে এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হল অসুবিধা হলেও যে কোন স্ত্রীরই কর্তব্য হবে মুখ বন্ধ রেখেই নিঃশব্দে আমাদের স্বামীর দেহরক্ষী বা নার্স হয়ে তাদের নৈতিক ভাবধারা বজায় রাখায় সহায়তা করে যাওয়া আর পাশেই থাকা। এই বিষয়ে একটা বিচিত্র ব্যাপারে না আশ্চর্য হয়ে পারা যায় না। আর তা হল যে শিহরণের স্পর্শে পুরুষরা কোন কাজের মধ্যে প্রেরণার ছোঁয়া পায় আর সে সময় সেই কাজ ছাড়া অন্য সব কিছুই ভুলতে চায়, সেই ধরণের শিহরণের স্পর্শ কিন্তু স্ত্রীদের ভাগ্যে জোটে না। এটা প্রকৃতিরই কোন খেলা কি না সে ব্যাপারে প্রশ্ন জাগে।

স্ত্রী হিসেবে তাহলে আমরা কিভাবে এই ধরণের কাজে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি আর স্বামীদের কাজে কিভাবেই বা সাহায্য করতে পারি? যাতে স্বামীরা নির্বিঘ্নে তাদের কাজ করতে পারেন?

কয়েকটি চমৎকার মতবাদের বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। এই সব মতবাদ আমাকে সুন্দরভাবে সাহায্য করেছিল। এই মতবাদ, কোন সন্দেহ নেই যেকোন মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য।

মতবাদ গুলি এই রকম :

১। স্বামী কোন কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কাজে ব্যাপৃত থাকলে স্ত্রী হিসেবে আপনার কর্তব্য হবে তাকে উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া। তাঁকে এই

সময় একবারে বেশি খাদ্য না দিয়ে অল্প খাবার কয়েকবারে দিন। স্বামীকে যদি কাজ করার মধ্যেই অবসর করে নিয়ে মধ্যাহ্নের খাওয়া শেষ করতে হয় তাহলেই তাকে টুকিটাকি খাদ্য দিতে থাকুন। এতে তার প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। এই সময় খাদ্য হিসেবে সবচেয়ে ভাল হতে পারে টাটকা ফল, যেমন আপেল, ফলের রস, আতাফল, স্যালাড, গাজরের তৈরি খাবার ইত্যাদি। এই সব খাদ্য খুবই খাদ্যপ্রাণে ভরপুর আর সহজ পাচ্য। এবিষয়ে আরও তথ্য জানার জন্য সবচেয়ে ভাল হবে বইপত্র পড়ে জেনে নেওয়া বা ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা, বিশেষ করে পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে কি কি খাওয়া ভাল হবে।

২। স্বামীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকার সময় নিজের কথাটাও ভুলবেন না। নিজেও ভিন্ন ভিন্ন রকম খাদ্য গ্রহণ করবেন। আপনাকে আরও যা করতে হবে তা হল নিজেকে সকলের কাছে প্রিয় করে তোলা। স্বামীর পরিচয়েই নিজেকে পরিচিত করে তুলতে চেষ্টা করুন।

এরই সঙ্গে আপনি আরও চেষ্টা করুন যাতে নতুন কিছু করা যায় যা আগে কখনও করেন নি। যেমন গান বাজনায় অবসব সময় কাটাতে চেষ্টা করুন বা এমন কি রাজনীতি চর্চাও করতে পাবেন। সময় থাকলে নিজের জ্ঞানকে বাড়িয়ে তুলতে নৈশ স্কুলেও ভর্তি হতে পারেন। এই পরিকল্পনাটি খুবই কাজ দেবে, কারণ এতে আপনার সময়ও যেমন কাটবে তেমনই আপনার সম্বন্ধে স্বামীর দুশ্চিন্তাও লাঘব হবে।

৩। আপনার আত্মীয় স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের বুঝিয়ে বলুন কেন আপনার স্বামী বা আপনি মেলামেশায় অসুবিধা বোধ করছেন। এটা যে সাময়িক মাত্র সেটা তাদের উপলব্ধি করান। তাদেব এটাও বুঝিয়ে দেবেন যে স্বামীব কাজে আপনাব পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

৪। আপনার স্বামীকে একই সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করুন যে তাব পক্ষে আপনার সাহায্য ও সহযোগিতা কতখানি জরুরী। তাকে বুঝিয়ে দিন তার উন্নতিব এর প্রয়োজন কতখানি। আপনি যে সদাই তার পাশে, এটা তাকে উপলব্ধি করতে দিন। এরও প্রয়োজন আছে।

৫। একটা কথা মনে রাখা চাই যে সব ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ সাময়িক মাত্র। আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে আপনি এই পরিস্থিতি বেশ আয়ত্তে আনতে পেরেছেন তাহলে এতে কোনই সন্দেহ নেই যে আপনি এই বিরাট কর্মযজ্ঞ যখন সফল করবেন তখন এক নতুন জীবনেই আপনি প্রবেশ করবেন। সেটাই হয়ে উঠবে আপনাদের স্বামী স্ত্রীর জীবনে দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমা যাপন।

॥ চোদ্দ ॥

সাধারণ কাজে সমন্বয় কিভাবে করবেন

মানুষের জীবন একভাবে কাটে না। আমি এমন একজন মহিলার কথা জানি যিনি তার স্বামীকে তার নিজের পেশা ত্যাগ করতে একরকম বাধ্যই করেছিলেন। লোকটি বেশ ভাল ভাবেই নিজের পেশায় পরিবারের দেখাশোনার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অসুবিধা এক্ষেত্রে একটিই ছিল, তাহলো ভদ্রলোককে প্রায়ই নিজের কাজে বাইরে রাত কাটাতে হত। এ ব্যাপারটা তার স্ত্রী একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। ভদ্রলোক থিয়েটারে একজন বাদ্যযন্ত্রীর কাজ করতেন। অনুষ্ঠান স্বভাবতই চলত রাতের বেলায়। ভদ্রলোক নিজের কাজ বেশ ভালবাসতেন আর আনন্দ পেতেন। মাইনেও ভাল ছিল।

কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রী স্বামী কাজে চলে গেলে রাত্রিবেলা একা বাড়িতে থাকা কোন ভাবেই সহ্য করতে পারতেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বামীকে নিজের ওই বাদ্য যন্ত্রীর কাজ ছেড়ে দিয়ে পরিবারগত যন্ত্রপাতি বিক্রির কাজ নিতে বাধ্য করলেন। কিন্তু তাতে ফল হল বিপরীত। ভদ্রলোকের ওই যন্ত্রপাতির বিষয়ে কণামাত্র অভিজ্ঞতা না থাকায় নতুন কাজে তিনি মোটেই সফল হলেন না। তার উপার্জন কমে গেল—এই উপার্জনে তার সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠল। ফলে যা হয় তাই হল, সকলের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

এ বিষয়ে তাই একটা কথাই সকলের, বিশেষ করে স্বামী আর স্ত্রীকেও মনে রাখতে হবে। যে সব মানুষকে প্রচলিত সময়ে কাজ না

করে অন্য কোন সময়ে তাদের জীবিকার কাজটি করতে হয় তাদের আসলে এমন স্ত্রীই দরকার যিনি স্বামীর কাজের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেই চলতে পারবেন। বিশেষ করে যে সব জীবিকায় এই অসুবিধা দেখা দেয় সেগুলি হল, জাহাজের কাজ, রেলপথের কাজ, উড়োজাহাজের কর্মচারির কাজ, সাংবাদিকতার কাজ। এই সব কাজে নিযুক্ত মানুষদের স্ত্রীকে স্বামীর কাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেই হবে। তাদের স্বামীর কাজে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের কর্ম পদ্ধতিতে সময়ের কোন ঠিক থাকে না। এ ধরনের বৈচিত্র্য পাওয়া যায় বিশেষ করে যারা ব্যবসায় নিযুক্ত। এদের কাজে প্রচলিত রীতি বড় একটা থাকে না বা থাকা সম্ভবও নয়। এই ধরণের মানুষের স্ত্রীর জেনে রাখা উচিত যে যা আশা করবেন তার সব কিছু হয়তো তারা জীবনে পাবেন না। অবশ্য কেউই সব কিছু পায় না। এই ধরণের মানুষের স্ত্রীদের জেনে রাখা দরকার যে তাদের সব দিক সামলেই চলতে হবে আর স্বামীর আয় অনুসারে সংসার চালাতেও হবে।

বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষের মধ্যে এক বিশিষ্ট শ্রেণীর মানুষ হলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা, গায়ক, লেখক বা বাদ্যযন্ত্রী, খেলোয়াড় ইত্যাদি মানুষেরা। এইসব আশ্চর্য বা অভিনব পেশায় নিযুক্ত মানুষের স্ত্রীদের ভাগ্য সাধারণ মানুষের স্ত্রীদের চেয়ে স্বভাবতই আলাদা। আর এই কারণে এই সমস্ত পেশার মানুষের স্ত্রীদের অনেকে আবার ঈর্ষাও করে থাকেন। এই ব্যাপারে আমার নিজের কথা বলতেও লজ্জা নেই। আমার যখন ষোল বছর বয়স তখন আমি স্বপ্ন দেখতাম একজন বিখ্যাত আবিষ্কারকের স্ত্রী হব। আমরা কিন্তু একেবারেই ভাবতে চাই না এমন কোন বিখ্যাত মানুষের স্ত্রী হওয়ার জন্য আমার নিজেরও কিছু বিশেষ যোগ্যতা থাকা চাই।

মিসেস লাওয়েল টমাসের মত হল এরকম হওয়া কখনই সহজ কাজ নয়। এমন মহিলার সংখ্যা সত্যিই বড় কম যিনি বিখ্যাত স্বামীর মতই খ্যাতি অর্জন করেছেন। অথচ মিসেস টমাস নিজে কিন্তু তাই-ই হন।

লাওয়েল টমাস অর্থাৎ তাঁর স্বামী একজন বিখ্যাত মানুষ। তিনি নিপুণ একজন সংবাদ প্রেরক, আবিষ্কারক, দুঃসাহসী রহস্য কাহিনীর রচয়িতা, বক্তা আর একজন খেলোয়াড়। তাদের জীবনটাই আরব্য উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক ও উত্তেজনায় ভরা। লাওয়েল টমাস সংবাদ পাঠানোর কাজে যখন ক্যামেরার মুখোমুখি হন তখন তাঁর মত স্বাচ্ছ্যন্দ কেউই বোধ হয় বোধ করে না। কোন পরিস্থিতিতেই তার অসুবিধা হয় না।

তাঁর স্ত্রী, ফ্রান্সিস টমাস ও একজন প্রতিভাময়ী ও নানা গুণের অধিকারিণী মহিলা। তিনি তাঁর বহুগুণের অধিকারী স্বামীর সঙ্গে সারা দুনিয়াই প্রায় পর্যটন করেছেন।

সারা দুনিয়া এইভাবে ঘোরার শেষে তাঁরা আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য বাড়ি কেনেন। সারা জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী লাওয়েল টমাস নানা রচনার মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন আর তাতে বহু মানুষের কাহিনীও বলেছেন। এইসব মানুষের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট সব মানুষ, যেমন বৈমানিক, ভাগ্যান্বেষী সৈনিক আর এমন বহু মানুষই। এইসব মানুষ লাওয়েল টমাসকে কৃতজ্ঞতা জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে স্রোতের মতই আসতেন। এই সময় মিসেস লাওয়েল টমাস চমৎকার এক অতিথিপরায়না রমণীর ভূমিকাই নিয়েছিলেন। তাঁদের বাড়িতে গড়পড়তা প্রায় প্রতি সপ্তাহে পঞ্চাশ থেকে প্রায় দু'শজন পর্যন্তও অতিথির আগমন ঘটত।

মিসেস ফ্রান্সিস টমাসের স্বামী লাওয়েল টমাস যখন বিদেশ যাত্রা করতেন তখন তাঁকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন জীবন কাটাতে হত। এমনই এক দিন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি খবর পান যে তার স্বামী জার্মান আক্রমণের মুহূর্তে রাস্তায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন।

এই ধরণের অনেক ঘটনাই মিসেস টমাসকে বিচলিত করেছে। যেমন ১৯২৬ সালে মিঃ লাওয়েল টমাস একদিন আন্দালুনিয়া মরু প্রান্তরে উড়োজাহাজ থেকে নামার সময় দুর্ঘটনায় পড়েন। মিসেস টমাসকে তখন প্যারিসে থেকে অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে খবরের জন্য সময় কাটাতে হয়।

এখানেই শেষ নয়। লাওয়েল টমাস এ রকম বহুবারই দুর্ঘটনার শিকার হন। কিছুদিন আগে তিব্বতের কোন গিরিবর্ত্ত পার হওয়ার সময়েও তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। তাকে শেরপারা প্রায় কুড়িদিন কাঁধে বয়ে নিয়ে আসে। মিসেস টমাসের সেই সময়কার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি শুধু বলতেন, 'আমার স্বামী গুরুতর আহত।' এরকম অবস্থায় পড়লে আমাদের মত মানুষের মনেব অবস্থা কি হতে পারত কল্পনা করাও অসম্ভব।

আশ্চর্য ব্যাপার এর পরেও আছে। ইদানীং কালে আবার লাওয়েল টমাসের একমাত্র সন্তান লাওয়েল টমাস জুনিয়র বাবার পথই অনুসরণ করে বিপদসঙ্কুল পথে পাড়ি দিতে শুরু করেছেন। অতএব মিসেস টমাসের মনের অবস্থা কি রকম ভেবে দেখুন। তাঁকে স্বামীর সঙ্গে আবার সন্তানের জন্যও উদ্বিগ্ন থাকতে হচ্ছে।

তাহলে একবার ভেবে দেখুন বিখ্যাত মানুষের স্ত্রী হওয়ার ঝক্কি আর যোগ্যতা কতটা দরকার। এমন স্ত্রী হতে আপনার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে কিনা একবার ভেবে নিন।

মিসেস ফ্রান্সিস টমাসের জীবনের সামান্য এই দু'চারটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায় বিশিষ্ট কোন মানুষের স্ত্রী হওয়ার জন্য প্রয়োজন কোন বিশিষ্ট স্ত্রীলোকও। সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা কখনই সম্ভব হবে না।

বিখ্যাত মানুষের স্ত্রীদের অনেকেই ঈর্ষা করে থাকেন। সবাই ওই রকম সম্মান ইত্যাদির জন্যও লালায়িত। আপনি যদি কোন প্যারেড বা কুচকাওয়াজ দেখেন তখন হয়তো আপনার মনে হয় বা আকাঙ্ক্ষা জাগে কোন গভর্নরের স্ত্রীর মত আপনিও যদি নিজের প্রশংসা শুনতে শুনতে ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারতেন।

কিন্তু আমরা অনেকেই জানিনা বা অনুভব করি না এর মধ্যেও নানা যন্ত্রণাবোধ লুকিয়ে থাকে। মেরীল্যাণ্ডের গভর্নরের স্ত্রী মিসেস থিওডর ম্যাককেলডিনের মত হল, এই অবস্থাতেও নানা ধরণের মুশকিল আর অসুবিধার ব্যাপার থাকে। মিসেস কেলডিন তার তড়িৎগতি সম্পন্ন ও উচ্ছসিত মেজাজ আর ভাবাবেগ সম্পন্ন স্বামীর যোগ্য স্ত্রী। তিনি

অত্যন্ত শান্ত, নম্রভাষী, শিষ্টাচারিণী আর নরম স্বভাবের মহিলা।

মিসেস কেলভিন একবার আমাকে বলেন যে যখনই তিনি স্বামীর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে আসেন তখন সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁদের কর্মসূচী একেবারেই বদলে যায়। গভর্নর কেলভিন খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন আর শুতে যান বেশ গভীর রাতে। সারাদিন তার কর্মময় জীবন কাটতে থাকে। সারাদিন অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি এতই ব্যস্ত থাকেন যে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সারাদিন দেখাই হয় না। এ নিয়ে মিসেস কেলভিনের কোনো রকম অভিযোগ নেই।

মিসেস কেলভিন বলেন যে কোন সময় তাঁর স্বামী যখন বেড়াতে বের হন বা শহরের বাইরে কোথাও কোন জনসভায় বক্তৃতা দিতে যান তখন উপযুক্ত স্ত্রীর মত তিনিও স্বামীর সঙ্গে এই সমস্যার সমধানে উদ্যোগী হন ও সঙ্গে থাকেন।

মিসেস কেলভিন বলেছিলেন, 'আমার এই জীবনযাত্রায় আমি একটুও দুঃখ বোধ করি না। সাধারণতঃ অন্যান্য স্বামী-স্ত্রীর মিলনের যেমন সময় থাকে সে রকম কোন সময় যদি আমাদের থাকত তাহলেও যে আনন্দ আমরা উপভোগ করতে পারতাম তার চেয়ে বেশি আনন্দই আমি বর্তমান জীবনযাত্রা থেকে পাই। এ আমাদের কাছে ছুটির দিনের আনন্দ উপভোগ করার মত। এই মিলিত ভ্রমণ আর সাহচর্য থেকে আমরা যে আনন্দ পাই তা আমাদের দুজনের কাছেই মূল্যবান আর স্মরণীয়।'

লাওয়েল টমাস আর তাঁর স্ত্রী এবং তেমনই ম্যাক কেলভিন দম্পতি এই ধরণের স্ত্রী লাভ করে সত্যিই সৌভাগ্যের ছোঁয়া পেয়েছেন। এই দুজন মানুষের স্ত্রী যে তাদের স্বামীদের কেবল শ্রদ্ধার চোখেই দেখেন তাই নয় বরং স্বামীদের কাজের অসুবিধা ও খ্যাতির, উচ্চমর্যাদার অসুবিধাটুকুও সমানভাবে গ্রহণ করেন। এঁরাই তাই সত্যিকার আদর্শ।

তাই বলতে চাই আপনাদের স্বামীদের কাজের ধারা যদি এমন হয় যে সাধারণ সচরাচর যা দেখা যায় তা নয়, তাহলে নিচের নিয়মগুলো

অনুসরণ করার চেষ্টা আপনার কাজে লাগবে :

১। আপনাদের জীবনে বর্তমান কোন অসুবিধা যদি সাময়িক আর অস্থায়ী হয় তাহলে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষায় থাকুন ও তা সহ্য করুন। মনে করুন যে কোন মানুষই অসুবিধা অল্পদিন সহ্য করতে সক্ষম।

২। এ অবস্থা কোন কারণে যদি দীর্ঘস্থায়ী বলেই মনে হয় তাহলে তার প্রতিকার করার চেষ্টা করুন। মিসেস ম্যাক কেলডিন যেমন করেছিলেন।

৩। মনে রাখবেন স্বামীর সাফল্যেই আপনার সাফল্য। তাঁর উন্নতির জন্য যে কাজ আপনার করা উচিত তাই করুন আর সমস্ত কাজের ফল হাসিমুখে গ্রহণ করতে শিখুন।

৪। মনে রাখা চাই এই পৃথিবীতে সব কিছু বিনা বাধায় বা অসুবিধার মধ্য দিয়ে কখনও পাওয়া যায় না।

৫। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই রয়েছে সুবিধা বা অসুবিধা। যে সমস্ত মানুষ কেবলই অসুবিধার কথা ভাবতে থাকে, আর বিনা কারণেই কাতর হয়, তারা কখনই সন্তুষ্ট হয় না। ভাল অবস্থায় থাকলেও তাদের খুশি থাকা কঠিন।

॥ পনেরো ॥

স্বামীর কাজে বিরক্ত না হওয়ার উপায়

স্বামীর কাজের সঙ্গে যে কোন স্ত্রীরই বিশেষ একটা মনোভাব জড়িত থাকা নেহাত স্বাভাবিক। বিশেষতঃ স্বামীর কাজের সময় নিয়ে। যদি আপনার স্বামী কোন অফিস বা কারখানায় প্রত্যেকদিন আটঘণ্টা কাজ করেন তাহলে স্ত্রী হিসাবে আপনার চিন্তিত হওয়ার কারণ আদৌ নেই। কিন্তু অসুবিধা দেখা দেয় যে স্বামীর কাজের সময় সীমা নির্দিষ্ট থাকে না তার স্ত্রীর কাছে। এ ছাড়াও ধরুন, আপনার স্বামীর কাজ যদি বাড়িতে বসে হয়, তখন আপনাকে সমন্বয় খোঁজ না করে উপায় থাকবে না। এই ধরণের অবস্থায় পড়লে কি করণীয় সে বিষয়ে জানতে হলে এই পরিচ্ছেদটি আপনাকে একটু মন দিয়ে পড়তে অনুরোধ করছি। কে বলতে পারে পরিস্থিতি কখন বদল হবে।

কোন মহিলা। যাঁর জীবন একটি মাত্র মানুষ, অর্থাৎ তাঁর স্বামীকে ঘিরেই আবর্তিত আর যিনি সাংসারিক সমস্ত কাজ কর্ম নিজেই সমাধা করেন তার অবশ্যই বিশেষ পুরস্কার পাওয়া উচিত। ধরুন, বাড়িতে যে ঘরে আপনার স্বামী বসে কাজ করে যান সেই ঘরের জানালায় হয়তো আপনি উঁকি মেরে দেখেছেন কি দেখেন নি, শুনতে পেলেন তখনই আপনার স্বামী আপনার বোধ হয় পায়ের শব্দ শুনেই বললেন পাখার সুইচ অন করে দিতে। অথবা এমনও হয় আপনি হয়তো কিছু আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধবীদের নেমন্তন্ন করতে চান হয়তো তাতে আপনার স্বামী বিরক্ত বোধ করেন। এই ধরণের অবস্থায় আপনার মনের অবস্থা কি রকম হতে পারে?

তবে এমন অবস্থার সম্মুখীন হলেও আপনাকে কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই আপসের মানোভাবই পোষণ করতে হবে। কারণ আপনি এমন একজন পুরুষকে বিয়ে করেছেন যার কাজের অধিকাংশ সময়ই

কাটে বাড়িতে। আপনার দিক থেকে বিরোধিতা যেমন এসব ক্ষেত্রে থাকবে তাও যেমন সত্য তেমনই আবার আপনাকে কিছুটা মেনে নিতেও হবে এও ঠিক। স্বামীর প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুরাগ থাকলে বা ভালবাসা থাকলে আপনি চমৎকার ভাবেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবেন। অন্য সব স্ত্রীরাও এমন অবস্থায় তাই করে। এ ব্যাপারে একটা উদাহরণ রাখছি। যেমন ক্যাথারিন গিল্লিসের ব্যাপারটাই একবার দেখতে পারেন। তিনি হলেন ডন গিল্লিসের স্ত্রী। ডন গিল্লিস একজন প্রখ্যাত সিম্ফনি কনসার্টের রচয়িতা। তিনি এন. বি. সি. সিম্ফনির জনক। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপের বহু দেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে ঐকতান স্বরধ্বনি বাজানোর ক্ষেত্রে ডন গিল্লিসের রচিত সঙ্গীতই ব্যবহার করা হয়। সঙ্গীতের প্রবাদ পুরুষ সঙ্গীত বিশারদ আর্থার ফিডলার আর অন্যান্য কনসার্টও ডন গিল্লিসের সঙ্গীত কাজে লাগানো হয়। ভদ্রলোকের এখনও বয়স যৌবনের কোঠায়। তাই অল্পবয়সেই অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছেন।

এই ডন গিল্লিস কিন্তু তার বেশির ভাগ সঙ্গীতই রচনা আর সম্পাদনা করেন নিজের বাড়িতে বসেই। নিজের আলাদা পাঠাগার থাকা সত্ত্বেও গিল্লিস কিন্তু খাওয়ার টেবিলে বসে কাজ করতে পছন্দ করেন। তাঁর স্ত্রী ক্যাথারিন খুবই শান্ত চরিত্রের মহিলা, তাই স্বামীর কাজে তিনি কোন রকম আপত্তি করেন না। তিনি বলেন স্বামী কাজে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে তিনি ওই ঘরে ঘুরে ফিরে নিজের সব কাজ করে যান আর নিজেদের দুই শিশুসন্তানের দেখাশোনাও করে চলেন। বাচ্চারা কোন গোলমাল যাতে না করে এটাও তিনি দেখেন।

ক্যাথারিন গিল্লিস নিজেদের বাড়িতে কাজ আর বিশ্রাম, এই দুয়ের সংমিশ্রণেই যেন গড়ে তুলেছেন নিজেকে। একজন রাঁধুনি হিসেবেও তিনি চমৎকার। বাড়িতে আইসক্রিম, কেক আর অন্যান্য নানা রকম মুখরোচক খাবার তৈরি করে তিনি ঠাণ্ডা মেশিনে ভরে রাখেন। অতএব এর ফলে স্বামীর খাওয়া দাওয়ার কণামাত্রও অসুবিধা হয় না। সব ব্যাপারটাই এককথায় চমৎকার।

মিসেস ক্যাথারিন গিল্লিসের কাজ কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তিনি বাড়ির সব খরচের হিসাবও রাখেন যেহেতু ডন গিল্লিস হিসাব নিকাশের কাজে নেহাতই আনাড়ি। মিসেস গিল্লিস এতেও আপত্তি না করে হাসিমুখেই সব করেন। অতএব তিনিই হয়ে যান স্বামীর বেসরকারী ম্যানেজার। সাংসারিক সমস্ত কাজটাই মিসেস গিল্লিসের পূর্ণ এক্তিয়ার ভুক্ত। এ কাজে তিনি প্রচুর আনন্দ পান। এই ব্যাপারে আমি নিজেই একবার ক্যাথারিন গিল্লিসকে প্রশ্ন করেছিলাম তাঁর স্বামী বাড়িতে কাজ করার ফলে তিনি কি রকম সাফল্য নিয়ে স্বামীকে সাহায্য করতে পারেন? তাঁর সব সমস্যার সমাধানই বা কিভাবে করেন?

ক্যাথারিন এর জবাবে বলেছিলেন, 'কোনভাবে একাজে একবার আত্মনিয়োগ করাই বোধ হয় কঠিন, কিন্তু আত্মনিয়োগ করার পর দেখা যায় কাজটা শুধু যে সহজ তাই নয় বরং প্রচুর আনন্দও এতে পাওয়া যায়। আমি ডনকে বোধহয় হারিয়ে ফেলতাম সে যদি সারাদিন কোন স্টুডিওতেই কাজে ব্যস্ত থাকত। সারাদিন তাকে কাছে পাওয়ায় আমি অবস্থার সঙ্গে চমৎকার ভাবেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি কতকগুলো সাধারণ নিয়ম যদি মানা যায় তাহলে স্বামীর কাজে সাফল্যজনক ভাবে সাহায্য করা কোন কঠিন নয়।'

মিসেস ক্যাথারিন গিল্লিস এরপর যে নিয়মের কথা বলেন তা হল এই :

১। স্বামীকে যতদূর সম্ভব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করুন। এটা করার পর কি করছেন তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবেন না। শুধু লক্ষ্য রাখুন আপনার সহায়তায় আপনার স্বামী কতখানি সন্তুষ্ট। স্বামীর অন্তরে প্রবেশ করার চাবিকাঠি আপনারই হাতে। তবু ভাবাবেগ সংযত রেখে লক্ষ্য রাখুন নিজের কাজে আপনার স্বামী কতটা আত্ম-নিয়োগ করতে পারছেন।

২। খেয়াল রাখবেন সংসারের নানা কাজের মধ্যে দরজার ঘণ্টার শব্দ জেগে উঠতে পারে। হয়তো কোন পাওনাদার ডাকাডাকিও করতে পারে। এদের সামলানো আপনারই কর্তব্যের অঙ্গ হওয়া উচিত। আপনার স্বামীর কাজে এটা যেন বাধা সৃষ্টি না করে। মনে করবেন

স্বামী কাজের তাগিদে যেন বাড়িতে নেই। খুব অসুবিধা না হলে এটা করাই হবে আপনার কাজ।

৩। কোন কারণে সহজে বিপর্যস্ত হবেন না—সহজে কার্যক্রম বা মনোভাব বদলানোর চেষ্টা করবেন না। একটা কথা মনে রাখবেন যে কোন পুরুষ অর্থাৎ স্বামী তাঁর কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন না হলে অনেকক্ষেত্রেই হয়তো রুক্ষ বা বিরক্ত হয়ে থাকতে পারেন। এই সময়ে আপনার কাজ হবে শান্ত হয়ে থাকা আর স্বামীর মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করা।

৪। বাড়িতে কোন কারণে কোন সামাজিক উৎসব করার দরকার হলে আপনাকে তা করতে হবে এমনভাবে যাতে স্বামীর কাজকর্মের ব্যাঘাত না জন্মায়। যদি এমন হয় যে আপনার বাড়িতে সে রকম জায়গা এরজন্য নেই, তাহলে সবচেয়ে ভাল হবে আপাতত বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে আহ্বান না করা—অন্ততঃপক্ষে আপনার স্বামী যতক্ষণ ব্যস্ত থাকবেন।

৫। ছেলে মেয়েদের খেলাধূলার ব্যাপারেও আপনাকে নজর রাখতে হবে। এ কাজের সময় ঠিক করতে পারেন স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে। মনে রাখবেন আপনাদের দুজনেরই কর্তব্য সন্তান অর্থাৎ শিশুদের সঠিক পদ্ধতিতে পালন করা। শিশুদের যদি স্বাস্থ্যবান, সুস্থ হয়ে গড়ে তুলতে হয় তাহলে কখনই আশা করা যায় না তারা চুপচাপ শান্তভাবে বসে থাকবে। কোন বাবা মা-ই সেটা আশা করেন না। দুষ্টুমি আর ছুটোছুটি করা শিশুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাকে রোধ করতে যাওয়া অন্যায়।

উপরের এই পাঁচটি নিয়ম সম্পর্কে এইটুকুই বলতে পারি কার্যক্ষেত্রে এগুলো ফলপ্রসূ হবেই। আমার নিজের জীবন থেকেই আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে বলেই কথাগুলো বলতে পারছি। আমাদের বিয়ের আটবছর পর্যন্ত আমার স্বামী বাড়িতে বসেই তার কাজ করেছেন। তাই বলছি আপনার স্বামী চব্বিশ ঘণ্টাই যদি বাড়িতে থেকে নিজের কাজ করেন তাহলে ক্যাথারিনের নীতিই আঁকড়ে ধরুন।

॥ ষোল ॥

আপনার কাজ কি স্বামী স্বার্থ বা রুচি বিরোধী ?

পারিবারিক জীবনে বহু স্ত্রীকেই অনেক সময় একটা প্রশ্নের সামনে পড়তে হতে পারে। কথাটা হল স্ত্রীর নিজের কাজ সম্পর্কে। অর্থাৎ স্ত্রীর যদি নিজের জীবিকা বা শখের জন্যেও কোন চাকরি বা নিজস্ব কোন কাজের ধারা থাকে সেই কাজ বা চাকরি তিনি ত্যাগ করতে রাজি কিনা। যদি এর উত্তর হয় যে স্ত্রীর সেই কাজ ত্যাগ করার অর্থ তাঁর স্বার্থের পরিপন্থী বলে ভাবেন তাহলে কাজটা ত্যাগ করাই শ্রেয়। আবার যদি না হয় তাহলে এটা ধরে নিতে হবে স্ত্রী ভুল পথেই চলেছেন। এই রকম অবস্থায় এটাই বুঝতে হবে স্ত্রী নিজের উন্নতিকে স্বামীর উন্নতির চেয়ে বেশি ভালবাসেন।

মনে রাখবেন যে কোন মানুষের সফলতার ক্ষেত্রে যে কোন রকম আংশিক সহায়তা একটা পুরো কাজের সমান সাহায্য দিতে পারে। এই ধরনের ভুরিভুরি চমৎকার দৃষ্টান্তের কোন অভাব নেই। এই সম্পর্কে এক সুন্দরী তরুণীর জীবনের উদাহরণ দিই। তরুণীর ধারণা ছিল নিজের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার বিষয়কেই প্রথম স্থান দিতে হবে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল কোন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে তার এই ধ্যানধারণা একেবারে পাল্টে যায়। বিখ্যাত আবিষ্কারক কার্বেথ ওয়েলসের স্ত্রী ছিলেন জেট্রা ওয়েলস। অতি সুন্দরী জেট্রা ওয়েলসের নিজস্ব এক আকর্ষণীয় জীবন নির্বাহের উপায় ছিল। কার্বেথ ওয়েলসের সঙ্গে বিয়ের ঢের আগে থেকেই এটা ছিল।

জেট্রা ওয়েলসের সত্যিই কৃতিত্ব ছিল নিজের জীবন চমৎকার ভাবে গড়ে তোলার জন্য। তিনি সত্যিই কৃতকর্মা মহিলা ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল বেতারে শিক্ষাদান করা। বহু সফল বিখ্যাত মানুষের ব্যবসার কাজও তিনি তত্ত্বাবধান করেছিলেন। এইভাবেই একদিন কার্বেথ ওয়েলসের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। কার্বেথ ওয়েলস তার কাছে

উন্নতির পথ খুঁজতে এসেছিলেন। এইভাবে তুজনের ভালবাসা জন্মায় আর তুজনে ভালবেসে বিয়ে করেন। তবে বিয়েতে একটা শর্তও ছিল বিয়ের পর জেট্টা ওয়েলসের উদ্দীপনাময় কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

এরপর কোন এক বছর জুন মাসে কার্বেথ ওয়েলস রওনা হন রাশিয়া আর টোকিও শহরের উদ্দেশ্যে। তার উদ্দেশ্য ছিল 'মাউন্ট আরারাথ' পর্বতের শৃঙ্গে ওঠা। তাঁর স্ত্রী জেট্টার পরিকল্পনা ছিল বাড়িতে থেকে নিজের ব্যবসা আর কাজকর্ম চালানো। কিন্তু মজার ব্যাপারটি দেখা দিল এর পরেই। কার্বেথ ওয়েলস যখন যাওয়ার ব্যাপার শেষ করে ফেললেন, জেট্টা ওয়েলস পিছিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি পাহাড়ের হাতছানি আর স্বামীর সাহচর্য এড়িয়ে যেতে না পেরেই সঙ্গ নিয়ে রওয়ানা হলেন এক তুঃসাহসী অভিযানে। সত্যিই তুঃস্বপ্নের মত আর ভয়ানক কঠিনই ছিল সেই অভিযান।

জেট্টা ওয়েলসের জীবনে এই অভিযান আশ্চর্য একটা ছাপই ফেলে যায়। অভিযান শেষে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসার পর তিনি বুঝলেন যে আনন্দময় আর আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তার তুলনায় তার নিজের কাজ অতি তুচ্ছ। এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার ফলেই জেট্টা ওয়েলস এর পর স্বামীর সঙ্গে আবার মেক্সিকোর এক তুর্গম পর্বতে আরোহণ করার জন্য অভিযানে অংশ নেন। এই অভিযানও ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল আর কঠিন। প্রচণ্ড শীতে জেট্টা ওয়েলস প্রায় জমে গেছিলেন, খাদ্যাভাবও ছিল দারুন, পরিশ্রমের তো তুলনাই ছিল না। এ সব সত্ত্বেও তিনি এই অভিযান থেকে যা পেয়েছিলেন সেই আনন্দ আর শিহরণের তুলনা মেলেনা।

পর্বত শিখরের বরফ শীতল প্রবল বাতাস যেন জেট্টা ওয়েলসের একান্ত প্রিয় স্বাধীনতার স্পৃহাকে খড়কুটোর মতই কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। একজন আধুনিকা স্ত্রী হয়েও জেট্টা ওয়েলস উপলব্ধি করেছিলেন কার্বেথ ওয়েলসের মত মানুষের স্ত্রী হওয়া কত ভাগ্যের আর গৌরবের—তার তুলনায় তার নিজের আগের জীবনবেদ কত সামান্য। এরপর অভিযান শেষে ফেরার পর জেট্টা ওয়েলস তার ব্যক্তিগত

কাজের অফিস বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তার মনে তখন একটাই মাত্র আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়—পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যাওয়ার স্বাধীনতা পাওয়া। ইচ্ছামত কাজই জেট্টা ওয়েলস এরপর থেকে করেছিলেন। পৃথিবীর কোথায় না এই দুঃসাহসী দম্পতির পদচিহ্ন পড়েছে! মালয় থেকে আফ্রিকার অরণ্যময় এলাকা, সেখানকার দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, জাপান, আইসল্যাণ্ড, কাশ্মীর উপত্যকা, কোথায় নয়? এই পরিব্রাজক দম্পতির যাতায়াত ছিল দুনিয়াময়।

নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জেট্টা ওয়েলস বলেন, 'আমার আগের জীবনের কথা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে পড়ি। যখন ভাবতাম আমার নিজের কাজ কত আনন্দের ছিল। সেটা কতটা যে ভুল আজ ভাবলে নিজেকে শিশু বলেই মনে মনে ভাবি।'

জেট্টা ওয়েলসের মত মেনে চলার ফলে আমি নিজে যে মহামূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, আজ ভাবি আমার একাকী গড়ে তোলা জীবনযাত্রাকেই যদি আঁকড়ে ধরতাম তাহলে কি আনন্দ আর সুখ থেকেই না বঞ্চিত হতাম। আমি আমার স্বামীর রুচির সঙ্গে আমার নিজস্ব রুচি মিলিয়ে তার জয়যাত্রায় অংশ নিয়ে তারই সাফল্যের অংশীদার হয়েছি। তার দুঃখ সুখের ভাগও নিতে পেরেছি। আবার যখন নৈরাশ্য এবং কঠিন মুহূর্তের মুখে পড়েছি তখন দুজনে একই সঙ্গে তার সামনে দাঁড়াতে সমর্থও হয়েছি, যুদ্ধ করেছি।

কার্বেথ ওয়েলস তাঁর লেখা বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী জেট্টা ওয়েলসের নামে। সত্যিই চমৎকার ছিল উৎসর্গের ভাষা। এ সম্পর্কে শ্রীমতি জেট্টা ওয়েলস বলেছেন, 'আমার স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া এই ভালবাসার দান আমাকে কৃতজ্ঞতা আর সুখ যতখানি দিতে পেরেছে আর কোন কিছুই আমাকে ততখানি আনন্দ দিতে পারেনি।

জেট্টা ওয়েলসের অন্তরে যে পরিবর্তন আসে তা যেন নাটকীয়তায় পূর্ণ। যে সব মহিলার মনোভাবের বিচিত্র পরিবর্তন আসে তাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা জেট্টা ওয়েলসেরই মত তাতে সন্দেহ নেই। স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে যারা মনোযোগ দিতে পারেন স্বামীর

কাজকে যারা ভালবাসেন, তাদের জীবন এমনই আনন্দময় হয়ে ওঠে। স্বামীর কাছ থেকে এটাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়া।

এ বিষয়ে একটা কথা অবশ্যই বলার আছে। যে সব স্ত্রী অবস্থার বা অন্য কোন চাপে পড়ে বাইরের কাজের জীবন বেছে নিতে বাধ্য হন তাদের আমি কোনভাবেই ছোট করতে চাই না। তাদের কাজের প্রতি আমার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আছে, আমি তাদের কর্মোদ্যোগের জন্য অভিনন্দন জানাই। আমার ব্যক্তিগত ধারণা হল প্রতিটি স্ত্রীরই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা উচিত। এর কারণ একটাই, জীবনে ওঠা নামা আছেই। কেউ জানে না কাকে কখন জীবিকার সন্ধানে নামতে হবে। নিজের পরিবারের আহার বাসস্থানের জোগাড়ও হয়তো কখনও করতে হতে পারে। রোগ, অকাল বিয়োগ, চাকরি হারানো ইত্যাদি অনেক সময়েই আসতে পারে—এরজন্য তৈরি থাকাই বুদ্ধিমতীর কাজ। অনেক পরিকল্পনাই দুঃসময় পাল্টে দিতে পারে। বউ বোঝা না হয়ে হও স্বাধীন সঙ্গী,

আমরা যারা স্ত্রীর ভূমিকা পালনে আগ্রহী, স্বামীর কৃতকার্যতাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, সে বিষয়ে যখন আমরা আলোচনার সূত্র পাত করেছি তখন একটা বিষয় আমাদের উপেক্ষা করার উপায় নেই। সে বিষয়টি হল 'স্ত্রীর মনে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব পোষণ করা একটা বড় কাজ'। যদিও স্ত্রীদের অনেক সময়েই আত্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত হবে না। এমন কোন স্ত্রীলোক কখনই পাওয়া যাবে না যিনি শুধুমাত্র নিজের স্বার্থে কোন বড় কাজে হাত দিতে চান। তবে ব্যতিক্রম বহু ক্ষেত্রেই থাকে, এতেও হয়তো আছে। আমার নিজের জীবন থেকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখেছি স্বামী স্ত্রী তাদের বিয়ের মধ্য দিয়ে চমৎকার ভাবে জীবন গড়ে তুলতে পারে। শুধু চাই দুজনের উদ্দেশ্য আর স্বার্থের মিল।

অতএব স্বামী আর স্ত্রী, দুজনকে একই পথের পথিক হতে গেলে এই নিয়মটি মেনে চলুন :

যদি আপনার নিজের ব্যবসা বা কাজকর্ম আপনার স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহলে আপনার নিজের কাজটি ত্যাগ করাই ভাল।

॥ সতেরো ॥

এক তরুণী স্ত্রী ও তার স্বামীর কাহিনী

একজন মানুষের কাহিনী শোনাব এবার।

আমেরিকার কেণ্টাকির অধিবাসী শ্রী ও শ্রীমতি হাইন্‌স চোদ্দ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করছিলেন। এই সময়ের আশ্চর্য ঘটনা হল শ্রীমতি হাইন্‌স কেন জানা যায় না অহেতুক নানা রকম ভয় পেতেন। তিনি বলেন, 'কেন জানি না কোন নতুন লোকজনের সামনে যেতে বা সভাসমিতিতে হাজির হতেও ভয় পেতাম। আমার কোন রকম আত্মবিশ্বাসই যেন ছিল না।' মিঃ হাইন্‌স ছিলেন একজন স্থানীয় রাজনীতিজ্ঞ যুবক আর' আইন ব্যবসায়ী। তাঁকে প্রায়ই নানা ধরণের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে হত, নানা সভাসমিতিতেও যেতে হত। এ ছাড়াও বহু অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করতে হত। তার স্ত্রী কোরী হাইন্‌স কিন্তু এই সব কাজে এগিয়ে যেতে ভয় পেতেন। তিনি কিছুতেই ভয় কাটিয়ে কিভাবে স্বামীর এই সব সামাজিক কাজকর্মে অংশ নেবেন বুঝে উঠতে পারতেন না। একরাশ লজ্জাই তাকে চেপে ধরতে চাইত। তার মনে একটা কথাই জাগত আর সেটা হল, হয় তাঁকে এই ভয় কাটাতে হবে না হয় স্বামীকে অকৃতকার্যতার দিকেই নিয়ে যেতে হবে। এরপরেই কোরী হাইন্‌স মনস্থির করে ফেললেন যেমন করেই হোক এই ভয় আর আড়ষ্টতা দূর করতেই হবে। কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব? একদিন একটা মাসিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ পড়েই তার চিন্তাধারা একেবারে পাল্টে যায়। তাতে লেখা ছিল: ('মানুষ বিশেষ ভাবে নিজের প্রতি আকর্ষণশীল হয়—তাই সব সময় অন্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অপরকে তাই সুকৌশলে তার সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তার নিজের সাফল্যের বর্ণনা করতে দিন। তার দিকেই মনোযোগ দিয়ে নিজের কথা ভুলে যান।')

এই কটি কথাই কোরী হাইন্‌সের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্তিত করে দিল। তিনি ঠিক করলেন এই পরামর্শ নিজের জীবনে লাগাবেন। এটা সত্যিই কাজ দেয় তার জীবনে।

শ্রীমতি হাইন্‌স বলেন, 'অন্যের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে সত্যিই একটু একটু করেই আমার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে দিল, আমার সমস্ত ভয়ও দূর হয়ে গেল। আমি দেখলাম আমার মত অন্যদেরও সমস্যা আর অসুবিধা আছে। যতই আমি তাদের লক্ষ্য করলাম ততই তাদের ভালবাসতে আরম্ভ করলাম। আজ নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে আমার ভাল লাগে, তাদের কাছাকাছি থাকতে আমার আগ্রহ জাগে। আমার বাড়িতে তাদের আদর আপ্যায়ন করতে আমার ভাল লাগে। এরই সঙ্গে আমার ভাল লাগে স্বামীর সঙ্গে নানা জায়গায় যেতে। আমার স্বামী বর্তমানে আইন সভার একজন সম্মানিত সদস্য। সবচেয়ে বড় কথা, আমি নিজে আমার স্বামীকে সামাজিক কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করে পতন থেকে রক্ষা করেছি। একথা ভাবলেই নিজেকে আমার ধন্য মনে হয়।'

একটি কথা বলা দরকার মনে হয় এখানে। স্বামীর জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রত্যেক স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। স্বামীর কাজ বা ব্যবসা ইত্যাদি যাই হোক না কেন তার উন্নতির পথে এগিয়ে চলার জন্য স্ত্রীকে অন্য সকলের সঙ্গে সদ্ভাব আর আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখাই কর্তব্য হবে। একাজে আর চাই নিজেকে যোগ্য করে তোলা। এই প্রয়োজনীয় কাজে স্ত্রীর যদি স্বাভাবিক শক্তি থাকে তাহলে চমৎকার হয়। আর তা যদি না হয় তাহলে সেই স্ত্রীর দরকার শ্রীমতি হাইন্‌সের মত যোগ্যতা অর্জন করা। সফল স্বামীর স্ত্রীর সাফল্যও তাই অবহেলার নয়। এটি খুবই প্রয়োজনীয় গুণ।

আমেরিকার একজন অত্যন্ত বিখ্যাত গভর্নর আমাকে বলেছেন যে তার সাফল্যের অনেকটাই একজন চিন্তাশীল সুন্দরী স্ত্রীর উপরেই নির্ভরশীল ছিল। তিনি নিজে এই দেশের অন্য জায়গায় জন্মেছিলেন আর মস্ত বড় এক শহরের গরীব মানুষদের মধ্যেই তিনি জীবন

কাটিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি যদি আমার প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে কোন তরুণীকে বিয়ে করতাম তাহলে হয়তো আমার উচ্চশিক্ষা লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আদৌ থাকত না—আর তার পরিণতিতে নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করতেও পারতাম না। ভগবানকে ধন্যবাদ আমার যে সব গুণ ছিল না আমার স্ত্রীর সে সব গুণই ছিল। পিছনে আর সামনে দেখার শক্তি তার ছিল। আমার স্ত্রীর সহায়তা আমার পক্ষে তাই অপরিহার্য। আমি কর্তব্যের ডাকে যখনই কোন রাজপুরুষ, বা অন্য যে কোন মানুষের সংস্পর্শে এসেছি আমার স্ত্রী তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে চমৎকারভাবে মানিয়ে নিয়েছেন।' এই প্রসঙ্গে তাই বলতে চাই যদি আপনার স্বামী নিম্ন কোন পদেও যদি কাজ করেন তাহলেও কোন ভাবে বিব্রত বোধ করবেন না বা ভাববেন না স্বামী আপনার কাছে কিছুই আশা করেন না। এটা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার বলেই জানবেন যে আজকের অনেক প্রখ্যাত ব্যবসায়ী, শিল্পী বা নেতারাও অনেকেই জীবনের গোড়ায় সামান্যভাবেই শুরু করেছিলেন আর তাদের নামও কেউ জানত না। কেউই উঁচু পদ আর খ্যাতি নিয়ে জীবন আরম্ভ করে না। কে বলতে পারে আজকের একজন মানুষ দশ, বিশ, বা ত্রিশ বছর পরে একজন খ্যাতিমান মানুষ হয়ে উঠবেন না? আর তিনি হয়তো আপনারই স্বামী! এমন হলে তিনি কি আপনার শ্রদ্ধা পাবেন না? কোরী হাইন্‌সের মত আপনারও যদি ভয় থাকে তাহলে সেটা ত্যাগ করার জন্য তৈরি হোন-- আর অন্য কাজ আরম্ভ করুন। আপনি যদি কোন ভাবে নিজেকে যোগ্য নয় বলে ভেবে থাকেন তাহলে যেভাবেই হোক না কেন আপনাকে এই মনোভাব ছাড়তে হবে। অন্য মানুষের সঙ্গ আপনার অনেক ক্ষেত্রেই কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। অন্যকে তাই সম্মান করুন, তাদের ভালবেসে একাত্ম হয়ে উঠুন, দেখবেন আপনার ত্রুটি অনেকটাই দূর করতে পেরেছেন। অপরের সাহচর্যেই এটা সম্ভব। যদি কোন শিক্ষাগত যোগ্যতায় আপনি পিছিয়ে থাকেন তাহলে তাকে লুকিয়ে না রেখে প্রকাশ করবেন। এতে লজ্জার কোন কারণ নেই বরং আপনি

কোন নৈশ স্কুলে ভর্তি হয়ে সেই ত্রুটি দূর করতে চেষ্টা করলেই ভাল হয়। এটাও না পারলে কাছাকাছি লাইব্রেরীর সাহায্য নিন আর নানা বিষয়ে বই পড়া শুরু করে দিন। মনে রাখবেন স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সমান তালে চলতে পারেনি বলে স্বামী তাকে পিছনে ফেলে গিয়েছিল—সে ক্ষেত্রে স্ত্রী আর সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য নয়। আমাদের চারদিকে যে অসংখ্য সুযোগ সুবিধা আছে হয় তা লাভ করার পক্ষে সে অত্যন্ত অলস বা অমনোযোগী বলেই তাকে ধরে নেওয়া হয়েছে। আমেরিকান সিনেমা অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টের স্ত্রী মিসেস জনষ্টন লিখেছেন—সফল কোন বিবাহের আসল চাবিকাঠিটি হল স্বামীর সদা পরিবর্তনশীল জীবন যাত্রার সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে চলতে পারার ক্ষমতা। মিসেস জনষ্টনের উপদেশ হল যারা স্বামীর পদক্ষেপের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চান তারা যেন সুযোগ পেলেই সামাজিক কাজকর্মে বেশি করে অংশ গ্রহণ করে বন্ধুবান্ধবের পরিচয়ের গণ্ডী যেন বাড়াতে থাকেন—কমিয়ে নয়। মিসেস জনষ্টন আরও বলেন, 'আপনি সম্ভবতঃ ভাবতে চাইছেন যে আপনার স্বামী এমন জীবন যাপন করেন না যেখানে আপনার এ ধরণের সাহচর্যের কোন প্রয়োজন আছে। আমার স্বামী এরিকও এরকম ভাবেনি। আমরা যখন প্রথম বিয়ের শপথ করি তখন দুজনেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বাড়ি বাড়ি ঘুরে জিনিসপত্র বিক্রি করব। সে সময় কিন্তু বিয়ের পর কিভাবে জীবন কাটাব তা ভাবিনি। আমরা শুধু একটা কথাই জানতাম, তা হল আমাদের দুজনের লক্ষ্যই হবে এক।'

তাই বলতে চাই কেউই জানেন না কিভাবে কার ভবিষ্যতের দরজা খুলে যাবে। কিন্তু যখন সুযোগ উপস্থিত হবে তখন তার জন্য নিজেকে তৈরি রাখাই উচিত কাজ। বুদ্ধিমানেরও বটে। এ বিষয়ে মৌলিক পথটি হল বন্ধুত্ব স্থাপন করা, সেই বন্ধুত্ব সযত্নে রক্ষা করা আর অন্যের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করা। যখন এইভাবে চলার পর দেখবেন আপনার স্বামী একটা উপযুক্ত সামাজিক অবস্থায় পৌঁছে গেছেন, সেই সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য তৈরি থাকাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। একে

এক কৌশলও বলা চলে। আপনার উচিত হবে তাই আপনার স্বামীকে সর্বদাই সাহায্য করার চেষ্টা করা তার সামাজিক অবস্থা যাই হোক না কেন। যে ক্ষেত্রে কখনও স্বামীর আচার ব্যবহার অভদ্রোচিত হতে পারে সে ক্ষেত্রে কিন্তু বুদ্ধিমতী স্ত্রীর উচিত হবে স্বামীর ভুল সংশোধন করা। স্বামী যদি লোকের সঙ্গে আচার ব্যবহারে চালাকি বা চাতুর্য দেখান সেক্ষেত্রেও স্ত্রীর উচিত কাজ হবে স্বামী যাতে হাস্যাস্পদ না হন সেটাই দেখা। এই বইটি লেখার কাজে আমি যখন বইয়ের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করছিলাম সেই সময় আমেরিকার সবচেয়ে বড় কর্পোরেশনের ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি সময় সময় তাঁর কাজে এমনই মগ্ন থাকেন যে তখন লোকের সুখদুঃখের প্রতি খেয়াল রাখতে ভুলে যান। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে ধন্যবাদ, তার কখনও এমন হয় না।

তিনি আরও বলেন, 'এই সেদিন আমাদের বাড়ির কাপড় কাচিয়েকে বলেছিলাম আমার পোশাক কেন সে অযত্নের সঙ্গে কাচে। আর কখনও যেন সে রকম না হয়। লোকটা আমার বকুনিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলে, "আপনার স্ত্রী এখানে থাকলে ভাল হত।" প্রত্যেকেই ঠিক এমনটিই চায়—অর্থাৎ সকলের কাছে ভাল ব্যবহার। যেহেতু লোকটি সরল—সে সকলকে ভালবাসে।'

ডিরেক্টর আরও বলেন, 'আমি আর আমার স্ত্রী যখন পাড়ার গ্রীক দোকানদারের দোকানের সামনে দিয়ে যাই আমার স্ত্রী তখন লোকটির নিজের ভাষায় তাকে অভিবাদন জানায়। এছাড়া আবার একটু দূরের ইতালীয় ফলের দোকানীকেও ইতালিয় ভাষায় সম্ভাষণও জানাতে থাকে। আশ্চর্য ব্যাপার হল ওরা আমি সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও যেন আমাকে লক্ষ্যই করে না। আর লক্ষ্য করবেই বা কেন? আমার স্ত্রী তাদের ভাষায় সম্বোধন জানিয়েছে আমি তা পারিনি। কারও মাতৃভাষায় সম্বোধন করলে বা সম্ভাষণ জানালে তার আলাদা তাৎপর্য থাকে। এর ফলও মেলে চমৎকার। আমি অর্থাৎ ধরুন যে কোন লোকই যদি দেখে অন্য একজন তারই ভাষায় কথা বলছেন তাহলে সেই মহিলাকে জানার

আগ্রহ একান্তই স্বাভাবিক। কার না এতে উৎসাহ জাগে? যে স্ত্রী বন্ধুত্ব আর সদ্ভাবে অনুপ্রেরণা জাগায় সে সত্যিই অমূল্য সম্পদ। কর্মব্যস্ত লোক অনেক সময় অন্যের কাজে এমনই নিবিষ্ট থাকে যে মানুষের প্রতি মনোযোগ আর ভালবাসার সুযোগই সে হারিয়ে ফেলতে চায়। সে ভুলে যায় যে প্রীতি ও বন্ধুভাব মানুষকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যায়। এটা সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয়।'

এটা মনে রাখা চাই যে স্ত্রী সব সময় ভালবাসাপূর্ণ মনোভাব ও পরিবেশের সৃষ্টি করেন সে রকম স্ত্রীকে পিছনে ফেলে কখনও কোন স্বামী জীবনপথে এগিয়ে যেতে পারে না। এই ধরণের স্ত্রী যে কোন স্বামীর কাছেই শুভেচ্ছার দূত। এখনও বহু পথের সন্ধান মানুষ পেতে পারে যার সাহায্যে যে কোন সুরুচিসম্পন্ন স্ত্রী স্বামীকে মূল্যবান সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে পারে। মনে রাখা দরকার অন্য সব কৌশলের মত এই কৌশলও সব সময় অনুশীলন করা চাই। এই বিষয়ে একজনের উদাহরণ রাখছি। তিনি হলেন আমেরিকান সংবাদ পরিবেশন সংস্থার প্রেসিডেণ্ট মিঃ হ্যানস ডি কাণ্টেনবর্নের স্ত্রী মিসেস কাণ্টেনবর্ন। এই ধরণের সহায়তা দানের কাজে অত্যন্ত নিপুণা তিনি। তাঁকে অনায়াসে একজন দক্ষ মহিলা আখ্যা সহজেই দেওয়া যায়। কথা বলায় তিনি সত্যিই অত্যন্ত কৌশলী। কখন কথাবার্তার ফাঁকে টিপ্পনী কাটা দরকার সেটা তিনি চমৎকার করায়ত্ত করেছেন। আমি একবার যখন মিসেস কাণ্টেনবর্নের সঙ্গে দেখা করেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন, কোন নৈশভোজ চলার সময় কথাবার্তা যখন একটু উল্টো পথে চলার অবস্থা হয় তখন তিনি সুযোগ মত বলে ওঠেন, "হ্যানস, সেই জেনারেলের কথাটা বল না।" এর ফলে প্রত্যেকেই চুপ করে যায় আর সমস্ত অপ্রীতিকর কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে যায়।

একবার টাউন হলে কোন সভায় বক্তৃতার শেষে মিঃ কাণ্টেনবর্ন শ্রোতাদের কাছ থেকে এত বেশি সংখ্যায় প্রশ্নের সামনে পড়ে যান যে মিসেস কাণ্টেনবর্ন দেখেন কোন ভাবে বাধা না দিলে তার স্বামী খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। মিসেস কাণ্টেনবর্ন চাইলেন তাড়াতাড়ি সভা

'ভেঙে দেওয়াই দরকার। মিসেস কাণ্টেনবর্ণ তাই মাথা তুলে বলে উঠেছিলেন, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে, দয়া করে একটু শুনবেন ?' সবাই থামতেই তিনি বলেন, 'মিসেস কাণ্টেনবর্ন জানতে চায় মিঃ কাণ্টেনবর্ন কখন মধ্যাহ্নভোজ সারতে বাড়ি ফিরবেন ? এ কথায় শ্রোতারা বেশ লজ্জিত বোধ করেই থেমে যান আর বক্তাও বাড়ির দিকে রওয়ানা হন।

স্বামীকে সফলতার পথে নিয়ে যাওয়ার কাজে আরও এক মূল্যবান সাহায্য স্ত্রী করতে পারেন। এটা করতে গেলে যথেষ্ট রকম ভালবাসা, অনুভূতি এবং তারই সঙ্গে আবার চাই বেশ কিছু সময়। মনে রাখা একান্তভাবেই জরুরী যে এটা যদি নিপুণভাবে সম্পন্ন না করা হয় তাহলে মারাত্মক রকম ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটি এই : স্বামীর মন থেকে সাফল্যের আর কৃতকার্য হওয়ার আশা বা ধারণা যেন কোন ভাবেই চলে না যায় স্ত্রীর সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা। এই বইটিতে সামাজিক চরিত্র গঠন সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছি। কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রীই জানেন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন কোন স্বামী স্ত্রী কিভাবে কাজটি করেন বা করতে চান। যে স্ত্রী এই কাজটি সাফল্যের সঙ্গে করতে পারেন তিনি সত্যিই কৃতজ্ঞতার পাত্রী তাতে সন্দেহ নেই। এই রকম স্ত্রী নিঃসন্দেহে যা চায় তাই পেয়ে থাকে। ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলি তার স্ত্রীকে কঠোর সমালোচক বলতেন। ডিজরেলী স্ত্রীর কথাকে প্রচুর মূল্য দিতেন বলেই একথা বলতেন, তিনি এই প্রশংসা করেছেন সমালোচনার জন্যই। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী সমালোচনার মধ্য দিয়েই তাঁকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করেছেন তাই তিনি ধন্য।

আমার একজন অতি পরিচিত অত্যন্ত সফল মানুষ আমায় একবার বলেছেন যে তাঁর স্ত্রী তার সফল জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের এক বিরাট অংশ। ভদ্রলোকের নাম লাইনম্যান বীচার ষ্টো। তাঁর পিতামহী হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো একদিন বিখ্যাত 'আঙ্কল টম্‌স কেবিন' নামের বইটি রচনা করেছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত লেখক আর অধ্যাপক।

মিষ্টার ষ্টো বলেন, 'যখন আমি প্রথম মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিয়েছিলাম, তখন সৌভাগ্যক্রমে আমার শ্রোতাদের খুবই সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলাম। বক্তৃতার পর সব শ্রোতারা সমস্বরে আমাকে অভিনন্দন জানাতে থাকলে আমি নিজেকে বিরাট কোন প্রতিভা বলেই ভাবতে শুরু করেছিলাম। কাগজে ওই বক্তৃতার কথা ছাপাও হয়। কাগজের লেখায় যথেষ্ট প্রশংসাই করা হয়েছিল বলে আমার স্ত্রী হিলডা খবরটা জানানোর জন্য আর দেরী সহ্য হচ্ছিল না। সে কত প্রতিভাবানকেই না বিয়ে করেছে। কিন্তু হিলডার মনের জোব যথেষ্ট। সে সব সময় প্রধানতঃ আত্ম-বিশ্বাসের উপরেই জোর দিয়েছে। সে আমার কথা শুনে যা বলল তা হলো, 'লাইনম্যান, তুমি যে ভাল করেছ তাতে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত, কিন্তু কখনই প্রশংসায় তুমি পথভ্রষ্ট হবে না। মনে রেখ, কঠোর পরিশ্রম করে তারই সঙ্গে যদি তোমার কাজের ধারাকে ঠিক না রাখ তাহলে দেখবে তোমার এই শ্রোতারাই তোমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে।

'আমার আরও মনে পড়ছে একবার কোন একটি বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উৎসব উপলক্ষে বিরাট সংখ্যক শ্রোতার সামনে বক্তৃতা করে-ছিলাম। আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে চমৎকার বক্তৃতাই সেদিন দিতে পেরেছিলাম। আমার এমনই আত্মপ্রসাদ লাভ হল যে নিজেকে একেবারে উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ানের সমকক্ষ বক্তা বলেই ভাবতে লেগেছিলাম। দারুণ উৎফুল্ল হয়ে বাড়ি ফিরে হিলডার কাছে বক্তৃতার খুঁটিনাটি শোনালাম। বক্তৃতার সব বর্ণনা শেষ হলে কখন হিলডার প্রশংসা শুনতে পাব তারই অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু হায় কোথায় কি! হিলডা সব মন দিয়ে শুনে যাওয়ার পর মৃদু হেসে বলল, 'খুবই চমৎকার আর আনন্দের খবর, কিন্তু তোমার বক্তৃতার বিষয় থেকে দেখতে পেলাম তুমি ওই বাড়িতে যারা থাকবে তাদের সম্বন্ধে কিছুই বলোনি। আমার ধারণা তারাও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর প্রশংসা পাওয়ার সব আশাই সাবানের ফেনার মত মিলিয়ে গেল। কিন্তু হিলডাকে আমি আরও বেশি ভালবাসতে শুরু করলাম

কারণ ওর সুরুচি সম্বন্ধে জ্ঞান দেখে। আমি এর পরেই আমার কাজে আরও সতর্ক হলাম আর সেই ভাবেই কাজ করতে লাগলাম। আমার ভবিষ্যতকে এই ভাবেই মজবুত করলাম।'

মিসেস হাইন্‌স, মিসেস জনষ্টন, মিসেস কাণ্টেনবর্ন ও মিসেস ষ্টো এই সমস্ত মহিলারাই জানেন কেমন করে স্বামীর সঙ্গে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয়, আর কেমন করে তাদের ভালবাসা লাভ করা যায়। এই কাজ তারা করেছেন তাদের বন্ধুদের মনোযোগ আকর্ষণ করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বন্ধুবান্ধবদের ভালবাসা জয় করে আদরণীয় হয়ে স্বামীদের বাস্তবভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে। এর সঙ্গে তারা স্বামীদের সঙ্গে সমান তালেই চলতে পেরেছেন।

একথা তাই বলার অপেক্ষা করে না, যে স্ত্রী এইভাবে কাজ করতে পারেন তার ভবিষ্যত স্বামীর সঙ্গেই মজবুত না হয়ে পাবে না।

সংক্ষেপে চতুর্থ অধ্যায়ের নিয়মগুলি হল

কিভাবে উপযোগী হওয়া যায়ঃ

১। যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে তখনই অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখুন।

২। স্বামীকে বাড়তি কাজ করতে হলে সে ব্যাপারটি মানিয়ে নিন।

৩। স্বামীর কাজে যদি আপনার কোন অংশগ্রহণ কোনভাবেই দরকার হয় তাহলে হাসিমুখে তাতে যোগ দিন।

৪। আপনার স্বামীকে যদি ঘরে বসে কাজ করতে হয় তা হলে সকলের জন্য পরিবেশকে সহজ করে দিন।

৫। আপনার নিজের কাজ বা ব্যবসা যদি কোনভাবে আপনার স্বামীর স্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহলে তা পরিত্যাগ করুন।

৬। আপনার স্বামীর চলাচলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলুন। পিছনে পড়ে থাকা স্ত্রীর মত যেন আপনার অবস্থা না হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ আঠারো ॥

পুরুষেরা কেন গৃহত্যাগ করে

স্বামী স্ত্রীর বিবাহিত জীবন যে সব সময় শুধু আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে তা নয়। অনেক সময়েই কিছু বিচিত্র সমস্যা দেখাও দেয়। ডরোথি ডিক্স নামে বিখ্যাত একজন মহিলা সমাজসেবিকা বলেন, 'কোন লোকের বিয়ের আনন্দ সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে সাধারণভাবে তার স্ত্রীর মেজাজ আর চরিত্রের প্রকৃতির উপর। কোন সুন্দরী স্ত্রী নানা রকম সদগুণের অধিকারিণী হলেও যদি তার মেজাজটি ভাল না না হয়, সে যদি কলহপ্রিয়া হয় বা ঈর্ষাপরায়ণ হয় তাহলে জীবনের অর্থাৎ বিবাহিত জীবনের সব আনন্দই মাটি হয়ে যায়।'

ডরোথি ডিক্স এখানেই থামেন নি। তিনি আরও বলেছেন, 'অনেক লোকই অনেক সময় দেখা গেছে তাদের সমস্ত রকম কর্মপ্রচেষ্টা প্রায় ত্যাগ করেছে—এর কারণ একটাই, কেননা তার স্ত্রী তার সব আশা আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। শুধু তাই-ই নয় এও দেখা গেছে স্ত্রী স্বামীর সব দোষ ত্রুটি খুঁজে বের করে ভালবাসা জিনিসটিকেই তুচ্ছ করেছে। এই ধরণের দোষ খোঁজার মধ্যে প্রধাণতঃ থাকে কিছু অভিযোগ—যেমন অন্য স্বামীর মত সে টাকা রোজগার করতে পারে না। যে বই সহজেই জনপ্রিয় হয় তেমন বই সে লিখতে পারে না। কোন বড় প্রতিষ্ঠানে কেন সে চাকরি করে না, এমনই সব অভিযোগ।' মনে রাখা দরকার পারিবারিক জীবনে শান্তি অটুট রাখতে গেলে এই ধরণের ঘ্যানর ঘ্যানর করা খুবই ক্ষতিকারক। অতিরিক্ত খরচ করাও পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে দেয়। এই ধরণের কাজে পরিবারে অশান্তির জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী আর স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম ভালবাসাতেও টান পড়ে বা অভাব দেখা দেয়। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডঃ লুই এম. টারম্যান পেন প্রায় একশ'রও

বেশি বিয়ের সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। গবেষণার ফল থেকে তিনি দেখেছেন অধিকাংশ বিয়ে সফলতা লাভ করেনা স্ত্রী স্বামীর ত্রুটি ধরতে আরম্ভ করায়। গ্যালাপ পলও ঠিক এই কথাই বলেছেন। তিনিও গবেষণায় একই রকম ফল পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন পুরুষরা স্ত্রীদের দোষের মধ্যে প্রধান বলে ভাবে বিরক্তি উৎপাদক কাজকে। তিনি দি জনসন টেম্পারামেণ্ট অ্যানালিসিজ সানের বৈজ্ঞানিক মনো-বিশ্লেষণে দেখেন যে স্ত্রীদের একমাত্র বিরক্তি উৎপাদন আর স্বামীদের দোষ ত্রুটি ধরার প্রবৃত্তির মত অন্য কোন মনোভাবই জীবন যাত্রার এত ক্ষতি সাধন করে না। অথচ আশ্চর্যের কথা হল স্মরণাতীত কাল থেকেই স্ত্রীরা ঘ্যানর ঘ্যানর করে স্বামীদের বহুক্ষেত্রেই উত্যক্ত করে তাদের প্ররোচিত করে আসছে। শোনা যায় বিখ্যাত ব্যক্তিরাও এই প্ররোচনা থেকে রেহাই পাননি, যেমন ধরা যায় সক্রেটিস। বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস তাঁর কলহ প্রিয়া স্ত্রীর সাহচর্য থেকে আত্মরক্ষার জন্যই দূরে সরে গিয়ে এথেন্স শহরের কোন গাছের তলায় বসেই তার দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করতেন। শুধু সক্রেটিসের মত মানুষই নন এরকম মানুষের কাহিনী আরও আছে। যেমন ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন। এই দুই বিখ্যাত মানুষের স্ত্রীরা ছিলেন অত্যন্ত গোপন স্বভাবের মহিলা। স্ত্রীদের ঘ্যানর ঘ্যানরে তাঁরা উত্যক্ত বোধ করতেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের স্ত্রীর অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য অপর এক মহিলার কাছে গোপনে অভিসার করে শান্তি পেতে চাইতেন। আব্রাহাম লিঙ্কনের মুখে তাঁর স্ত্রী একদিন গরম চা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক লিও টলষ্টয়কেও এই যন্ত্রণার শিকার হতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করার পর এক রেল ষ্টেশনে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুর আগে তিনি শুধু বলেছিলেন, 'আমার স্ত্রীকে আমার কাছে আসতে দিও না।'

রোমের বিখ্যাত অগাষ্টাস সীজার বাধ্য হয়ে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী বনিয়ার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছিলেন। তিনি নিজেই লিখে যান

যে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হন। আধুনিক যুগেও এই অবস্থা ঘটে চলেছে। আমাদের পরিচিত একজন ভদ্রলোক বলেছেন যে তাঁর পারিবারিক জীবন তার স্ত্রীর জন্য প্রায় ধ্বংস হতে চলেছিল। তার স্ত্রী সবসময়েই তার কাজ কর্ম আর সব ব্যাপারে তাকে তাচ্ছিল্য দেখাতেন। তিনি যে কোন ব্যবসা করলেই তাকে তুচ্ছ করতে চাইতেন, ঠাট্টা করতেন। তিনি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জিনিসপত্র বিক্রি করতেন। কাজটা তার বেশ ভালও লাগত, কাজে তার উৎসাহও ছিল। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথাটা হল ভদ্রলোক সারা দিনের পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিবে এলে তার স্ত্রী তাকে প্রথম যে কথাটা বলত তা হল এই : 'ওঃ কত গুণ তোমার! কি নিয়ে এসেছ আজ? লাভের কড়ি না তোমার ওই সেল্স ম্যানেজার সাহেবের বক্তৃতার ঝুড়ি? আমার মন বলছে তোমার পাওনা টাকা বোধ হয় সামনের মাসের জন্য তোলা রয়েছে।' এইভাবেই বেশ কয়েক বছর কেটে যায়, ভদ্রলোক এই ধরণেব ব্যবহার সত্ত্বেও মুখ বুঁজে তার কাজ করে যান। ভদ্রলোক বর্তমানে তারই প্রতিষ্ঠানেব ভাইস প্রেসিডেণ্ট। আর তার স্ত্রী? যা সম্ভাব্য তার তাই ঘটে যায়—অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদ। ভদ্রলোক পরে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন, তার এই স্ত্রীর বয়স অল্পই। এই মেয়েটি প্রথম স্ত্রী যা করতে ব্যথ হন তাইই করে—স্বামীর সব কাজেই আগ্রহ প্রকাশ। তাদের পারিবারিক জীবনে চমৎকার শান্তি নেমে এসেছে। প্রথমা সেই স্ত্রী কিন্তু একটুও নরম হননি। বিবাহবিচ্ছেদেব পব আকস্মিকতা কাটলে তিনি সকলকে যা বলেছেন তাব মর্ম হল তার স্বামী তার প্রচণ্ড সংযম আর চমৎকার সেবার মূল্য না দিয়ে তরুণী স্ত্রী পাওয়াব জন্যই তাকে ত্যাগ করেছে। বর্তমানে বয়স্কা স্ত্রীকে বোধ হয় তার ভাল লাগেনি। মানুষ কত শয়তান হয়।'

আমাদের ওই পরিচিত ভদ্রলোকের স্ত্রী কখনই বিশ্বাস করতে পারেন নি যে তার স্বামী চেয়েছিলেন কিছু সহানুভূতি আর ভালবাসা

যেটা তিনি স্বামীকে একেবারেই দিতে পারেন নি। তরুণী স্ত্রী পাওয়ার লোভে স্বামী তাকে ত্যাগ করেন নি, করেছিলেন তার কাছ থেকে তাচ্ছিল্য ভাব পেয়ে। এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভাবই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। এটাই ছিল বিচ্ছেদের আসল কারণ। স্ত্রীর অনবরত ঘ্যানর ঘ্যানর আর বিরক্তি শেষ অবধি স্বামীর আত্মমর্যাদাকে তীব্র আঘাত করে আর তার পুরুষোচিত জীবিকা অর্জনের ক্ষমতার উপর আক্রমণ চালায় ফলে শেষ পরিণতি আসে বিবাহ বিচ্ছেদে।

আমার একজন পরিচিত বন্ধুর ছেলেরও একই অবস্থা হয়। তার বয়স বেশি নয়, ত্রিশেরও নিচে। সে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রচার দপ্তরে কাজ করে। কাজটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতা সাপেক্ষ। সফল হওয়ার জন্য তার দরকার ছিল সহানুভূতি, প্রীতিময় অনুপ্রেরণা আর সব সময় কিছু উৎসাহ দান। এর সাহায্যে তার মন ভাল থাকতে পারত আর কাজেও সে এগিয়ে যেতে পারত। অথচ যার কাছ থেকে এই ধরণের অনুপ্রেরণা আর উৎসাহের স্রোত আসা দরকার সেই স্ত্রী কিন্তু ছিল অন্য রকম। তার স্ত্রীর স্বভাব ছিল যে কোন পথে ন্যায় বা অন্যায় যাই হোক এগিয়ে চলা। সে আসলে ছিল অত্যন্ত বেশি রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণী। স্বামীর সম্পর্কে তার ধারণাও ছিল নেহাতই খারাপ। সে মনে করত তার স্বামী অলস আর ধীরগতির মানুষ। সে স্বামীর সমস্ত কাজের মধ্যেই কুঁড়েমি দেখতে পেত। তার অবিরাম অবজ্ঞা আর ঘ্যানর ঘ্যানরে স্বামী অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে আমাকে নিজেই একদিন বলেছিল ব্যাপারটা সত্যিই তার কাছে অসহনীয়। স্ত্রীর ক্রমাগত তিরস্কার আর ঠাট্টার ফলে ওর ভিতরের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে যায়। বিন্দু বিন্দু জলের ফোঁটার ঘষায় যেভাবে পাথরও ক্ষয়ে যায় সেই ভাবেই ওর মনের শক্তি ক্ষয়ে যায়। কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় ছেলেটির চাকরিও চলে গেল। কাজের উপর সমস্ত বিশ্বাসই তার লোপ পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীই তার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করে বসে।

কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা ঘটল এরপর। ছেলেটি এইবার আরোগ্যপথে যাওয়া একজন রোগীর মতই ওর হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে আরম্ভ করে। এর কারণও স্পষ্ট, যেহেতু তাকে নিরুৎসাহ করার মত কাছাকাছি কেউ ছিল না। কেউ তার দিনের কাজের শেষে ঘ্যানর ঘ্যানরও করে নি।

বিরক্তি উৎপাদনের সবচেয়ে মারাত্মক আকারটি হল যে কোন মানুষকে অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করে হীন বা ছোট প্রতিপন্ন করার চেষ্টা। যেমন প্রায়ই দেখা যায় এই ধরণের কথা স্ত্রী স্বামীকে অনুযোগ করে বলে চলেছে 'তুমি কেন আরও বেশি টাকা পয়সা আনতে পারো না?' তোমার চেয়ে বিল এই সময়ের মধ্যে দু দুবার প্রমোশন পেয়ে গেছে, অথচ তোমার ক্ষমতায় কুলোলো না। আমার ভাই তার স্ত্রীকে চমৎকার পশমের কোট কিনে দিয়েছে কিন্তু তুমি পারো না। টাকা রোজগার কিভাবে করতে হয় আমার ভাই খুব ভাল জানে। আমি যদি হার্বাটকে বিয়ে করতাম তাহলে ঢের বেশি জাঁকজমকের সঙ্গেই জীবন কাটাতে পারতাম।' এই ধরণের অন্তরে জ্বালা ধরানো বাক্যবান মনে রাখা উচিত অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। সংসারে অশান্তি আর যন্ত্রণা আনে। এইসব কথা অত্যন্ত ক্ষতিকর কেননা মনের মধ্যে এর সাহায্যে ছুরি চালানো হয়—এ অনেকটাই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত। অনুযোগ করে ঘ্যানর ঘ্যানর করা, অন্যের তুলনায় স্বামীকে ছোট করার প্রবণতা, অবজ্ঞা করা, নাক মুখ সিঁটকে ঘৃণার ভঙ্গী করা বা বারবার আঘাত দিয়ে কথা বলতে থাকা —এই সবই নেহাত বদ গুণ। স্ত্রীর জানা দরকার এর পরিণতি তার পক্ষেই বেশি ক্ষতিকর হতে পারে। ঘ্যানর ঘ্যানর করা বহু স্ত্রীলোকের যেন মজ্জাগত স্বভাব। তাই একে গ্রহণ করা যেমন কঠিন কাজ তেমনই আবার একবার হলে তা ছাড়াও শক্ত। এ একটা অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে যায়—মন তখন কোনরকম যুক্তি মানতে চায় না।

এটা মনে রাখা উচিত যে নিজেদের রসনা বা সমালোচনার কাজকে সংযত করতে পারা একটা বড় গুণ। আর এটা করলে মনে রাখবেন

যে কোন স্বামী স্ত্রী তাদের পারিবারিক জীবনে শান্তি পেতে পারেন ও নিষ্কলঙ্কভাবে জীবন কাটাতে পারেন। চিরজীবন ব্যাপী ঘ্যানর ঘ্যানর বা বকবকানি অতি উদীয়মান শক্তি সম্পন্ন বুদ্ধিমান একজন মানুষকেও শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত, অধঃপাতিত করতে পারে। কাজের জায়গায় স্বামীর উন্নতি হোক আর নাই হোক তাকে কখনও প্রত্যেকটি মুহূর্তে বাক্যবানে বিদ্ধ করা উচিত নয়।

ভার্জিনিয়া প্রদেশের একজন অধ্যাপক ডঃ স্যানুয়েল ডব্লিউ স্টিফেনসন সম্প্রতি তার এক বক্তৃতায় আমেরিকান স্বামীদের কাছে চারটি বিশেষ দাবী রাখেন। সেগুলি হল : (১) ঘ্যানর ঘ্যানর থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরে থাকা। (২) পিছু হটে যাওয়া থেকে নিরস্ত হওয়ার চেষ্টা করা। (৩) সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের শেষে দিনান্তে পুরনো পোশাকে শয্যায় গা এলিয়ে দেওয়া থেকে মুক্তি। (৪) বদহজম থেকে মুক্তি।

এক্ষেত্রে সবকিছুই স্ত্রীর বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলে অনেকে হয়তো ভেবে বসতেও পারেন। তাই বলতে চাই স্ত্রীরা স্বামীদের কাছে অনবরত এই ঘ্যানর ঘ্যানর করে চলে কেন? এক্ষেত্রে স্বামীরাও সম্পূর্ণ নির্দোষ বা ত্রুটি মুক্ত কখনই নয়। দেখা দরকার এই ঘ্যানর ঘ্যানর কোন রকম শারীরিক ত্রুটি থেকে আসছে কিনা, কেননা এটা হতেও পারে। তাই স্ত্রীর সম্বন্ধেও কিছুটা সহানুভূতিশীল হওয়া প্রত্যেক স্বামীরও উচিত। এটা করা হলেই বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়ে গেছে আর পারস্পরিক বোঝা পড়াও এসেছে। জীবনযাত্রাকে তাই অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলাই এর প্রতিকারের উপায়।

এবার আরও একটি সমস্যার উল্লেখ করছি। এটা হল অবসন্নতা। আমার পরামর্শ হল :

অবসন্নতার কারণ খুঁজে বের করে তা দূর করুন।

মনোবিজ্ঞানীদের মত হল গোপন ঈর্ষা বা শত্রুতার ভাব বহুক্ষেত্রেই মনের মধ্যে জেগে থাকার ফলে স্ত্রীদের ঘ্যানর ঘ্যানর করার মনোবৃত্তি জাগতে পারে। এর মধ্যে নানারকম কারণ থাকা সম্ভব, যেমন আইন-

গত সমস্যা, যেন ব্যর্থতা, ভালবাসার অভাব, জীবনের প্রতি বিভিন্ন কারণজনিত বিতৃষ্ণা। এসবেরই মূল পরিণতি মনের মধ্যে চাপা সংগ্রাম যার বাইরে প্রকাশ ঘটে ঘ্যানর ঘ্যানর, নাকি সুরে কান্না, ঝগড়া ইত্যাদি। এটা দূর করতে গেলে অবশ্যই নিজের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের স্বরূপটি খুঁজে বের করে তার স্বরূপ উদঘাটন করে প্রকাশ করা আর তারই সঙ্গে প্রতিকারের চেষ্টা করা। স্বীর পক্ষে ঘ্যানর ঘ্যানর করা শুধু অন্তরের গুপ্ত আগুনে ইন্ধন জোগাতে চায়। একটি ঘটনার কথা বলছি। কোন এক সময় আমেরিকার জর্জিয়া প্রদেশের সুপ্রীম কোর্টে এক মামলায় রায় দেওয়া হয় যে কোন স্বামী যদি কলহপ্রিয়া স্ত্রীর হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কোন অতিথি গৃহে নিজেকে আলাদা ভাবে রাখতে চায়, তাহলে কোন ভাবেই স্বামীকে দোষারোপ করা যায় না। সুপ্রীম কোর্ট আরও জানায় যে বাইবেলে সলোমনের কথা এই রকম: বিস্তৃত ঘরে কলহপ্রিয়া স্ত্রীর সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা ছাদের ছোট কক্ষে এক কোণে বাস করাই শ্রেয়।

অন্য এক মামলায় দেখা যায় কোন একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। তার বিবাহ বিচ্ছেদ মামলায় একজন ব্রিটিশ জজ রায় দেন যে খোরপোষের দাবী সাতশ ডলারের বদলে দুশ ডলার হওয়া উচিত। এই আদেশের কারণ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে জজ বলেন স্বামীর কাছ থেকে এই দাবীর পরিমাণ স্ত্রীর মতানৈক্যের জন্য তারই অনুপাতে কমে যাওয়া উচিত। এই মামলার উপর মন্তব্য প্রকাশ করার সময় নিউ ইয়র্কের জার্নাল অব আমেরিকায় হলবয় নামে একজন খ্যাতনামা আইনজ্ঞ মন্তব্য করেছিলেন, 'কোন স্ত্রী কি চান যে আইনের বইতে এটাই লিখিত থাকুক যে বছরের পর বছর তাদের মতানৈক্যের জন্য তার মূল্য কমে যাক?' আইনে এ একটা অপ্রীতিকর নজীর। এই আইনের ফলে স্বামীরা হয়তো বিচারালয়ে যেতে শুরু করতে পারে আর আবেদনও করতে পারে 'খোরপোষের দাবী যেন মঞ্জুর না করা হয়। তার স্ত্রীর সঙ্গে যেহেতু তার মতানৈক্য ঘটেছে আর আনুপাতিক হারে খোরপোষের মূল্যমানও কমে গেছে।'

এটা প্রমাণিত সত্য যে বহু লোকই তাদের স্ত্রীর হাত থেকে কোন অর্থ ব্যয় না করে মুক্তি পেতে আগ্রহী। অবশ্য এও দেখা গেছে বহু স্বামী আবার যে কোন উপায়েই স্ত্রীর হাত থেকে রেহাই চায় আর সেজন্য প্রচুর অর্থব্যয় করতেও গররাজি নয়। সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত এক পত্রিকা ওয়ার্ল্ড টেলিগ্রামে এই ধরণের একজন উন্মাদগ্রস্ত মানুষের কাহিনী প্রকাশিত হয়। স্বামী ভদ্রলোকটি একজন মিস্ত্রী। সে তিনটি সাপ কিনে স্ত্রীকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। লোকটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ধরা পড়ার পর সে যা জানায় সেটা খুবই কৌতূহলের ব্যাপার। লোকটা জানায় সারা জীবন স্ত্রীর ঘ্যানর ঘ্যানর আর ঝগড়ায় উত্যক্ত হয়েই সে ওই চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হল ঘ্যানর ঘ্যানর করা যদি এরকম সাংঘাতিক কিছু কাণ্ডই হয় তাহলে এর হাত থেকে প্রতিকারের পথ কি? হ্যাঁ, এর প্রতিকারের পথ অবশ্যই আছে এবং এক্ষেত্রে ওই স্ত্রীকেই সতর্ক হতে হবে। তার স্বামীর বিরক্তির কারণ ওই ঘ্যানর ঘ্যানর করা বন্ধ করাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

এ কথা জানা দরকার আপনার রোগ কি সেটা আপনাকে পরিষ্কার করতেই হবে না হলে সে রোগ আরোগ্যের আশা দুরাশা মাত্র। এই ঘ্যানর ঘ্যানর করা অতি মারাত্মক ত্রুটি বা রোগ। কোন স্ত্রী যদি জানতে ইচ্ছুক হন তার এই সর্বনাশা রোগ আছে কিনা তাহলে সেরা উপায় হল স্বামীকেই প্রশ্ন করা এ রোগ তার মনে হয় কিনা। স্বামী কোনভাবে যদি ইঙ্গিত দেন এই রোগ তার আছে তাহলে অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং তাড়াতাড়ি সেই ত্রুটি দূর করাই শ্রেয়!

একাজে নিচের ছ'টি পরিকল্পনা কাজে আসতে পারবে:

(১) স্বামী ও পরিবারের সহযোগিতা মেনে নিতে উদ্যোগ নিন। সবচেয়ে সেরা উপায়টি বেশ মজার। যেমন, আপনি প্রস্তাব করুন যখনই আপনি রাগ করে ঘ্যানর ঘ্যানর বা বেশিমাত্রায় বক বক করবেন তখনই যেন আপনাকে বেশ ভাল রকম জরিমানা করা হয়।

(২) যে কোন কথা মাত্র একবারই বলা অভ্যাস করুন। মনে রাখবেন আপনাদের বাড়ির সামনের বাগান পরিষ্কার করার কথা মাত্র একবারই বলা উচিত, বারবার বললে বা ঘ্যানর ঘ্যানর করলে স্বামী সে কাজ কখনই করবেন না। তাহলে অনর্থক শক্তি ক্ষয় করবেন কেন? বারবার খিট খিট করলে জানবেন কাজ কখনই হবে না।

(৩) মধুর কথায় যে কোন কাজ সম্পন্ন করানোর চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন ভিনিগারের স্বাদ টক—এর সাহায্যে যত মাছি ধরা সম্ভব চিনির সাহায্যে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক মাছি ধরা সহজ। এ বিষয়ে অ্যালেন স্মিথের বক্তব্য বেশ সুন্দর। তিনি বলেন, 'স্বামীদের যত কাজ করার কথা ঘ্যানর ঘ্যানর করে শোনাবেন ততই সে কাজটি শেষ হবে না। অথচ মিষ্টি কথা বলুন, শতকরা আশি ভাগ কাজ হবেই দেখবেন।'

(৪) স্বভাবকে সরল করার চেষ্টা করুন। দেখতে পাবেন এ কাজটি আপনার মধ্যে ঢের বেশি উন্নতির ভাব জাগাতে আরম্ভ করবেই। একমাত্র যারা নির্বোধ তারাই কিছু ঘটতে দেখে হাসতে পারে। এটা সত্যি যে বহু স্ত্রীলোক আছেন যারা বড় বেশি ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেন। এর ফলে নিজের সঙ্গে পরিবারেরও যে প্রচণ্ড ক্ষতি হতে পারে তারা তা ভাবতে চান না। লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকাতেও বহু স্ত্রীকে অভিনয় করতে দেখা যায় যা কখনই উচিত নয়। আমরা অনেক স্ত্রীই মানসিক স্থৈর্য্য হারিয়ে এমন বহু কাজ করে বসি যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর স্বর্গীয় ভালবাসা ঘৃণাতে পরিণত হয়ে যায়। তাই সহজে ভ্রূকুঞ্চিত না করাই ভাল। মনে রাখবেন পশ্চাদাপসরণ জয়ের কাজও করতে পারে।

(৫) যে কোন রকম গুরুতর দুঃখকষ্টের কথা শান্তভাবে গ্রহণ করতে শিখুন। স্ত্রী হিসেবে আপনার যন্ত্রণা বা রোগের কথা ইচ্ছে করলে কাগজে লিখে রাখতে চেষ্টা করুন। স্বামীকে সহসা উত্যক্ত না করে সময় বা সুযোগ মত সেটা তাকে দেখতে দিন। দেখবেন এতে আপনার নিজেরই সামান্য বা অপ্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করতে নিজেরই

কেমন লজ্জা বোধ হবে। তখন আর এই কাজটি করার ইচ্ছা থাকবে না। কিন্তু সব ব্যাপারেই এটা কখনই করা উচিত নয়—কারণ কোন জরুরী জটিল কারণও থাকতে পারে। এগুলো কখনই অগ্রাহ্য করবেন না। স্বামী স্ত্রীর এক সঙ্গে আলোচনায় দেখা যাবে সহজেই সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে আসবে। বিশ্বাসই এখানে মূল কথা।

(৬) ঘ্যানর ঘ্যানর না করেও যে ফল লাভের শক্তি আপনার আছে সেকথা স্মরণ করে নিজেকে গৌরবের আসনে বসাতে চেষ্টা করুন। একাজে মানবীয় সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়ন আর অনুশীলন করার চেষ্টা শুরু করে দিন। স্বামীকে দিয়ে জোর করে কোন কাজ করানোর চেষ্টা না করে বরং অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়েই সেটা করার ব্যবস্থা করুন। বিখ্যাত চার্লস শোয়াব বলেছেন মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহারের এটাই হল আসল রহস্য। তাঁর এটা জানা ছিল বলেই বছরে তার মাইনে ছিল দশ লক্ষ ডলার। চার্লস শোয়াব বলেছেন কোন মানুষকে তার মতের বিরুদ্ধে বন্দুক দেখিয়েও করানো যায় না। বরং এর ফলে দুজনেরই ক্ষতি হয়। আর বন্দুকধারীর মানসিক আনন্দও বিলীন হয়ে যায়।

॥ উনিশ ॥

স্বামীর কাজে মাথা গলাবেন না

কিছুদিন আগে এক ভোজ সভায় আমন্ত্রিত হয়ে আমি অতি পুরনো এক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ম্যানেজারের সঙ্গে পাশাপাশি বসেছিলাম। কথায় কথায় আমি তাকে প্রশ্ন করি 'কিভাবে তাঁর মতে স্ত্রীরা স্বামীদের জীবনে উন্নতির পথে সহায়তা করতে পারে।' ভদ্রলোক উত্তরে বলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্ত্রীরা যেভাবে স্বামীদের উন্নতির সহায়তা করতে পারেন, তার মধ্যে দুটি কাজ প্রধান। এর প্রথমটি হল, স্বামীকে সত্যিই ভালবাসা আর দ্বিতীয়টি হল স্বামীর কাজে বাধা সৃষ্টি না করে তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সুযোগ দেওয়া। যে কোন প্রিয় স্ত্রীরই কর্তব্য হওয়া উচিত তাঁর স্বামী যাতে সুখী স্বাচ্ছ্যন্দপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারেন তাই দেখা। একটা কথা অবশ্যই প্রত্যেক স্ত্রীর জানা দরকার যে কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে তার কাজে নির্বিঘ্নে লেগে থাকতে সুযোগ দেয় তাহলে তার স্বামী নিশ্চয়ই তার যোগ্যতা আর শিক্ষার সীমা অনুযায়ী কাজে উন্নতি লাভ করতে পারবেন।' তিনি আরও বলেন যে এই হস্তক্ষেপ না করার কাজটি সোজাসুজি তার স্বামীর অবলম্বিত কাজ আর তার সহকর্মীদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে। স্ত্রী যে কার্যকরী পথে হস্তক্ষেপ করতে পারে তাহল—স্বামীর বেতনের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে, তাকে উপদেশ দিয়ে, কাজে হস্তক্ষেপ না করে, সহকর্মীদের সঙ্গে তুলনা দিয়ে, তার মাইনে সম্বন্ধে আপত্তি দেখিয়ে। কাজের সময় সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে, করণীয় কাজের উপর মন্তব্য প্রকাশ করে। দেখা গেছে বহু নব বিবাহিত কিশোরী স্ত্রী স্বামীকে বেশ চাতুর্যের সঙ্গে একেবারে অফিসের পরিচালক পদে দেখার সোনালী স্বপ্নে বিভোর থাকে। এইরকম কিশোরীরা আবার এরজন্য নানা কর্মসূচীও স্বামীর জন্য তৈরি করে ফেলে। এর মধ্যে থাকতে পারে নানা ইঙ্গিত, কি করা উচিত তার প্রস্তাব করে, স্বামীর অফিসের কর্তাব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করায় আগ্রহী হয়। প্রায়ই আবার তারা স্বামীকে আরও উঁচু পদে প্রমোশন পাওয়ার জন্য উৎসাহ দানও করতে

থাকে। এমন ঘটনা আমি নিজেই দেখেছি।

কোন এক সময় আমি একটি ছোট প্রতিষ্ঠানে কাজ করতাম। এই প্রতিষ্ঠানে একজন লোককে সাময়িকভাবে ম্যানেজারের পদে নিয়োগ করা হয়। লোকটি ওই পদের উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন তাতে সন্দেহ ছিল না। লোকটি যখন তার নতুন পদে যোগদান করল তখন একটা আশ্চর্য কাণ্ডই ঘটে গেল। লোকটির স্ত্রীও সকলকে অবাক করেই স্বামীব সঙ্গে অফিসে হাজির হল, শুধু তাই নয়, সে নানাভাবে অফিসের কাজ কর্মে মাথা গলাতেও শুরু করল। সে স্টেনোগ্রাফারের মত শ্রুতলিপি গ্রহণ করতে লাগল, স্বামীর কাগজপত্র, ফাইল ইত্যাদিও দেখতে লাগল। এজন্য একটি চাকরি একজন ছেড়েও দিল। আমরাও বাধ্য হয়ে চাকরির সময় পরিবর্তন করে নিলাম। অফিসে গুঞ্জন আরম্ভ হল। তিন সপ্তাহ পর লোকটিকে অফিসের কর্তারা জানালেন এভাবে শৃঙ্খলা নষ্ট করা চলবে না তাই তাকে পদচ্যুত করা হল। হতভাগ্য এইভাবেই তার চাকরি বলতে গেলে স্ত্রীর অবিমৃষ্যকারীতার জন্যই হারাতে বাধ্য হল। অনেক চাকুরিজীবির জীবনেই এই ধরণের কাণ্ড ঘটে যায়। স্বামীর কাজে স্ত্রীর অকারণ অন্যায় হস্তক্ষেপের পরিণতি এই রকমই হতে পারে। একাজ বিপজ্জনক।

কিছুদিন আগে আমার জনৈক বন্ধু বলেন যে তার প্রতিষ্ঠানে বহুদিনের উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী বরখাস্ত হন—কারণ তার স্ত্রী বেশ জোর করেই তার কাজে হস্তক্ষেপ করতেন। স্ত্রী যে কাজ করেছিলেন তা অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ ছিল না। তিনি ওই প্রতিষ্ঠানেরই অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন—তার ধারণা ছিল তারা স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বী। ভদ্রমহিলা ওখানেই থামেন নি, তিনি ওই সব কর্মচারীর স্ত্রীদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসাও রটাতে শুরু করেন। স্বামী এইসব ব্যাপার জানার ফলে নানাভাবে স্ত্রীকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তিনি অপারগ হয়ে চাকরি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। এ ছাড়াও তার কোন পথ ছিল না।

স্বামীর কাজে তাই মাথা গলাবেন না।

॥ কুড়ি ॥

স্বামীর কাজে উৎসাহ দিন

১৯২৬ সালে যখন জেন ওয়েলশ টমাস কার্লাইলকে বিয়ে করেন তখন তাদের কোন কোন বন্ধু আড়ালে বলেছিলেন তিনি গরীবের বাজারে হাঁস বিক্রি করতে গেছেন। জেন আসলে অপরূপ সুন্দরী ছিলেন, সঙ্গে বিলাসীও—তিনি ইচ্ছে করলেই যে কোন উচ্চপদস্থ মানুষকে সহজেই বিয়ে করতে পারতেন। কারণ টমাস কার্লাইল ছিলেন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষ, অথচ প্রায় গ্রাম্য আর কিছুটা বিচিত্র চরিত্রের। প্রচণ্ড রকম খামখেয়ালীও। তাঁর অর্থকরী অবস্থা মোটেও বলার মত ছিল না, ভবিষ্যতও ছিল না বলা যায়। থাকার মধ্যে তার যা ছিল তা হল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর সুপ্ত প্রতিভা।

জেন কার্লাইল এই বিয়ের পরিণাম করে তুলতে চান স্বামীর জীবন-যাত্রা আর মান সম্ভ্রমকে উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছে দিতে। টমাস কার্লাইল ছিলেন একজন স্কটল্যাণ্ডের মানুষ। জেন কার্লাইল চাই-ছিলেন এটাই দেখতে যে তার স্বামী এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করছেন। জেন নিজে ছিলেন একজন সত্যিকার ধীশক্তি সম্পন্ন মহিলা কবি! অথচ তা সত্ত্বেও তিনি কবিতা রচনা করা ত্যাগ করেন—এর উদ্দেশ্য স্বামীকে যাতে আরও বেশি সময় দিতে পারেন। স্বামী যাতে অবাধে আর নিরলস ভাবে নিজের কাজ করে যেতে পারেন। এই জন্য জেন বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় পরিজনকে ছেড়ে চলে যান সুদূর স্কটল্যাণ্ডের এক নিরিবিলি গ্রামে স্বামীর সঙ্গে। জেন নিজের পোশাক পরিচ্ছদ নিজেই বানিয়ে নিতেন, তিনি সত্যিকার একজন মিতব্যয়ী গৃহিণীই ছিলেন। তিনি স্বামীর পুরনো অজীর্ণ রোগের শুশ্রূষা করতেন এবং স্বামীর অসন্তোষকে হেসেই উড়িয়ে দিতেন।

কিন্তু জেন কার্লাইলের সবচেয়ে ভাল প্রশংসনীয় গুণটি অবশ্য ছিল এই : তিনি কখনই স্বামীর ব্যক্তিগত মতামত বদল করার চেষ্টা করতেন না। তিনি যদি কোন সাধারণ নিম্নমানের স্ত্রী হতেন তা হলে একথা ঠিক যে তিনি স্বামীর কোন কোন নিগুর্ণ দূর করার চেষ্টা অবশ্যই করতেন। জেন কিন্তু তাঁর স্বামীর নিজের গুণই অনুশীলন করতে দিতেন। তিনি স্বামীকে তার পছন্দ করা পথেই চলতে দিতে চাইতে ভালবেসেছেন আর চেয়েছেন পৃথিবীর সকলেই এই মতটাই গ্রহণ করুক।

এটা সত্যি যে একজন লোককে তার নিজের শক্তির পরিমাণ বুঝতে দেওয়া আর তার শক্তির বাইরে ঠেলে দেওয়া—এই দুটোর মধ্যে যথেষ্ট ফারাক আছে। স্ত্রীদের উচিত পুরুষের শক্তির সীমা বোঝার চেষ্টা করা, তাকে সীমার বাইয়ে ঠেলে দেওয়া নয়। এটা বাস্তব যে আমরা কখনই সব সময় অতটা সচেতন থাকি না। অনেক লোকই তার শক্তির বাইরে যাওয়ার চেষ্টা চালায় আর সেটা করতে গিয়ে সচেতনতা হারিয়েও ফেলে। তারা এক্ষেত্রে তাদের স্ত্রীদের পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অতি মাত্রায় উচ্চাভিলাসী হয়েও ওঠে। এমন দেখা যায় অনেকে কারও অধীনস্থ থাকার ফলে চমৎকার কাজ করায় দক্ষতা লাভ করে। অথচ তাদের যদি কোন সময় জোর করে উঁচু পদে দায়িত্বশীল কাজের ভার দেওয়া হয়, তাহলে তাদের যোগ্যতা কমতে শুরু করে। এদের পরিণতি হয় করুণ, তারা হয় আলসার না হয় অন্য ভাবেই মৃত্যু বরণ করে। কারণ তাদের দেহের গঠণে ওই অতিরিক্ত পরিশ্রম সহ্য হয় না। কৃত-কার্যতা নির্ভরশীল যে পরিমাণ কাজ আমাদের মানসিক, শারীরিক আর আভ্যন্তরীন ধাতু প্রভৃতি সহ্য করতে সক্ষম। ওরিসন মারডেন বলেন, 'প্রথম শ্রেণীর ভারবাহকের চেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বাহক হওয়া অনেক ভাল।'

এটা জেনে রাখা দরকার যে প্রকৃতি কখনও কোন মানুষকে উচ্চ-পদস্থ মানুষ হওয়ার যোগ্যতা দিয়ে তৈরি করে না। কিন্তু আমরা উঁচু উপাধিধারীদের এই ধরণের অতিরঞ্জিত সম্মানই কিন্তু দিতে অভ্যস্ত। যীশুখ্রীষ্ট একবার শিষ্যদের প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমরা কি নিজেদের আরও

এক হাত বেশি উঁচু ভাবতে পারো ?' আমরা কখনই তা পারি না। অথচ এই ধরণের ধারণা বোধহয় দৈনন্দিন জীবনেও দেখা যায়। অনেক স্ত্রীই ভাবে তারা এমন কিছু করতে পারে। আমি একজন ভদ্রমহিলার কথা জানি যে প্রায় বিশ বছর ধরে চেষ্টা করে চলেছিলেন স্বামীকে কোন উঁচু পদে আসীন দেখতে। তাদের যখন বিয়ে হয় তখন ভদ্রলোক ছিলেন একজন খুবই যোগ্যতাসম্পন্ন সীসার টাইপ তৈরির কারিগর।

স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য লোকটি আগের ওই সীসার কাজ ছেড়ে দিয়ে যোগ দিল মস্ত এক প্রতিষ্ঠানে, তাও কেরানী হিসেবে। লোকটির কিন্তু বর্তমানের আয় আগের কাজের তুলনায় বেশ কমই। তবে তফাৎ হল যে এখন একজন ভদ্রলোক বলেই নিজেকে পরিচয় দিতে পারে, এখন সে আর সাধারণ কারিগর নয়। সে এইভাবে মাঝারি আকারের কেরানী হওয়ায় জীবনেও বিশেষ কিছু করতে পারে নি। কিন্তু তার স্ত্রী গর্ব করে সকলকে একথাই বলতে পারে যে সে সাধারণ মিস্ত্রীর পর্যায় থেকে স্বামীকে উঁচুতে তুলে আনতে সক্ষম। স্বামীকে এই ভাবে কোন ভাল ব্যবসায় লাগানোর এই প্রচেষ্টাকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো উচিত।

কোন মানুষকে, সে যে কাজ পছন্দ করে না সে ব্যাপারে যতই উদ্যোগী করে তোলার চেষ্টা করা হোক না কেন সে ওই কাজ কিছুতেই মন দিয়ে করতে পারে না। উন্নতি জড়িত থাকলেও আবার দেখা যায় মানুষ তাতেও সফল হয় না। আবার কখনও কখনও বেশি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগও দুর্ভাগ্যের সূচনা করে বসে।

একটা উদাহরণ রাখছি এ ব্যাপারে। আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনলুলুর পুলিশ বিভাগের ক্লিফোর্ড ওয়েজম্যানের কথাই বলতে চাই। সে ছিল পুলিশের মোটর টহলদারী দলের একজন। সে বাস করে হাইডেন স্ট্রীটে। তার ছোট মেয়ে জন্মানোর সময় তাকে অন্য এক দপ্তরে বদলি করা হয়। এই বদলীর ফলে তার মাইনেও বাড়ে। কিন্তু এর ফলে তার পরিশ্রম আর দায়িত্বও অনেক বৃদ্ধি হয়।

এর ফলে স্ত্রী আর শিশুকন্যার দেখাশোনা করার মত সময়ও তার থাকেনি। কিন্তু বাধ্য হয়েই তাকে নতুন কাজের দায়িত্ব পালন করে চলতে হল। এর পরিণামে কিন্তু ওয়েজম্যানের ওজন কমতে শুরু করল, অনিদ্রা রোগ আক্রমণ করলো। অবসাদে প্রায় ভেঙে পড়তে লাগল ওয়েজম্যান। শেষ পর্যন্ত তাকে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হল। ডাক্তার নানা পরীক্ষার পরেও কোন দৈহিক রোগ আবিষ্কার করতে পারলেন না। কিন্তু ওয়েজম্যানের সঙ্গে নানা আলোচনা করার পর ডাক্তার আসল রোগ নির্ণয় করতে পারেন। এবার ডাক্তার পুলিশ প্রধানকে জানালেন ওয়েজম্যানকে যেন আগের পদেই কাজ করতে দেওয়া হয় না হলে তারা একজন দক্ষ পুলিশ কর্মীকে হারাবেন। কারণ ওয়েজম্যান অবসাদগ্রস্ত। পুলিশ প্রধান আবার ওয়েজম্যানকে আগের পদেই ফিরিয়ে আনার পর তার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটতে লাগল। তার ঘুম ভাল হতে লাগল, ওজন বৃদ্ধি হল আর সব অবসাদও দূর হয়ে গেল। ওয়েজম্যান বলেছিল, 'আমি এটাই শিখেছি যে কাজ পছন্দ করি তা বাড়তি মাইনের চেয়ে ঢের ভাল। মাইনের চেয়ে ঢের বেশি মহৎ হল স্বাস্থ্য, সুখ ও তৃপ্তি।'

ক্লিফোর্ড ওয়েজম্যান ভাগ্যবান কারণ সে সময় মতই শিক্ষা পেয়েছিল। আবার কিছু লোক বেশ সময় কাটার আগে সহজে শিক্ষাটি পান না। যাঁরা 'জন কোয়লডার পয়েন্ট অব নো রিটার্ন' নামে উপন্যাসটি পড়েছেন তারা নিজের নিজের স্ত্রীদের কথাটা বারবার স্মরণ করতে চেষ্টা করেন। কারণ অনেকের স্ত্রীই তাদের স্বামীদের চাকরিতে উঁচু পদে আর তার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজেও উঁচুতে দেখতে আগ্রহী। প্রতিযোগিতায় স্বামীদের জয়ই তাদের একমাত্র কাম্য। এই সব স্ত্রীদের একান্ত মনোগত বাসনা হল ছেলেমেয়েদের স্কুল, ক্লাব, পোশাক, জীবনযাত্রা, এর সবেই উঁচুতে স্থান বজায় রাখা। হঠাৎ কোনভাবে কোন স্বামী এই ধরণের উঁচুপদে আসীন হলে পরে কিন্তু নানা সমস্যা পারিবারিক জীবনকে কণ্টকিত করে তোলে। তখন স্বামীদের আর আগের জায়গায় ফিরে আসার পথ থাকে না। কারণ সেটা তার

ক্ষমতার বাইরে। একথা অনস্বীকার্য যে অত্যধিক মাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা সাংঘাতিক রকম ক্ষতিকর। নিউইয়র্ক টাইমসের সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় একটি খবরের শিরোনাম আমার নজরে পড়েছিল। শিরোনামে জানা যায় যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বহু অফিসার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। কাহিনীটিতে একজনের উদাহরণ ছিল। তিনি ৪১ বছর বয়সের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক কর্মচারী—ভদ্রলোক অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার কবলে পড়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথটাই বেছে নিয়েছিলেন। তার মূলে ছিল একজন বৈদেশিক দপ্তরের কূটনীতিকের পদে আসীন হওয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি দুতিন বার 'ফরেন সার্ভিস পরীক্ষায়' অকৃতকার্য হন।

এই ব্যাপারে আমাদের কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। আমরা আমাদের আয়ত্তাধীন কাজের অনবরতই সমালোচনা করি—আর যে কাজ আমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত তারই প্রতি আমাদের আগ্রহ থাকে সব চেয়ে বেশি। এই আলেয়ার পিছনে ছুটতে চেয়ে আমরা ব্যর্থ হই আর নিজেদের বা স্বামীদের আত্মহত্যার পথ খুলে দিতে চাই। এই বিষয়ে ডঃ পিটার জে. স্টেইনক্রোন 'হাউ টু স্টপ কিলিং ইওরসেলফ' গ্রন্থটিতে এই ধরণের মনোভাবসম্পন্ন স্ত্রীদের দায়ী করেছেন। যারা আরও সম্মান অর্থ আর জীবন ধারণের জন্য বিলাসিতা আর তারই সঙ্গে প্রতিবেশীদের চেয়ে আরও যশ প্রতিপত্তি লাভ করার জন্য স্বামীদের উৎসাহিত করেন সেই স্ত্রীদের তিনি দোষারোপ করেছেন।

ডঃ স্টেইনক্রোন বলেন, 'ওই ধরণের মহিলারা হয় জন্মসূত্রে বা শিক্ষার ফলে এই ধরণের অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাসী হয়ে থাকেন। উচ্চশিক্ষিতা হওয়ার পরিণতিতে তাদের দ্বারা যে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হতে থাকে এরকম উদাহরণ আমি দেখেছি। অতএব আমাদের একমাত্র উচিত কাজ হবে আমাদের স্বামীদের তাদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে দেওয়া আর অযথা বিব্রত না করা। কোন ভাবেই স্ত্রী হিসেবে আমাদের উচিত নয় স্বামীদের অনির্ধারিত কোন কাজের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা।

বিখ্যাত লেখক এন. ডি. ব্যারোচ আর 'আর্ট অব লিভিং' গ্রন্থে বলেছেন যে একজন রাষ্ট্রনায়ক কখনই রাষ্ট্রের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। আবার তেমনই একজন ভ্রমণকারী পৃথিবীর সব দেশও ভ্রমণ করতে পারেন না। এই জন্যই প্রয়োজন দেখা দিলে কোন প্রলোভনে মত্ত অনুপযুক্ত ব্যক্তিকেও দরকার হলে কোন প্রকল্প থেকে সরিয়ে দিতে হয়।

তাই এই কথাটি স্ত্রীদের মনে রাখা চাই ঃ

আপনি যদি আপনার স্বামীর সাফল্য চান তাহলে তাকে উৎসাহিত করুন, ভালবাসুন ও তাঁর সহকর্মী হয়ে উঠুন। কিন্তু সাবধান তাকে দিয়ে জোর করে অতিরিক্ত কিছু করানোর চেষ্টা একেবারেই করবেন না।'

।। একুশ ।।

পরিবর্তনে ভয় পাবেন না

আমেরিকার কানসাস প্রদেশের এক খামারের মালিক চার্লস রবার্টসন আশি বছর আগে একবার পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান সীমান্তে গিয়ে কিছু করতে পারেন কি না। এরকম কিছু মনস্থ করেই তিনি তার স্ত্রী হ্যারিয়েট সমস্ত মালপত্র আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা ওয়াগনে চেপে অজানার দিকে যাত্রা আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত তারা আমেরিকার ওকলাহোমার উত্তর-পূর্ব দিকে সিমারুন নদীর তীরে থাকার ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সেখানে রবার্টসন একটা কাঠের বাড়ি বানিয়ে ফেলেন। এরপর কিছুদিন কাটলে তিনি সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে ওই ছোট্ট গ্রামীন এলাকায় একটা দোকান করেন। ওই গ্রামটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে 'টালমা' নামে পরিচিত। হ্যারিয়েটের সময় তেমন ভাল যাচ্ছিল না। স্বাস্থ্য দুর্বল, বিশেষ করে তার নটি সন্তান সামলাতে। অর্থাভাবে ভাল খাদ্যও মেলে না। তাদের যে ঘর বানানো হল, সেটা সম্পূর্ণ খবরের কাগজ

দিয়ে তৈরি। গ্রামে ডাক্তার বলেও কেউ ছিল না। ছেলেমেয়েদের স্কুল বলে যা ছিল তা মাত্র একখানা কামরার এক মিশনারি স্কুল। আবহাওয়াও যেমন গরম তেমনই শীত। তা সহ্য করা বেশ কঠিন। কিন্তু রবার্টসন দম্পতি এর সব কিছুই সহ্য করে চলেন, তারা ওই এলাকার আদিবাসীদের মতই প্রকৃতিকে মানিয়ে নিলেন আর ধীরে ধীরে সফলতার দিকে এগিয়ে চলতে থাকেন। হ্যারিয়েট স্বামীর জন্য সবই হাসিমুখে সহ্য করতে থাকেন। তিনি স্বামীকে দেখতে চাইতেন একজন উন্নতিশীল নাগরিক আর ছেলেমেয়েরাও শিক্ষিত। তারা সত্যিকার সুখী দম্পতিই হয়ে ওঠেন।

ধীরে ধীরে রবার্টসন পরিবার ওই এলাকায় পরিচিত হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওই সুদূর সীমান্ত এলাকা যে উন্নত হয়ে ওঠে তার জন্য এই পরিবারটির দান অসামান্য। এক নতুন অঞ্চল সেখানে তাদের চেষ্টায় গড়ে ওঠে। সবচেয়ে প্রশংসিত হন কিন্তু মিসেস রবার্টসন। তাঁর স্বামীর প্রতি অবিচল আস্থা, ভালবাসা আর কঠিন পরিশ্রমই এই সুন্দর পরিবেশের জন্ম দেয়। হ্যারিয়েট রবার্টসনের জীবন থেকে প্রমাণ মেলে যারা কষ্ট আর সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে স্বামীকে উৎসাহ যোগাতে পারে তারা রোগ, কষ্ট, বিপদআপদ সবকিছুই অনায়াসে দমন করতে সক্ষম। ভয় তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। এই ধরণের মানুষ কোনদিনই ভেঙে পড়তে জানে না, তারা আরাম বা আয়েসের জন্য মোটেই লালায়িত থাকে না বলেই কোন বাধা বিপত্তি তাদের অগ্রগতি স্তব্ধ করতে পারে না। তারা কখনও অতীতে সুখ, ঐশ্চর্য বা ধনসম্পদের জন্য ভাবেন না। কোনভাবে সুখ সমৃদ্ধি তাদের হস্তগত হলেও তারা অহঙ্কার করতে জানেন না। সব দেশেই এমন মানুষ ধন্যবাদের যোগ্য।

এই বিচিত্র সংগ্রামী রবার্টসন পরিবারের মত মানুষ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অথচ তেমন বেশি নেই। আমেরিকার ইতিহাসে যে সব মহিলা নাম কিনেছেন তাদের অনেকেই তাঁদের স্বামীদের জীবন করে তুলেছিলেন শুষ্ক মরুভূমির মত। তারা অহমিকায় সন্তানদের দিয়ে যেতে

পেরেছেন মূল্যহীন অহংকার আর গর্ব। তাদের কাজে বৃথা আত্মগর্বই প্রকট হয়েছে। একথা মনে রাখা চাই যে স্ত্রী স্বামীর সাফল্য প্রয়াসী তাকে অগ্রগামী মহিলাদের মতই উৎসাহী আর সংগ্রামী মনোভাব সম্পন্ন হতে হয়। স্বামীর পছন্দমত কাজেই তাকে উৎসাহ দিয়ে চলতে হয়। দুঃখ কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাও তাকে অর্জন করতে হবে। রাখতে হবে সাহস আর দুর্জয় মনোবল, ভয়ে পিছিয়ে আসা চলবে না। যারা এমন বিশ্বাসে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন তাদের প্রাপ্তিও হয়ে ওঠে সহজতর।

একজন মানুষের কথা আমার জানা ছিল যিনি তার নির্দিষ্ট চাকরিটি করতেন একান্ত অনিচ্ছায়—তার কাছে ওই কাজ যেন মৃত্যুর আদেশের মত মনে হত। এর কারণ তারই স্ত্রী—স্ত্রী চাইতেন আরও নিরাপত্তা আর উন্নতি।

ভদ্রলোক চাকরি শুরু করেন এক বুককিপার হিসেবে। আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ভদ্রলোক একটা মোটরগাড়ি মেরামত করার কারখানা স্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বিয়ে করেন। তার স্ত্রী চাইলেন যা করছেন নিজেদের একটা বাড়ি না হওয়া পর্যন্ত সেটাই করে যান। শেষ পর্যন্ত তাদের একটা বাড়িও হল, ততদিনে একটি সন্তানও হয় তাদের। কিন্তু স্ত্রী সেখানেই থামলেন না, তার চাপে পড়ে ভদ্রলোক পরিশ্রম করেই চললেন। বেশ কয়েক বছর ওইভাবেই কেটে চলল। লোকটি বীমা, ছেলের শিক্ষা ব্যবস্থা সবই প্রয়োজনমত করলেন। কিন্তু ভদ্রলোক যা করছিলেন তার বেশিরভাগই নেহাৎ অনিচ্ছায় শুধু স্ত্রীর চাপে পড়ে কারণ ওই কাজে নিজের সায় ছিল না। কোন পরিবর্তন তার স্ত্রীর মোটেই কাম্য ছিল না।

ভদ্রলোক আজ জীবনসায়াহ্নে ক্লান্ত। বার্ধক্যের দরজায় পৌঁছে তিনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন, স্মরণশক্তি প্রায় নেই বললেই চলে। কোন রকমে জীবনের বোঝা বহন করে চলেছেন তিনি। সারা জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই তার কেটে গিয়েছিল অতৃপ্তির মধ্য দিয়ে, হতাশায় ভরা কাজ করতে বাধ্য হয়ে যে কাজে

কণামাত্র আনন্দও তার মেলেনি। স্ত্রীর চাপে তাকে এমন কাজ করে যেতে হয় যাতে মানসিক আনন্দ ছিল না।

অথচ লোকটিকে যদি তার ইচ্ছামত কাজ করতে দেওয়া হত তাহলে ব্যর্থ হয়েও তিনি কি পেতে পারতেন? অন্ততঃ এটুকু বলা যায় তিনি মানসিক আনন্দ লাভ করতেন, পেতেন অনাবিল তৃপ্তি। শুধু ব্যর্থতা নয়, হয়তো একদিন সাফল্যও আসত তার। অবশ্য আশার কথা, এই ধরণের স্বার্থপর স্ত্রীর সংখ্যা অবশ্যই কম।

আমেরিকার শেফার রিউয়িং প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি প্রায় ছ'হাজার গৃহিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এক সমীক্ষা তৈরি করেছেন। এই সমীক্ষায় দেখা যায় শতকরা পঁচিশ ভাগ গৃহিণী তাদের স্বামীদের জীবনে কোন পরিবর্তন চান না। বাকি শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কিন্তু পরিবর্তন চান।

এই ধরণের একটা উদাহরণ উল্লেখ করছি এখানে। একজন লোকের কথাই বলছি, কারণ ঘটনাটা আমার জানা। লোকটি ওকলাহোমার টুলসাতে এক তেল কোম্পানীর কোষাধ্যক্ষের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন নাম চার্লস্ রেনল্ডস। যুবক রেনল্ডস বেশ দক্ষ আর করিৎকর্মা ছিল। প্রতিষ্ঠানে তার বেশ প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল। স্ত্রী আর তিনটি সন্তান নিয়ে তার সংসার। বেশ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত ছিল রেনল্ডসের।

রেনল্ডসের আরও একটি গুণ ছিল, অবসর মিললেই সে ছবি আঁকতে ব্যস্ত থাকত। তেলরঙের ছবিতে ওর দক্ষতা ছিল। নিজের আঁকা বহু ছবি ওর অফিসের দেওয়ালে শোভা পেত! মাঝে মাঝে আঁকা ছবি সে বিক্রিও করত। নিজের কাজে দক্ষতা থাকলেও রেনল্ডস কিন্তু আসলে ছবি আঁকার কাজেই সময় বেশি দিতে চাইত। রঙ তুলিই তাকে বেশি আকর্ষণ করতে চাইত। রেনল্ডসের খুবই ভাল লাগত নিউ মেক্সিকোর টাওস শহর। টাওসের কথা তার প্রায়ই মনে পড়ত। তিনি তাই মনে মনে ঠিক করেই নিয়েছিলেন চাকরি ত্যাগ করে টাওসেই পাকা-পাকি ভাবে বাস শুরু করবেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে মনের কথাটা রেনল্ডস স্ত্রীকে বলেও ফেললেন। স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া হল চমৎকার। তিনি

জবাবে বললেন, 'চমৎকার হবে। আমরা এখানকার সব কিছু বিক্রি করে টাওসে শিল্পীর দোকান খুলব। আমি ছবি বাঁধাই করতে জানি। আমি দোকান দেখাশোনা করব আর তুমি ছবি আঁকবে। আমি জানি এরকম করলে বেশ গুছিয়ে নিতে পারব।'

স্ত্রীর উৎসাহ আর আগ্রহে চার্লস্ রেনল্ডস তার চাকরি ছেড়ে রঙ তুলিকেই জীবনের ব্রত করে তুললেন এরপর। গোটা পরিবারই এবার এক নতুন অভিযানে নেমে পড়ল। এমন কি তাদের ছেলে চার্লস্ জুনিয়র স্কুলের ফাঁকে দোকানে কাজ আরম্ভ করেছিল, যে সময় ওর বাবা ছবি আঁকায় ব্যস্ত থাকত। রেনল্ডসের ছবি আঁকার হাত ভাল থাকায় সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রেই তার ছবির প্রদর্শনী হতে থাকল। সব জায়গাতেই হয় তার একক প্রদর্শনী। টাওসে ততদিনে রেনল্ডসের নিজস্ব স্টুডিও আর গ্যালারীও গড়ে উঠেছিল। তিনি বর্তমানে টাওসের চিত্রশিল্পী পরিষদেরও সভাপতি। এর সব কিছুর মূল কিন্তু মিসেস রেনল্ডসের উৎসাহ আর প্রেরণা তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ধরণের নতুন প্রচেষ্টা সফল হওয়ার মূলে কিন্তু কিছু সুবিধাও কাজ করেছিল, সেটা স্বীকার করা দরকার। তবে যাই হোক জেনারেল ভেনডিগ্রিফের মত হল এটা অনেকটা যুদ্ধযাত্রার আগে রণতরীর সাজেরই মত। ইসলাম ধর্মে বলা হয় 'স্রষ্টা সাহসী ও ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিদের জয়ী করেন।' কথাটা সত্যিই খাঁটি। উদ্যোগী পুরুষকেই ঈশ্বর জয়ী করে থাকেন।

একটা কথা অবশ্যই স্মরণ রাখা দরকার, আর তাহল যে কাজ মানুষকে সুখী করে তোলে সেই রকম কাজই তার উপযুক্ত, যে কাজ তাকে শুধু ধনী বা সম্পদশালী করে সে কাজ নয়। যে কাজে কোন মানুষ তৃপ্তি পায় না সে কাজে তার সাফল্যও আসে না। এই কারণেই স্ত্রীদের কর্তব্য সচেতন হওয়া উচিত—তাদের স্বামীদের প্রতি গভীর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাদের কাজের স্বাধীনতা দিতে হবে। অতিরিক্ত অর্থলোভ আর সামাজিক প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষাও তাই ত্যাগ করতে হয়। সাফল্য আসে সেই সমস্ত স্বামী স্ত্রীদের, যে স্ত্রীরা স্বার্থপরতাশূন্য হয়ে স্বামীর কাজে সময়মত প্রেরণা জোগাতে তৈরি।

আমেরিকার স্যালভেসন আর্মি এর এক জ্বলন্ত উদাহরণ। এই প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেছিলেন উইলিয়াম বুথ। অথচ এর গঠনে বুথের চেয়ে ঢের বেশি প্রশংসা প্রাপ্য তার স্ত্রীরই। তার দান ঢের বেশি ছিল এতে। উইলিয়াম বথ ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধন করার ব্রত নিয়েই গরীব অনাথ আর লণ্ডনের নিষিদ্ধ পল্লীর বাসিন্দাদের উদ্ধারের কাজ হাতে নিয়েছিলেন স্যালভেসন আর্মি গড়ে তুলে। এই কাজের ফলে তার নিজের স্ত্রী আর সন্তানদের শীত আর খাদ্যের অভাবে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। উইলিয়াম বথের নিজের শরীরও এর ফলে প্রচণ্ড পরিশ্রমে ভেঙে যায়। ছোটবেলা থেকে তার স্ত্রী ক্যাথারিনের মেরুদণ্ডের রোগ ছিল। এর জন্য তাকে 'ব্রেস' নামে বিশেষ ধরণের ফিতে লাগানো জামা ব্যবহার করতে হত। এ ছাড়াও তিনি আবার ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন। জীবনের অন্তিমে তা ছাড়াও তার ক্যান্সার রোগ দেখা দেয়। তিনি মৃত্যু শয্যায় শুয়ে স্বীকার করেন, 'জীবনে আমি এমন একদিনও কাটাই নি যেদিন ব্যথা অনুভব করিনি।' এই রোগজর্জর মহিলা শুধু ওই শরীর নিয়ে ছেলেমেয়েদের আর স্বামীর দেখাশোনা করেন নি, বরং স্বামীর ওই মহৎ কাজে জুগিয়ে চলেছিলেন নিরন্তর প্রেরণা। অবহেলিত মানুষদের জন্যেও তার ছিল অকুণ্ঠ ভালবাসা। সারাদিনের অক্লান্ত খাটুনির পর রাতের বেলায় তিনি ওইসব সমাজ বিতাড়িত হতভাগ্যদের খোঁজ নিতেন, কার তখনও খাওয়া জোটেনি, কার রোগ হয়েছে এই সব। নোংরা পল্লীর অধিবাসীদের জন্য ছিল তার অপরিসীম করুণা। কুমারী মায়ের থাকার ও খাওয়ার সব ব্যবস্থা করাই ছিল তার কাজ। সমাজে যারা অপরাধী বলে ঘৃণিত সেই সব চোর, বদমায়েশ আর পতিতাদের খোঁজ নেওয়াই তার ব্রত ছিল।

ক্যাথারিন বুথ ওইসব সমাজচ্যুত মানুষদের মঙ্গলের জন্য কি করতেন আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। কিন্তু এই অমানুষিক পরিশ্রমের ফসলও দেখা দিল—যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদের তরফ থেকে এই কাজের জন্য তাদের প্রচারের জন্য অঞ্চল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

বুথ দম্পতি এরপর নিষিদ্ধ পল্লীতে তাদের সমাজসেবার প্রচার চালাতে পারতেন। প্রথমে ক্যাথারিনকে বাদ দিয়ে অনুমতি দিতে চাইলে উইলিয়াম বুথ তাতে তীব্র আপত্তি তোলেন এই বলে যে তার স্ত্রীর নির্ভেজাল সেবা আর প্রেরণাই স্যালভেসন আর্মির প্রাণ। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না ক্যাথারিনের স্বামী কাজের ফল দেখার জন্যই বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল। বুথ মহাপ্রয়াণ করলে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের অবতারণা হয়। ৬৫ হাজার মানুষের এক বিশাল মিছিল লণ্ডনের রাস্তায় বের হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন তারই স্বামী উইলিয়াম বুথ। লণ্ডনের লর্ডমেয়র সেই মিছিলের একজন ছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন রাজা আর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। বুথের অন্তিম যাত্রায় পাঁচ হাজার স্যালভেসান আর্মির কর্মী শোকে অভিভূত হয়ে তাদের সেনাপতিকে শেষ অভিবাদন জানিয়েছিল। আমার মনেহয় সেই ক্ষুদ্র মহিলাটি আত্মত্যাগ করেছিলেন শুধু তার স্বামীর অভিযানকে বাস্তবায়িত করার বাসনাতেই।

তাই মনে রাখবেন সাফল্য বলতে তাকেই বোঝায় যে কাজ আপনার পছন্দ তাই করা আর অপছন্দের কাজ সম্পূর্ণ দূর করে দেওয়া। আমরা কারও পরিপূর্ণ সাফল্য চাইলে তাকে পরিপূর্ণতা অর্জন করতেই হবে। তাদের পরিবর্তনের জন্য উৎসাহিত করতে হবে আর তারই সঙ্গে নানা বিপত্তির জন্যও তৈরি থাকতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ের সূত্র :

স্ত্রী হিসেবে আপনি স্বামীকে সুখী সমর্থ দেখতে চাইলে নিচের এই ত্রুটিগুলো ত্যাগ করুন :

১। অযথা বিরক্ত করবেন না।

২। স্বামীর অফিসের কাজে নাক গলাতে চাইবেন না যাতে তার কাজের জায়গায় অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

৩। স্বামীর ক্ষমতার বাইরে এমন কিছু তাকে বলবেন না বা তাকে দিয়ে করানোর চেষ্টা করবেন না।

৪। সুযোগ গ্রহণ করার সময় কোন কাজে ভীত হবেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

।। বাইশ ।।

স্বামীকে সুখী করার চেষ্টা করুন

এক সমাধিতে সমাধিস্তম্ভে লেখা ছিল :

"সে ছিল অফুরন্ত সুখদায়িনী।"

একজন লেখক জে. হার্ডি তার এক বইতে লেখেন একটি সমাধি প্রস্তর ফলকে ওই লেখাটি তার চোখে পড়েছিল। পাঠক পাঠিকাদের এই ফলকের লেখা সম্পর্কে কি অভিমত থাকতে পারে আমার জানা নেই। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এমন স্মৃতিফলক সত্যিই সুন্দর। কোন বেদনাভারাক্রান্ত স্বামী তার প্রয়াতা স্ত্রীর স্মৃতিফলক গ্রথিত করেছেন, তার মনে হয়তো স্ত্রীর হাজারো স্মৃতি ভিড় করে এসেছিল, মনে পড়ছিল স্ত্রীর হাসি উচ্ছল মুখ, তার সেবা আর ভালবাসার সুখ স্মৃতি।

এটা ঠিকই যে কোন সুখ প্রদায়িনী স্ত্রীর বিশেষ কিছু গুণ অবশ্যই থাকে। স্বামীকেও তার মধ্যে বাদ দেওয়া উচিত নয়। অভিজ্ঞদের মতে যে সব স্ত্রী স্বামীদের মনোহারিণী তাদের স্বামীরা কাজে সব সময় সাফল্য লাভ করেন।

এ ব্যাপারে একটা আশ্চর্য কিছু লক্ষ্য করা যায়। অনেক মহিলাই অন্তর দিয়ে তাদের স্বামীদের ভালবাসে কিন্তু স্বামীদের সন্তুষ্ট করতে পারে না। তারা ছোট ছোট ভুল ভ্রান্তি করে বসেন। অথচ তাদের বেশ সদিচ্ছা থাকা সত্বেও এমন হয়। এটা কোন অকারণ জিনিস নয়। এমন হওয়ার কারণ হল এই স্ত্রীরা সব কিছু তলিয়ে না দেখেই কাজ করতে চান। এই ত্রুটি অবশ্য সহজেই শুধরে নেওয়া যায়।

কোন একজন মানুষকে সন্তুষ্ট করা আসলে তেমন কঠিন কাজ কখনই নয়। স্বামীই সেই একজন মানুষ। সামান্য চেষ্টা, যত্ন আর আশাতীত রকম কম সময়েই একাজ যে কোন স্ত্রীই আগ্রহী হলে করে

ফেলতে পারবেন। অনেকের ভুল ধারণা আছে এসব কাজ করতে হলে তাকে রূপযৌবন আর সৌন্দর্যের মাধ্যমেই করতে হবে। তারা ভুলে যান যে সৌন্দর্য ক্ষণিক আনন্দ দান করতে পারে, চিরকালীন নয়। ভালবাসার সঙ্গে সৌন্দর্যের কোন যোগ নেই।

দৈহিক সৌন্দর্য কখনও ভালবাসা বা সুখের পক্ষে একান্ত কোন অপরিহার্য বস্তু আদপেই নয়। এমনও দেখা যায় যে অনেকে মনের আর অন্তরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য দৈহিক সৌন্দর্য বাড়ানোর চেষ্টায় যত্নবান হতে চান। মনে রাখবেন বহু নারীই তাদের স্বামীদের মনোহরণ বা মনোরঞ্জন করার জন্য তাদের সৌন্দর্য কাজে লাগান নি, এমন কি বহু বিখ্যাত মহিলা, সুন্দরী ছিলেন না। প্রতিটি প্রথম শ্রেণীর 'ব্যক্তিগত সচিব' বা প্রাইভেট সেক্রেটারি জানেন কিভাবে তাদের বসকে সন্তুষ্ট আর সেবা করতে হয়। এই ধরণের কাজ যারা করেন তারা যে সব সময় অপরূপ সুন্দরী হন তা আদপেই নয়। তাদের গুণ মনোরঞ্জন আর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং দক্ষতায় নির্ভরশীল। ব্যক্তিগত বহু সখও তারা এজন্য ত্যাগ করেন।

আমরা যারা স্ত্রী, তারা এই ধরণের সেক্রেটারি কেমন করে হতে হয় বই থেকে বহু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। এই কাজে যারা দক্ষতা অর্জন করেছি তারা কিন্তু বেশ সহজেই বস-দের মত স্বামীরও মনোরঞ্জন নিশ্চয়ই করতে পারব। স্মরণযোগ্য সফল কোন মিলন আর পারিবারিক শান্তি কিন্তু স্ত্রীদের সুন্দর চিন্তা, শিক্ষা আর করণীয় কাজের মধ্য দিয়েই আসে আর এরই উপর নির্ভর করে। আমি যখন মিসেস এলিনর রুজভেল্টের একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন যে তার স্বামী ভ্রমণে বের হওয়ার সময় তাদের ছেলেমেয়েদের যে কোন একজনকে সঙ্গে নেওয়া ভালবাসতেন। এই ভ্রমণ করার সময় ছেলেমেয়েরা বেশ শ্রমসাধ্য কাজগুলোয় হাত লাগানোয় সেগুলো বেশ সহজ হয়ে যায়। দু সপ্তাহ ভ্রমণ করলে ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু বেশ উল্টোপাল্টাও করে দেয়। তিনি বলেন, 'ওই রকম ভ্রমণে বেশ পারিবারিক আনন্দ পাওয়া যায়। যার

ফলে আমার স্বামীর অনেক কঠিন কাজও অনেক সোজা মনে হয়।'

অন্য একজন রাষ্ট্রপতির স্ত্রী মিসেস ডি. ডি. আইসেন হাওয়ারের মত হল 'একজন মহিলার প্রাথমিক দায়িত্ব হওয়া উচিত যে সব ছোট ছোট কাজ অন্যদের খুশি করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।' লর্ড চেষ্টারফিল্ডের মত হল এই সব কাজের গুরুত্ব অনেক। 'ভাল ব্যবহার ছোট ছোট উৎসর্গ থেকেই আসে।' সুখী দাম্পত্য জীবনের গোপন কথাটি হল এটাই। যে সব স্ত্রীরা এই সব ব্যাপারে মনোযোগী তারাই এই ক্ষুদ্র উৎসর্গের পুরস্কার পান। নিউ ইয়র্ক শহরের মিসেস ওলগা এই রকমই পুরস্কার পেয়ে ছিলেন। তিনি থাকেন ২১৯ ওয়েস্ট ৮১ এম, টি, স্ট্রীট, নিউইয়র্কে। ওলগা ছিলেন রাওল ক্যাপাব্ল্যাঙ্কার বিধবা স্ত্রী। ক্যাপাব্ল্যাঙ্কা ছিলেন কুবানের একজন কূটনীতিজ্ঞ আর আন্তর্জাতিক দাবা চ্যাম্পিয়ন। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাধর জনপ্রিয় আর জোরালো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। বিয়ের পর ক্যাপাব্ল্যাঙ্কার মধ্যে এক নতুন জীবনের সাড়া জেগেছিল। ওলগা সব সময়েই স্বামীর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলার ব্যাপারে সহায়তা করে চলতেন।

এমন আশ্চর্য ব্যাপারটি ওলগার জীবনে সত্যিই ঘটে। কিন্তু কি ভাবে নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন আপনারা। এটা ঘটে সেই ছোট ছোট উৎসর্গ থেকে। যখন ক্যাপাব্ল্যাঙ্কা কোন ভাবনায় গভীরে ডুবে থাকতেন তখন ওলগা তাকে মোটেও বিরক্ত করতেন না। ওলগা পার্টিতে যেতে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামীর ইচ্ছায় তিনি বেশির ভাগই বাড়িতেই থেকে যেতেন। তাদের বাড়িতে প্রচুর মানুষের আগমন ঘটতো, আর তিনি স্বামীর যে পোশাক অপছন্দ সঙ্গে সঙ্গেই তা পালটানোর ব্যবস্থা করতেন। ক্যাপাব্ল্যাঙ্কা ছিলেন চিন্তাবিদ। তিনি দর্শনশাস্ত্র আর ইতিহাসের অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু ওলগা পড়তে ভালবাসতেন হালকা উপন্যাস। কিন্তু স্বামীর মনোরঞ্জনের আর কথোপকথনের আনন্দ পাওয়ার জন্য ওলগা নিজে মনোযোগ দিয়ে দর্শন আর ইতিহাস পড়তে শুরু করেন।

ক্যাপাব্ল্যাঙ্কা কি স্ত্রীর প্রশংসা করতেন কখনও? প্রশ্নটা নিশ্চয়ই

উঠতে পারে। এমন প্রশ্ন অনেকে ক্যাপার‍্যাঙ্কাকে সরাসরি করে বসলে তিনি তাদের মহা মূর্খ আখ্যা দেন। নিশ্চয়ই স্ত্রীকে ভালবাসতেন তিনি। একবার স্ত্রীকে তিনি স্কুলের ছেলেদের মতই চকোলেট উপহার দিয়েছিলেন। ওই উপহার পেয়ে ওলগা কিন্তু আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। এর পর থেকে ওলগা প্রায়ই স্বামীর কাছ থেকে ছোট ছোট নানা রকম উপহার পেতেন। একবার ক্যাপার‍্যাঙ্কা পয়সা খরচ করে একজনকে দিয়ে নানা আকারের শিশি বোতল বাক্সে ভরিয়ে রাখেন—উদ্দেশ্য ছিল ওলগার সেগুলো দেখে মনের ভাব কেমন হয় তাই দেখা। কিন্তু মিঃ ক্যাপার‍্যাঙ্কা চিন্তাবিদ ছিলেন বলেই কখনও এমন কিছু করতে চাননি যাতে তাঁর স্ত্রী দুঃখ পেতে পাবেন। তাকে দুঃখ দিয়ে তিনি কখনও আনন্দ পেতে চাননি। এমন কিছু তিনি করেন নি যাতে দাম্পত্য জীবনে দুঃখ আসে।

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে স্ত্রীরা স্বামীদের সুখী করতে পারেন তারা নিজেরাও তারই সঙ্গে সুখী হন। তারা সহজেই পরিচিতজনদের বলতে পারেন, 'স্বামীর সহযোগিতায় আমাদের জীবন কানায় কানায় পূর্ণ।'

কোন মানুষকে সুখী করে তার জীবনে আরাম আর সুখে পূর্ণ করলে তার কাজের মানসিকতারও পরিবর্তন আনা সম্ভবপর। একথাটা তাই বলা যায় একজনের কর্তব্য আর সহযোগিতার মধ্য দিয়েই, অন্য-জনের ব্যক্তিত্ব আর কর্মক্ষমতা প্রসারিত করা যায়। একজন মানুষকে তাই সুখী করে তাকে পৃথিবীতে সাফল্যের পথে এগিয়ে দেওয়া যায়।

হয়তো তাই চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর পরে বলা যায় 'সে ছিল অফুরন্ত সুখদায়িনী।'

॥ তেইশ ॥

সুখ দুঃখের সাথী

পরস্পরের সুখ দুঃখের সাথী হওয়ার মত আনন্দময় কাজ আর পৃথিবীতে নেই। এক টুকরো শক্ত রুটি ভাগ করে খাওয়ার মানেই হল একে অপরের কাছাকাছি হওয়া। একজনের হাসির আনন্দের শরিক হওয়ার মানেই হল মানুষের জীবনে সুখ আনার চাবিকাঠি। এই বিষয়ে গবেষণা করার জন্য সি. জি. ওডহাউস নামে একজন ২৫০ জন দম্পতির এক সমীক্ষা নিয়েছিলেন। তার মতে পরস্পরের সান্নিধ্যই হল দাম্পত্য জীবনের সফল্যের মূল কথা। কিন্তু কথা হল এই সান্নিধ্যের মূল কথাটা কি রকম? পরস্পরের গভীর প্রণয়, ছোট ছোট স্বার্থ ত্যাগ আর সুন্দর ধারণা গড়ে তোলাই আসল কাজ। সুলভ, সস্তা আবেগ আর স্বার্থ-ত্যাগ এবং সুন্দর ধারণা গড়ে তোলাই আসল কাজ। সুলভ, সস্তা আবেগ আর স্বার্থপরতা ত্যাগ সবচেয়ে ভাল কাজ একথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। এই তিনটেই আবার মানুষকে মোহগ্রস্ত করে তোলে।

একটা উদাহরণ রাখা যাক। এখানে দুজন দম্পতির কথাই আপনাদের কাছে বলছি। আর্থার মারী আর তার স্ত্রী ক্যাথরিনকে তাদের সমসাময়িক বহু নৃত্য শিক্ষক নাচের তালিম দিয়েছিলেন। মারী দম্পতির আঠাশ বছরের বিবাহিত জীবনে দুজনই ছিলেন পরস্পরের সবসময়ের সঙ্গী। এই ব্যাপারে ক্যাথরিন মারীকে আমি একবার প্রশ্ন করি: সব সময় স্বামী স্ত্রী আপনারা একসঙ্গে থেকে এক ঘেয়েমী থেকে রক্ষা পান কি করে?' মিসেস ক্যাথরিন মারী আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'কাজটা মোটেই কঠিন ভাবা উচিত নয়। আসলে এটাও ঠিক স্বামী স্ত্রীর ব্যবসায়িক আর দাম্পত্য জীবনকে আদৌ আলাদা করা সহজ নয়। এজন্য আমাকে একটু আলাদা বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়। আমি মোহময়ী মনে হয় এমন পোশাক পরি। এমন প্রসাধন করি যাতে আমার স্বামীর নজরে ছাড়া আর কারও নজরে আমার মুখের পাউডারের প্রলেপ চোখে পড়ে না। আরও একটা ব্যাপার আছে—আমরা সাধারণ সমস্ত ব্যাপারকেও ভাগাভাগি করে

নিই। যেমন, আমরা দুজনেই সাঁতার আর টেনিস খেলা ভালবাসি। সময় আর সুযোগ পেলেই আমরা ওতেই ডুবে থাকি। গত সপ্তাহে আমরা বারমুডা গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমরা নানা ভাবেই আনন্দ আর উৎসাহে ডুবে ছিলাম। জীবন আমাদের কাছে তাই মধুময় হয়ে ওঠে।' তাই মনে রাখা দরবার কাজের মধ্য দিয়েই জীবনকে যেমন আনন্দময় করতে পারে তেমনই আবার ম্লান করে তোলে। যে স্ত্রী স্বামীর প্রিয় কাজে অংশ নেয় তার সান্নিধ্য হয় অনেক প্রবল আর জোরালো।

হ্যারী সি. এইস্টেনমেজ তার পত্রিকা 'ক্লিনিকাল সাইকোলজি'তে লিখেছিলেন একজন সঙ্গীর পছন্দ প্রবন্ধ সম্পর্কে। তাতে তিনি বলেন 'যে কোন বিবাহিত জীবনের সাফল্য সঙ্গীর সঙ্গে তার পছন্দ অপছন্দ আর অভ্যাসের মিলের উপরেই নির্ভর করে।'

অতীতের মিশরের ভুবনবিখ্যাত সুন্দরী ক্লিওপেট্রার এই ক্লিনিক্যাল মনস্তত্ব সম্বন্ধে সম্ভবতঃ কোন রকম ধারণা ছিল না। তার জানা ছিল শুধু মাত্র বহু পুরুষকে ভোগ করতে। প্লুটারর্ক বলেন ক্লিওপেট্রা শুধু সুন্দরীই ছিলেন। আনন্দে অংশ গ্রহণ করার ক্ষমতা মোটেই ছিল না। তার রূপই কেবল পুরুষকে আকর্ষণ করে পতঙ্গের মত পুড়িয়ে মারত। ক্লিওপেট্রা অনেক আঞ্চলিক ভাষা জানতেন বলে রাজকার্য চালাতে আর সভাসদদের সঙ্গে তার কথা বলতে অসুবিধা হত না। অন্য কোন প্রদেশের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতেও তার দোভাষী লাগত না। তিনি প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদেরই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে তাদের সমর্থন আদায় করতে পারতেন। ক্লিওপেট্রার শেষ দিকের প্রেমিক রোমান বীর মার্ক অ্যান্টনী ভালবাসতেন মাছ ধরতে। এই কারণেই ক্লিওপেট্রা একবার মাছ ধরার উৎসবের ব্যবস্থা করে অ্যান্টনীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। অ্যান্টনী বহুক্ষণ চেষ্টা করেও বড়শীতে মাছ গাঁথতে পারলেন না। ক্লিওপেট্রার আদেশে তাঁরই একজন ক্রীতদাস জলে ডুবে বড়শীতে বিশাল একটা মাছ আটকে দিয়েছিল। আসল উদ্দেশ্য কিন্তু অ্যান্টনীর মনোরঞ্জন করা। মাঝে মাঝে ক্লিওপেট্রা অ্যান্টনীর

আনন্দের অংশীদার হওয়ার জন্য সাধারণ পোশাক পরতেন। আমাদের মধ্যে যারা কারও স্ত্রী তারা কি কখনও কথাটা ভেবে দেখেছেন? কজন, ভাবুন তো, স্বামীর মন রাঙানোর জন্য নানা ধরণের পোশাক পরতে অভ্যস্ত? ক্লিওপেট্রার মত কজন স্বামীর বড়শীতে মাছ গেঁথে দিতে পারেন? এই ধরণের কিছু অসুখী গলফ খেলতে অভ্যস্ত স্বামীদের স্ত্রীর কথা আমার জানা আছে। সেই সব স্ত্রীর অভিযোগ তাদের স্বামীর বাকি সপ্তাহ শেষের ছুটির দিনগুলো গলফ খেলার মাঠেই বাটান। বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ লি ও স্কুনমেকার বিখ্যাত আর নামী বহু সেতু তৈরি করেছিলেন। আবার তিনি ছিলেন আমেরিকার একজন নামকরা গলফ খেলোয়াড়ও! অলিম্পিকেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তার স্ত্রী কোরেন্স বিয়ের সময় জীবন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত গলফ আর স্কোয়াশ খেলোয়াড়। অলিম্পিকে তিনি নির্বাচিত হয়ে যোগদান করেছিলেন। স্বামীর গলফ খেলায় আগ্রহ সম্বন্ধে তার কোন আগ্রহ যদি না থাকত তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে একাকী হয়ে জীবন কাটাতে হত। এডগার ওয়ালেস ছিলেন একজন অতি প্রসিদ্ধ আর নামী রহস্য কাহিনী লেখক। তিনি কঠোর পরিশ্রমীও ছিলেন। গাড়ি চালানো প্রতিযোগিতায় তার প্রচুর আনন্দ হত। মিসেস ওয়ালেসের কিন্তু এই প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল না। কিন্তু তিনি জানতেন এই প্রতিযোগিতায় তার স্বামীকে সাহায্য করা উচিত। সুতরাং তিনি তার স্বামীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তাকে উৎসাহিত করতে চাইতেন।

যে সব স্ত্রী স্বামীদের অলস আর অবনত মুহূর্তকে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারেন, তারা নিজেরা কখনও অবহেলার শিকার হন না এটা প্রমাণিত সত্য। কাউকে যদি প্রশ্ন করা যায় আপনার স্বামী কি একা একা কোথাও বেড়াতে অভ্যস্ত? যদি এর উত্তর ইতিবাচক হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে তিনি পুরুষ আর স্বামী হিসাবে অবশ্যই স্বার্থপর। আবার অন্যভাবেও বলা যায় আপনার কোন ত্রুটি তাকে একাজে উৎসাহ দেয়।

মিসেস ফ্রান্সিস শট, ৫০৮ রোল্যাণ্ড স্ট্রীট, নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। তার বেশ অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ায় তিনি খানিকটা অসুখী ছিলেন। কারণ তার স্বামী বেড়াতে যাওয়ার সময় ইচ্ছেমত পোশাক পরতে চান। তাছাড়াও মিসেস শট চাইতেন স্বামী বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই কাটান। কিন্তু স্বামী তাতে বিরক্ত বোধ করে মা'র কাছে চলে যেতেন। শেষ পর্যন্ত মিসেস শট আর স্বামীর মতের বিরুদ্ধে কিছুই করতেন বা প্রতিবন্ধকতার জন্ম দিতেন না।

মিঃ শট একজন নামী চিক খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি নিজের স্ত্রীকেও চিক খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলেন। মিঃ শট হৈ হল্লা ভালবাসতেন। মিসেস শট তাই ঘরকে চমৎকার করেই সাজিয়ে রাখতেন যাতে তাঁর স্বামী বাইরে কাটানোর সময় লোকজনদের নিয়ে ঘরে সময় কাটাতে পারেন। এই কৌশলে বেশ কাজও হয়। শট দম্পতির চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনে মিঃ শট তার পুরনো দিনের বেদনা ভুলে গেলেন এরপর। তিনি বিনোদনের জন্য ঘরমুখো হয়ে পড়েন। এরপর অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে মিসেস শট চেষ্টা করেও স্বামীকে বাইরে পাঠাতে পারতেন না। মিসেস শট মনে করেন, 'একজন স্ত্রীর কর্তব্য হওয়া উচিত স্বামীকে সুখী করা আর আমি সেটা করার চেষ্টা করেছি।' একথা বলাই বাহুল্য মিসেস শট তার নিজের প্রচেষ্টা দিয়ে স্বামীর অন্যতম সঙ্গিনী আর পরিচালিকা হয়ে ওঠেন। তবে আপনিও এই অবস্থায় স্বামীর সুখ দুঃখের ভাগীদার হয়ে ওঠার চেষ্টা করুন না কেন? দুজনে সমব্যথী আর সমদর্শী হতে পারলে দাম্পত্য জীবনের বহু সমস্যারই সমাধান হতে দেরী হবে না।

॥ চব্বিশ ॥

স্বামীকে উৎসাহিত করুন

একজনকে কোন ভাবে সহযোগিতা করে চলার অর্থই হল তাকে আসলে সুখী করা। এই জন্য স্বামীর যে সব ব্যক্তিগত ইচ্ছা থাকে তাকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা আপনাকেই স্ত্রী হিসেবে করতে হবে। তাকে অনুপ্রাণিত করা আপনারই কাজ। অ্যাণ্ডে মাওরিচ তার 'দি আর্ট অব ম্যারেজ' বইতে বলেন, 'কোন বিবাহিত মানুষ সুখী হতে পারে না যদি না সেই আনন্দে দুজনেরই সমান ভাগ থাকে। এটা কখনই সম্ভব নয় যে দুজন মানুষের ধ্যান ধারণা, মনোভাব সবই একই রকম হবে।' তাই স্বামী যে ধরণের বাসনা মনে মনে পোষণ করেন তাকে তাই করতে দিন। ওই কাজটি আপনার অপছন্দ হলেও কিন্তু করতে দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে কোন রকম ঈর্ষা পোষণ করবেন না। তাহলে বুঝতে হবে স্বামীকে মুগ্ধ বা বশীভূত করতে আপনি ব্যর্থ।

উইলিয়াম রজার্স-এর আত্মজীবনী লেখক হোমার ক্যালিফোর্নিয়ায় রজার্সের সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়ে ছিলেন। এটা ঘটে উইলিয়ামের বনভূমিতে লেখক যখন উইলিয়ামের জন্য একটা চলচ্চিত্র অনুলিপি তৈরী করতে যান। উইলিয়ামের ওই সময় ইচ্ছা ছিল তার নিজস্ব একটা ক্যাসেট থাকে, অথচ ব্যাপারটা সে সময় একটু কঠিনই ছিল। মিসেস রজার্স ব্যাপারটায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি জানতেন স্বামীকে তার উৎসাহিত করা উচিত। তাই তিনি নিজেই শহর থেকে স্বামীর জন্য ওই ক্যাসেট নিয়ে এসেছিলেন। বড়দিনের সময় এই উপহার পাওয়ায় উইলিয়াম শিশুর মত খুশি হয়ে উঠেছিলেন।

উইলিয়াম যখন তার 'বন' সংক্রান্ত কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়তেন তিনি ওই ক্যাসেট সহ বনে গিয়ে কাজে মশগুল হতেন আর পাগলের মতই কাজ করতেন। এইভাবে অনেকক্ষণ কাজ করার ফলে

আনন্দ অনুভব হতে থাকত তার আর সমস্ত সমস্যারও সমাধান হয়ে যেত। মিঃ রজার্সের দৈহিক এবং মানসিক ক্লান্তি এইভাবেই দূর হত।

একথা খুবই সত্যি যে কোন লোককে শখ বশতঃ তার দৈহিক ও মানসিক শান্তি পাওয়ার সুযোগ সব সময়েই দেওয়া চাই। সেই কাজটি থেকে লোকটিই যে কেবল উপকৃত হন তা মোটেই নয়, তার পরিবারের সকলে, যেমন, স্ত্রী ছেলেমেয়েরাও সমান উপকৃত হয় ও অংশীদার হয়।

একটা উদাহরণ রাখতে চাই এখানে। এটা আমার মামাতো বোনের কথা। তার নাম জেম্‌স হ্যারিস। সে থাকত আমেরিকার ওকলাহোমায়। তার বিয়ে হয় এক তেল কোম্পানীর ফিল্ড ডিরেক্টরের সঙ্গে। জিম হ্যারিস তার অবসর সময়ে আসবাবপত্র সংস্কার করতে ভালবাসত। তার স্ত্রী এর ফলে স্বামীর চমৎকার হাতের কাজ দেখে খুবই আনন্দ পেত। এইভাবেই ওদের সংসার আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছিল।

যে সব স্ত্রীরা স্বামীদের বিভিন্ন শখে বা ইচ্ছাতে উৎসাহ দেন— তাদের স্বামীরা নিঃসন্দেহে স্ত্রীর অনুরক্ত থাকেন। মনস্তাত্ত্বিকদের মত হল কোন মানুষ যদি তাতে বেশি রকম কাজের বদলে শখের দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে কোথাও কোন গোলমাল রয়েছে। এই গোলমালের মূল খুঁজে বের করা দরকার আর এটা করার পরেই তাকে কাজে আগ্রহী করে তোলা সম্ভব হবেই। কারণ শখ কোন কাজ নয়, বরং শখের সাহায্যে মূল কাজের আনন্দের রসদ সংগ্রহ করা হয়। শখ হল, বলা যায়, এক ধরণের আরোগ্য পদ্ধতি। এর একটি নাটকীয় আর চমৎকার উদাহরণ এখানে আপনাদের শোনাব। মিঃ ও মিসেস ক্লার্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীদের বেশ কাছাকাছি ছিলেন। মিঃ ক্লার্ক ছিলেন সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য। তিনি ও তার স্ত্রী বৃটিশ ও আমেরিকানদের সঙ্গে প্রচুর দুঃখ ভোগ করেন। তিনি এরপর 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটরের' এক প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎকারে বলেন একজন মানুষ গৃহচ্যুত বা কর্মচ্যুত হতে পারে কিন্তু তার যদি

উৎসাহ থাকে তাহলে এমন কিছু বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় যাকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না। যেমন সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদিতে আকর্ষণ।

মিসেস ক্লার্ক ছিলেন চীনা বয়ন বিভাগের একজন কর্মী। জাপানী-দের হাতে তারা সকলেই বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তিনি অন্যান্য সব সহ-বন্দীদের কাছে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা শোনাতেন, বক্তৃতা করতেন—এতে বন্দীরা তাদের সাময়িক দুঃখ ভুলে আনন্দ লাভ করত। মিঃ ক্লার্ক ছিলেন সঙ্গীতবিদ্। যুদ্ধের সময় তিনি তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। মিসেস ক্লার্ক জাপানী কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বন্দীদের সামনে বন্দী শিবিরে একটা গানের 'কোরাস্' সঙ্ঘ গড়ে তোলেন। ওই দলটি বড়দিনের সময় বড়দিনের ব্যারল, নাচগান ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করে বন্দীদের আনন্দ দান করত।

এর সবই সম্ভব হয়েছিল মাত্র একটা কারণে। মিঃ ক্লার্ক কর্তৃপক্ষকে শখের দাম বোঝাতে পেরেছিলেন বলেই। তাঁর মত হল প্রত্যেকটি মানুষেরই কোন না কোন শখ থাকা একান্ত দরকার। কারণ এই শখ মানুষকে অবসর মুহূর্তগুলো আনন্দে পূর্ণ করে তোলে। এই জন্যই প্রশ্ন করা যায় আপনি একজন স্ত্রী হিসেবে কেন মিঃ ক্লার্কের মতই সৌখীন হতে উৎসাহিত করতে চাইবেন না? এই সব মানুষ শখকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয় বলেই ভাবতে চান না, কারণ এই শখ অন্যেরও আনন্দের কারণ হয়। একজন অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত যুবক আমাকে বলেছেন যে সে এমন একজন স্ত্রী চায় যে স্ত্রী তাকে সঙ্গ দেবে আর সামনের দিকেই ঠেলবে পিছনে টানবে না। এটা ঠিক, গৃহবধূরা স্বভাবত বেশির ভাগ সময় বাড়িতে একাই কাটান। এজন্য তারা আবার শখ থাকা পুরুষদের অযথা ভুল বোঝে। মেয়েরা আবার একা থাকলে তাদের আত্মার স্বাধীনতাও পায়।

কিছু পুরুষ স্বামী হিসেবে বিচিত্র স্বভাবের মানুষ হয়ে থাকে। তাদের দেখা গেছে রাতের বেলায় ছেলেদের সঙ্গে খেলে বা মাছ ধরে কাটাতে ভালবাসে। আবার কেউ কেউ আছেন যারা পারলেই গোয়েন্দা কাহিনীতে ডুবে থেকে সময় কাটাতে চান। স্বামীরা তাদের

আনন্দময় অবসর সময় ধরা যায় একাকীই কাটান। স্ত্রীরা আর নিপুণ গৃহিণীরা ব্যাপারটা একটু লক্ষ্য করবেন। আমি আমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে আমার স্বামী প্রত্যেকটি রবিবাব তার বৃদ্ধ বন্ধু হোমারের সঙ্গেই কাটিয়েছেন। আমরা শুধু ছুটিব অন্যান্য দিন একসঙ্গে কাটাতাম। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম আমি রবিবার বিকেলটা একাকী কাটাব। আমার স্বামী আর তার বন্ধু হোমার বন্ধের দিনগুলোয় বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। তখন তার চালচলন হয়ে উঠত বাচ্চা ছেলেদের মত—ইচ্ছে মত বরফ খাওয়া, লাফমারা এই সব। তারপর অবশ্য তারা নিজেদেব স্ত্রীদের কাছে ফিরে না এসে পারত না বলাই বাহুল্য।

স্বামীরা আসলে আনুষ্ঠানিক কাজ কর্মের বিরোধী হয়ে থাকে। যদি স্ত্রী হিসেবে আমরা তাদের শখের জন্য কিছু সময় দিই, দরকার মত স্বাধীনতাও দিই, তাহলে একথা নিঃসন্দেহে ঠিক যে তাদের ঢের বেশি রকম আনন্দিত আর খুশি দেখতে পাব।

একথা মনে রাখা দরকার যে একজন সুখী মানুষ একজন হতাশাগ্রস্ত মানুষের চেয়ে হাজার গুণ বেশি কর্মক্ষম।

॥ পঁচিশ ॥

সমস্ত কাজে উৎসাহী হয়ে উঠুন

একজন উত্তম সহধর্মিনী হওয়ার তৃতীয় পদ্ধতি হল এই যে শুধুমাত্র দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজে নিবিষ্ট না থেকে বিভিন্ন রকম কাজে অংশ গ্রহণ করা। পুরুষের যেমন কিছু সময় চিত্তবিনোদনেব পর আবার কাজে মন দিলে সে কাজে দারুণ উৎসাহ আর প্রেরণা পাওয়া সম্ভব হয়, তেমনই আবার মেয়েদের ক্ষেত্রেও কিছু সময় চিত্তবিনোদনে অতিবাহিত করা উচিত। এক্ষেত্রে পুরুষ আর মহিলাদের মধ্যে কোন রকম সীমারেখা থাকা অযৌক্তিক। এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখা উচিত। এর কারণ একটাই—এক নাগাড়ে দীর্ঘকাল কাজ করে

চললে অবসাদ আসতে পারে। নিয়ম মাফিক কাজকর্ম থেকে কিছুক্ষণ দূরে থাকলে আর তারপর কাজে মন ঢাললে শুধু যে নতুন উদ্যমের সঙ্গে শুরু করা যায় তাই নয়, প্রতিটি কাজই তাতে সুষ্ঠু আর নিঁখুত ভাবেই শেষ করা যায়।

মনে রাখবেন শুধু অত্যধিক কাজের চাপ বা দায়িত্বভার বেশি হলেই আমরা ক্লান্ত হই না। আসলে কাজের একঘেয়েমি আর বৈচিত্র্যহীনতাই আমাদের অবসাদগ্রস্ত করে তোলে। বহু মানুষকে দেখা যায় যে তারা জীবিকার উদ্দেশ্যে এমন কঠোর পরিশ্রম অবলীলায় করে চলেন যে মনে হয় প্রায় খেলা করছেন। আসল ব্যাপার হল এই যে, কাজকর্মে বৈচিত্র্য এলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সতেজ, প্রফুল্ল আর উদ্যোগী হয়ে ওঠে। গৃহিণীদের কাজের ধরণটাই এমন যে তাদের বাধ্য হয়েই একঘেয়ে কাজে একাকীত্ব ভোগ করে চলতে হয়। এই ধরণের একই কাজে আবদ্ধ হয়ে থাকার পরিণতিতে তাদের কাছে ব্যাপারটা খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে। এটা দেহ আর মনের উপর স্বভাবতই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। অবসর সময়ে বিভিন্ন রকম কাজে অংশগ্রহণ করলে একাধিক মানুষেব সাহচর্যও পাওয়া যায় তাতে আখেরে লাভ হয়।

নিঃসঙ্গতার অবসাদ থেকে বাঁচতে হলে এই ধরণের নানা কাজে অংশ নেওয়া ভারি চমৎকার ফলদায়ক অভ্যাস। এর মধ্যে ক্রেতা প্রশিক্ষণ পাঠমালা, সঙ্গীত শিক্ষার আসর বা প্রতি সপ্তাহে কোন সেবা-মূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠানে কিছু সময় কাজ করলে যে কোন মহিলাই তার চিত্ত বিনোদনের সুন্দর সুযোগ পাবেন নিঃসন্দেহে। এতে কেবল যে চিত্ত বিনোদনই হবে তাই না, তার জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিধি দারুণ ভাবে বেড়েও যাবে। এর ফলে তার ব্যক্তিত্ব চমৎকার আর প্রখর হয়ে ওঠে। টেক্সাসের সান অ্যান্টিনিয়োর অধিবাসী মিসেস ওয়াল্টার জি. ফ্রাংকবিনাব তার ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়শুনা আরম্ভ করার পর অবসর কাটানোর উদ্দেশ্যে রবিবার এবং সমস্ত ছুটির দিন সেন্ট লুইস গির্জার স্কুলে যোগদান করেন। তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ নেন। তিনি

উপলব্ধি করেন যে শিশুদের সঙ্গে তিনি চমৎকার মানিয়ে নিতে পারেন। আর এই কারণেই তিনি সেন্ট লুইসের দিবা বিভাগের কিণ্ডার গার্টেন বিভাগের দায়িত্ব নেন শিক্ষয়িত্রী হিসেবে। এই প্রসঙ্গে নিজের সম্পর্কে মিসের ফ্রাংকবিনার লিখেছেন : 'এই কাজটি তার জন্য ভারি চমৎকার ফলশ্রুতি বয়ে এনেছিল। এর আগে, প্রত্যেকটি কাজ, তা যত সামান্যই হোক আমার কাছে বিতৃষ্ণা আর ক্লান্তিই বয়ে আনত। এখন আমার কর্মক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। বর্তমানে আমি প্রতিদিন ভোরে আগের তুলনায় একঘণ্টা আগে শয্যাত্যাগ করি, ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর আগে সংসারের কিছু কাজ শেষ করে রাখি। তারপর আমি নিজেই স্কুলের দিকে রওয়ানা হই। আমি স্কাউট কাব্রদের ডেন মাদার। বুধবার রাত্তিরে আমার স্বামী কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গে করে বেড়াতে বের হন, তাছাড়া আবার মঙ্গলবার বিকেলে গির্জায় নির্দিষ্ট কারো কারো সঙ্গে নানা আলোচনায় অংশ নেন।

এই আলোচনায় অংশ গ্রহণের ফলে আমার মনের আর আধ্যাত্মিক ভাবনার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব একটা উন্নতি লক্ষ্য করি। বাইরের ওই সব কাজকর্ম করার পর বাড়িতে ফিরে এসে খাবার টেবিলে সবাই একসঙ্গে বসলে কি যে আনন্দ উপভোগ করে চলি তা ভাষায় বোঝানো যায় না। এটা আমার কাছে ঢের আনন্দদায়ক। সারাদিনের মধ্যে পরিবারের সকলে একসঙ্গে মিলিত হওয়ার এটাই সবার বড় পরিসর। সকলে মিলে বসে একসঙ্গে খাওয়ার ফাঁকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হতে থাকে আর তার ফলে খুবই তৃপ্তি পেতে থাকি। একবার আমি একজন মানসিক রোগীর কথা পড়েছিলাম। তার খাওয়ায় কোন রকম রুচি ছিল না, খাবার মুখে তুললেই সে তা থু থু করে ফেলে দিত। এর কারণ আবিষ্কার করা গেলে জানতে পারি যে ছোটবেলায় খাওয়ার টেবিলে তার মা প্রায় রোজ কুরুক্ষেত্র বাধাতেন। স্বামীর সঙ্গে তার রোজ টাকা কড়ি, সংসার ইত্যাদি নিয়ে গোলমাল চলত। আমরা তাই নিয়ম তৈরি করে নিয়েছিলাম খাওয়ার টেবিলে কোন ভাবেই আমরা কোন অপ্রীতিকর বিষয় নিয়ে আলোচনা করব

না। আমরা তাই একমাত্র আনন্দদায়ক বিষয় নিয়েই আলোচনা করি। খাওয়ার টেবিলে বসে আমরা সারাদিনের যত মজাদার ঘটনা ইত্যাদি বিষয় নিয়েই আলাপ আলোচনা গল্প গুজবে মত্ত হই। অবসর সময়ে বিভিন্ন কাজকর্মে যোগদান শুরু করার পর থেকে আমি এই আলাপ আলোচনায় যেন অভিনবত্ব খুঁজে পাই।

'বাইরের কাজ কর্মগুলো আমার মূল্যবোধেরও উন্নতির বিকাশ ঘটিয়েছে। আগে যে সব নগন্য ব্যাপারে আমার রাগ হতে চাইত, বর্তমানে নগণ্য বলে সেগুলোর প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়ে আমাদের ঘরকে কিভাবে সকলেব জন্য প্রেম ও শান্তির সুখের স্বর্গে পরিণত করা যায় সেই ধবণের অপেক্ষাকৃত বড় ধরণের চিন্তায় মনেনিবেশ করতে পারি।' গৃহস্থালীর কাজের বাইরে অবসর যাপনের জন্য সুনির্বাচিত অবলম্বনগুলি যদি মিসেস ফ্রাংকবিনারের নানা রকম কল্যাণ সাধন করে থাকতে পারে তাহলে ওই রকম কোন ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করলে নিশ্চয়ই আপনি আর আমিও সমান উপকার পেতে পারি:

কোন্ ধরণের কাজ আপনার উপযুক্ত সেটা আসলে নির্ভর করে আপনার প্রতিভা অথবা প্রতিভার বিশেষ দিক আর অভিরুচির উপর। নিজের মনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখবেন। আপনি সবসময় যা উপভোগ করেছেন বা উপভোগ করতে চেয়েছেন সেই সম্পর্কে চিন্তা করুন। মনে রাখবেন এতে কিন্তু আপনার কোনরকম অর্থ ব্যয়ের প্রশ্নই নেই। নিজের সমাজের দিকেও একবার তাকিয়ে দেখুন, আপনি নিশ্চয়ই তাহলে আশ্চর্য হয়ে দেখবেন যে ক্ষুদ্রতম শহরটাতেও বিনোদনেব জন্য কতই না গ্রহণযোগ্য উপজীব্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আপনি যা খুঁজছেন তা যদি হাতের সামনে না পান তাহলে কাজে নেমে পড়ুন। ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারি নিউইয়র্ক শহরে শেকসপীয়ার ক্লাবে যোগদান করে আমি প্রচুর প্রশান্তি আর আনন্দ পেয়েছিলাম। এই ক্লাবকে আমি বরাবর পছন্দ করে এসেছি। সেখানে এই ধরণের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। চারশ বছরের প্রাচীন পৃথিবীতে পদচারণা করতে গিয়ে আমি আমার বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর

সমস্যাকে নতুন পরিপ্রেক্ষিতেই দেখার সুযোগ পেতাম। এ ছাড়া এই ক্লাবে যোগদান করার পর আমার স্বামীর সঙ্গে বাজারের মাছ মাংসের দাম সম্পর্কে আলোচনা করা ছাড়াও আরও অনেক কিছু আলোচনার জন্য থাকত। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন সম্পর্কে আমার স্বামীর উৎসাহ অপরিসীম। অন্যদিকে আবার সে শেকসপীয়ারেরও বড় ভক্ত। আমরা একে অপরের কাছ থেকে নিজের নিজের 'মানসিকতা' সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা আর সমালোচনা করেছি, আমরা নানা ধরণের যুক্তি তর্কেরও অবতারণা করি। এছাড়া নানা রকম রঙ্গ তামাশাতেও আমরা সময় কাটাই।'

এটা খুবই সত্যি যে বিয়ের ফলে নরনারী এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে যে সব কিছুই একসঙ্গে করার একটা চমৎকার মানসিকতা গড়ে ওঠে। একটা ভিন্ন দিক বা প্রবৃত্তি বৈচিত্র্যের অবকাশ ঘটায় আর বিবাহিত জীবনকে স্বাভাবিক এবং সজীব রাখতে সহায়তা করে।

আপনারা যদি মনে করেন যে আপনাদের বিবাহিত জীবনের কোথাও কোন রকম অসঙ্গতি রয়ে গেছে তাহলে আপনাদের জীবনের নানা দিক ভাল করে বিচার করে দেখুন, পরীক্ষা করুন। অনুধাবণ করতে চেষ্টা করুন আপনি আপনার স্বামীর যথাযোগ্য বা উপযুক্ত সহধর্মিণী বা জীবনসাথী হয়ে উঠতে পেরেছেন কি না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের সূত্র

এই কটি নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করুন:

১। সব সময় মনে আনন্দ রাখুন।

২। আপনি আপনার স্বামীর কিছু কিছু খেয়াল বা অভিরুচির শরিক হয়ে উঠন।

৩। আপনার স্বামীকে তার নিজস্ব শখ মেটাতে দিন আর এ জন্য তাকে কিছু সময় একা থাকতে দিন।

৪। স্ত্রী হিসেবে আপনিও বাইরের কাজের শরিক হোন।

সপ্তম অধ্যায়

॥ ছাব্বিশ ॥

কিভাবে স্বপ্নের নীড় গড়বেন

বহু বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে সুখী গৃহ, স্বপ্নের নীড় রচনার জন্য মহিলারা আজকাল শ্রদ্ধাভাজন হন না। আমরা স্ত্রী হিসাবে যত যত্নের সঙ্গেই নারী জীবনের এই প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পাদন করার চেষ্টাই করি না কেন, আমাদের উদ্যোগ আর দায়িত্ব পালনের প্রতি সামাজিকভাবে একেবারেই কোন রকম গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তার ফলে যা হওয়ার তাই হয়, মহিলারা যেন অসহায় আর আহত বোধ করেন। কোন মহিলা যখন নিজেকে গৃহবধূ বলে পরিচয় দিতে যান তার গলায় যেন ক্ষমা প্রার্থনার সুর বেজে ওঠে। কথাটা ভাল করে একবার ভেবে দেখুন তো। ওই মারাত্মক আপ্তবাক্যটার কথাই ভাবুন। সেই আপ্তবাক্য যার মধ্য দিয়ে মহিলারা নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেন সেটা কি আপনারা কখনও শুনেছেন? সেটা একবার শুনলে, মনে করে দেখুন, আপনিও আমার মত জ্বলে ওঠেন কি না। সৃষ্টির সময় শিশু সন্তানদের মানুষ করা, আর কোন গৃহের পরিচর্যা করার মত এত বেশি সম্মানজনক, এত অর্থবহ যে ব্যক্তি বা সমাজের কাছে সেটা এতই গুরুত্বপূর্ণ তেমন কাজ আর সেই বলেই ভাবা হত। তাই বলা হয় যে মহিলা স্ত্রীর ভূমিকা পালন করার মধ্য দিয়ে গৃহস্থালীর কাজ সম্পন্ন আর পরিবারের লোকজনের পরিচর্যার জন্য তার সমস্ত সময় আর কর্মশক্তি ব্যয় করেন তার গর্বই বোধ করা উচিত। প্রতিনিয়ত তাকে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় তার জন্য কোন পেশাদার অভিযানের চেয়ে দরকার হয় অনেক বেশি মেধা আর বহুমুখী নজর। একবার ভেবে দেখুন কোন সংসারে কর্ত্রীকে কত বিভিন্ন ধরণেরই না কাজ করতে হয়।

কোন গৃহকর্ত্রীর জীবন কাটানো লক্ষ্য করুন, অবাক না হয়ে পারবেন না। কোন বিশেষ একজন গৃহবধূর জীবনের দিকে তাকান, তাহলে দেখতে পাবেন তাকে হয়তো বা পোশাক কাচাব কাজ, অর্থাৎ ধোপানীর কাজ, বাবুর্চি, সেবাব্রতা বা নার্স, পরিচারিকা, কেরানী, হিসাব রক্ষক, কেনাকাটা বা পারচেজ এজেন্ট, জনসংযোগ রক্ষাকারিণী, অর্থাৎ অতিথি পরিচর্যা, পার্সোনেল ম্যানেজার, দরকার ঘটলে গাড়ির ড্রাইভার, ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়ার সঙ্গী, পরিবারের প্রশাসন—এমনই হাজারো কাজে তাকে প্রতিনিয়ত যোগ দিতে হয়। তার মানে সোজা কথায় একজন সংসারের কর্ত্রীকে জুতো সেলাই থেকে হেন কাজ নেই যা করতে হয় না। অথচ তার পরিচয় তিনি গৃহবধূ মাত্র! এখানেই শেষ নয়। বেচারি ওই গৃহবধূকে কেবল চালাক আর চটপটে হলেই হয় না, কর্মদক্ষ হলেও না। তাকে আবার হতে হবে সুন্দরী আর মোহময়ী না হলে উপায় নেই। সংসারের হাজারো সব দায়িত্ব পালন করার পর তাকে স্বামীদেবতার মনোরঞ্জনের জন্য শশব্যস্ত হয়ে শারীরি মোহ বিস্তার করা চাই-ই। আমাদের কারোই নিশ্চয় জানা নেই কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তাকে তার অফিস চালানোর জন্য টাইপ করা, খাতালেখা থেকে ঘর ঝাড়ু দেওয়া ইত্যাদি সবকিছু করতে হয় কিনা। অথচ দেখুন কোন গৃহবধূর কাজ অফিসের কর্তাব্যক্তির চেয়ে ঢের ঢের বেশি। ব্যাপারটা অলৌকিক নয়? তাই বলছি স্ত্রী হিসেবে আমরা যে কখনও কখনও কোন কাজে অনভ্যস্ত হয়ে পড়ি তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

আমার মনে হয় আমরা খুবই আনন্দ পেতে পারতাম যদি বছর বছর গৃহকর্ত্রীদের, বিশেষতঃ তরুণী গৃহবধূদের বাৎসরিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত। টাকা পয়সার কথাই ধরা যাক, একজন গৃহবধূ নিশ্চিত করেই বলতে পারে যে সে নামকরা মোহময়ী চলচ্চিত্রাভিনেত্রী, সুন্দরী কোন মোহময়ী, বিখ্যাত সেবিকাদের সম্মিলিত দক্ষতার চেয়ে অনেক বেশি বিচক্ষণ, আর তার দক্ষতাও প্রতিভার অধিকারী।

সংসার গড়ে তোলার ব্যাপারে আপনার ভূমিকা আপনার স্বামীর

সাফল্যের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে বলে ভাবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি 'উওম্যান দি লষ্ট সেক্স' গ্রন্থের রচয়িতা বিখ্যাত ডঃ মারিয়া ফানহ্যাম এর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। তাঁর বক্তব্য হল একজন পুরুষ যা আয় করেন, তার স্ত্রীর বিবেচনা আর কাজের মধ্য দিয়ে এর কার্যকারিতা শতকরা ত্রিশ থেকে প্রায় ষাট ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। সাংসারিক অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে উপার্জিত অর্থ স্ত্রীর মাধ্যমে খরচ হলে সপ্তাহ বা মাস ধরে সংসারে অর্থের কোন অভাবই বোঝা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশ অপ্রত্যাশিতভাবে ভালো রকমই সঞ্চয় হয়ে গেছে।

আমেরিকার বিখ্যাত লাইফ পত্রিকায় 'উওম্যানস্ ডিলেমা' শীর্ষক কোন একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে একজন পুরুষ তার ঘরে স্ত্রীর কাছ থেকে যে সেবা যত্ন আর সহযোগিতা পেয়ে থাকেন তার জন্য তিনি যদি নগদ অর্থ ব্যয় করতেন তাহলে তাকে খরচ করতে হত বছরে কম করেও প্রায় ৬০ হাজার মার্কিন ডলার। এই তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৬ই জুন তারিখে।

অনেক বিখ্যাত লোকের জীবনে অগ্রগতি আর খ্যাতির মূল হয়েছেন তাদের স্ত্রীরা। এই সব মহিলারা অবলা গৃহবধূদের জীবনধারাকে নতুন অর্থ আর গৌরবে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় এমনই একজন মহিলা কথা। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোয়াইষ্ট ডি. আইসেনহাওয়ারের স্ত্রী। 'টুডেজ উইমেন' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে মিসেস আইসেনহাওয়ার গৃহবধূ হিসাবে তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গী আর অনুভূতির এক চমৎকার বর্ণনা করেছেন। তাঁর অভিমত হল এই যে, একজন মহিলার জীবনে যা কিছু দেয় তার মধ্যে সব চেয়ে সেরা বস্তু হল কোন গৃহবধূর জীবনের গৌরবময় ভূমিকা। তিনি বলেন শিশুদের ময়লা মোজা ধোয়া আর লণ্ড্রীর কাপড়ের হিসাব রাখা হয়তো বিরক্তি বলে মনে হতে পারে। গৃহস্থালীর এমন অসংখ্য কাজ গৎ বাঁধা আর অকিঞ্চিৎকর এবং নিরর্থক মনে হতে পারে। বিশেষতঃ স্বামী বাইরের থেকে ঘরে ফিরে এলে

শুধু খবরাখবর ইত্যাদি শোনাতে থাকেন আর হয়তো প্রশ্নও করেন 'সারাদিন কিভাবে কাটালে ?'

এর উত্তরে যখন জানাতে যাবেন তখন শুধু মাত্র বাড়িব গ্যাসের বিলের টাকা মিটিয়ে দেবার কথাটাই বলবেন। কেননা সারাদিন ধরে আপনি যে সব কাজ কর্ম করেছেন তা আপনার কাছে হয়তো বলার মত মনে নাও হতে পারে। এই বকম পরিস্থিতিতে এ ধরণের কাজ প্রকৃতই কাম্য হতে পারে যা আপনাকে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা বা বাড়তি অর্থ উপার্জনেরও সুযোগ এনে দিতে পারে। অথচ এটা অত্যন্ত বিবেচনা প্রসূত আর আপনার মহত্ত্বেরই পরিচয় যে বাড়তি লোভ ত্যাগ করে একজন স্ত্রী হিসেবে আপনি সংসারের কাজ করাকেই ঢের বেশি প্রয়োজন বলেই ভাবেন। এটাই আপনার সংসারকে আনন্দময় করে তোলে তাতে সন্দেহ নেই। এর মধ্য দিয়ে একজন স্ত্রী অনায়াসেই পেতে পারেন নিবিড় এক প্রশান্তি আর রামধনুর স্পর্শ।

মিসেস আইসেনহাওয়ার আরও লেখেন যে, 'আমার যদি সবে মাত্র আজই বিয়ে হত তাহলেও অতীতের দিনগুলোয় যা করেছি তাই করে চলতাম। আমি শুধু এগিয়ে যেতাম আর স্বামীর সামান্য আয় হলেও তার উপর নির্ভর করে পরিবারকে টিঁকিয়ে রাখতাম, বন্ধুত্ব গড়ে তুলতাম আর লক্ষ্য রাখতাম যাতে আমার স্বামী প্রতিদিনই টাটকা প্রাতরাশের পর নিয়ম মত কাজে বেরোতে পারছেন কি না। এছাড়াও তার উচ্চাশা আর অভিলাষ পূরণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও চালাতাম। প্রকৃতপক্ষে এটাই আমার দায়িত্ব আর সত্যিকার আনন্দের উৎস। আমি সব সময় আমার দিক থেকে আমার প্রিয় আইকের জন্য এক সুখী আর সমৃদ্ধ কর্মময় চমৎকার গৃহাঙ্গন রচনা করতে চেষ্টা করেছি।'

একজন অবলা গৃহবধূ হিসেবে মিসেস আইসেনহাওয়ার নিশ্চয়ই খারাপ কাজ করেন নি—তিনি তাঁর স্বামীকে আমেরিকার গর্ব বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় প্রাসাদ হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছেন। তাঁরই সহায়তায় তিনি হন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

॥ সাতাশ ॥

ঘরের টান একান্তই মধুর

সারাদিন হাড ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর আপনার স্বামী কি ধরণের পরিবেশে ফিরে আসেন বলুন তো? কোন্ ধরণের পারিবারিক পরিবেশ আপনার স্বামীকে সাংসারিক কাজে প্রেরণা জোগায় আর প্রত্যেকদিন সকালে নতুন উদ্যোগে কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে করতে সহায়তা করে? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় আপনি যা ভাবছেন তা কিন্তু ঠিক নয়—বরং তার নিজের সাফল্য আর ব্যর্থতার উপরেই সেটা বেশির ভাগ নির্ভর করে।

ডঃ ক্লিফোর্ড আর. অ্যাডাম 'লেডিজ হোম জার্নালে'র বিশেষ কলমে লিখেছিলেন যে কারও ঘর বলতে প্রকৃতপক্ষে যে বিশেষ ছবিটি কারও মনের পর্যায় ফুটে ওঠে তা আপনার উপরেই বিবাহিত জীবনকে কার্যকরী করার মাধ্যমে নির্ভর করে চলে। অবশ্য এক্ষেত্রে স্বামীর অবদান অনেকটা নির্ভর করলেও গৃহিণী হিসেবে আপনার অবদান ও ভূমিকাই হয়ে ওঠে প্রধান। আপনার সৃজনশীল শক্তি কিভাবে কাজের যোগান আর পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারবেন না। মনে রাখবেন, সবার উপরে আপনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন তার উপরেই প্রধানভাবে নির্ভর করতে আপনার গৃহের সুন্দর পরিবেশের সামগ্রিক রূপটি। একজন গৃহস্বামীকে উল্লেখযোগ্য দক্ষতার সঙ্গে সংসারের দায়িত্ব পালন করার জন্য পরিবারের কাছ থেকে তার কিছু মৌলিক চাহিদা পূরণ হওয়া চাই। মনে রাখা উচিত, অবশ্যই সেটা একজন সুগৃহিণী ও স্ত্রী হিসেবে যে এগুলোই হচ্ছে স্বামীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তার সংরক্ষণ ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধির এগুলি হল পূর্ব সর্ত। এই সব পূর্ব সর্ত কি সে কথাই আপনাদের এবারে বলছি।

এগুলি হল :

(১) বিনোদন।

একজন মানুষকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন সে কাজকে যতই পছন্দ করুক, কর্মব্যস্ততার মুখে তার মধ্যে কিছু না কিছু স্নায়বিক

উত্তেজনা দেখা দেবেই। কাজের শেষে ঘরে ফেরার সময় বা পরে তার স্নায়ুর উপর যে চাপ পড়তে চায় তা নিরসন করা সম্ভবপর হলে দেখতে পাবেন তার দেহ আর মন ও অনুভূতির সূক্ষ্মতন্তুতে নতুন নতুন প্রাণের শক্তি জন্ম নেয়। পরের দিন আশ্চর্যজনক ভাবেই তার দেহ মন হয়ে ওঠে সজীব, সতেজ আর কর্মক্ষেত্রে তা আনবে নতুন প্রেরণা।

প্রত্যেক মহিলাই মনে মনে ভাবেন তিনি হয়ে উঠবেন একজন অতি নিপুন গৃহিণী। এ বাসনা থাকে কম বেশি সব মেয়েরই। কাজটা কিন্তু মোটেই কঠিন কিছু নয়। তবে মনে রাখা চাই একজন পুরুষের জন্য এটা তখনই প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে যখন কোন স্ত্রী ভেবে বসেন তিনি একজন আদর্শ গৃহিণী হয়ে উঠবেন। আমার ছোটবেলার একটি কাহিনীর কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসছে। এই ধরণের একজন আদর্শ মহিলা আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। তার ছেলেমেয়েরা ভয়ে নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে আনতে পারত না, পাছে তারা ঘরের জিনিসপত্র ভেঙে ফেলে। ভদ্রমহিলার স্বামী সিগারেটের ধূমপান করতে পারতেন না পাছে পর্দায় দুর্গন্ধ বের হয়। স্বামী বেচারিকে কোন বই বা খবরের কাগজ পড়তে গেলে আবার সব সাবধানে গুছিয়ে রাখতে হত। ব্যাপারটা কিছুটা মানসিক ব্যাধির মতই হয়ে উঠেছিল শেষ পর্যন্ত। ব্যাপরটা এক রকম তাইই। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই ধরণের মানসিক ব্যাধি দুর্লভ বা অসাধারণ কোন কিছু নয়, বরং এমন ব্যাপার অনেকের জীবনেই দেখা যায়। ন্যাশানাল ক্যাথলিক ফ্যামিলি লাইফ কনফারেন্সের বিশতম বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় ডঃ রবার্ট এস. অডেন ওয়াল্ড, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসিক বিভাগের অধ্যক্ষ, মহিলাদের নিখুঁত ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার ইচ্ছাকে 'আমেরিকার দৃষ্টিতে' এক নম্বর বলে উল্লেখ করেছেন। জর্জ কেলি নামের একজন নাট্যকার ''ক্রেগম ওয়াইফ' নামে একটি নাটকের জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই নাটকটির আশ্চর্য জনপ্রিয়তার প্রধান আর অন্যতম কারণ হল এই যে হ্যারিয়েট ক্রেগের মত বহু মহিলাই পৃথিবীতে

আছেন। হারিয়েট ক্রেগ খুবই ঝকঝকে তকতকে ভাবের পরিবার পছন্দ করতেন। তার বেশি কিছু বাতিকও ছিল—যেমন চেয়ারের কুশন উল্টে থাকার দৃশ্য তার সহ্য হতনা। যে সব মানুষ তাদের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতেন তাদের তার পছন্দ হত না বলে অভ্যর্থনাও জানাতেন না। মজার কথা তিনি নিজের স্বামীকেও যেন অনধিকারীর মত ভয় করতেন। কারণ স্বামী সাজানো জিনিস ওলোট পালোট করে ফেলতেন, তাকে ব্যাঘাত করতেন। একটা কথা এক্ষেত্রে হয়তো অনেকেই ভাবতে পারেন—সেটা হল অনেককেই দেখা যায় তারা ঘরের মেঝেয়, মাদুরের উপর খবরের কাগজ, বই ইত্যাদি অনেক সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখেন। এই ধরণের অবস্থা লক্ষ্য করে কোন্ গৃহিণীরই বা মেজাজ খারাপ না হয়? তবে এই সব অপরাধের জন্য স্বামীকে গালাগালি দেওয়ার আগে একবার ভেবে নেওয়া উচিত নিজের ঘরে এটা যদি বা হয়েই থাকে তার জন্য নিজের লঘু কোমল মনটাকে কেন উন্মুক্ত করবেন না। অবসাদ ও উত্তেজনা দমন করার প্রকৃষ্ট উপায় হল সহজভাবে ব্যাপরটা মেনে নেওয়া।

(২) আরাম আর আয়েস

সাধারণতঃ একটা ব্যাপার সব পরিবারেই স্বতঃসিদ্ধ। তাহল ঘর সাজানোর কাজটি অন্যান্য প্রধান কাজের মত গৃহিণীরাই করে থাকেন। সুতরাং ঘর সাজানোর সময় তাদের মনে রাখতে হবে যে সব রকম সাজসজ্জার ভিতরের কথাটি হল অনেক বেশি রকম স্বাচ্ছন্দ্য আর স্বাভাবিক বোধ করা। তাছাড়া স্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম হচ্ছে পুরুষের কর্মক্ষম থাকার জন্য অন্যতম প্রধান প্রয়োজন। চেয়ার, টেবিল, সুন্দর কাপড় জামা নিশ্চয়ই একজন মেয়ের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সুন্দর বইকি। অথচ মজার কথা হল একজন পুরুষের কাছে এসব আবার নেহাত বাজে খরচ। পুরুষদের মজা হল তারা বাইরের কাজ কর্ম শেষ করে বাড়িতে ঢুকেই চাইবেন তার পাইপ আর সিগারেটের ছাইদানটা যেন হাতের কাছে থাকে।

যে কোন স্ত্রীর উচিত কোন পুরুষের সাজানো গোছানো ব্যাপারটা

কোন্ ধরণের হলে ভাল লাগে সেটা একবার যাচাই করে দেখা। কোন অবিবাহিত পুরুষকে একবার ভাল করে লক্ষ্য করে দেখুন তাহলেই আন্দাজ পাবেন। ডাক্তার সুইস মিঃ পার্ক আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। সম্প্রতি তিনি তার অফিসের কামরাটি সাজিয়েছেন। কামরাটা আবার তাঁর বাসভবনেরই এক অংশ। একদিন আমি তার কামরায় গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে লক্ষ্য করে দেখলাম কয়েকজন পুরুষ রোগীকে ডাক্তারের ঘরের চামড়ায় মোড়া টেবিল, সোফা, বিরাট আকারের পিতলের টেবিল আলো, সোজা ভাবে ঝোলানো ছবি, এইসব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি।

আর একজন অবিবাহিত লোকের কথাও আমার মনে পড়ছে। ভদ্রলোকের নাম ওয়াল্টার লিঙ্ক। তিনি আমেরিকার নিউ জার্সির স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর প্রধান ভূতাত্ত্বিক। চাকরির জন্য তাকে দেশের নানা দূর দূরান্তে ভ্রমণ করতে হয়। তার বাড়ির ঘরটিকে অত্যাধুনিকই বলা যায়। চাকরি উপলক্ষ্যে নানা দেশে ভ্রমণ করার সময় তিনি যেখান থেকে যা পেরেছেন তাই সংগ্রহ করে এনে ঘর সাজিয়েছেন। আফ্রিকার কঙ্গোরাজ্যের খোদাই করা কাঠের শিল্প নিদর্শন, জাভা ইত্যাদি প্রাচ্যদেশের হাতির দাঁতের নানা মূল্যবান জিনিস তিনি সংগ্রহ করে এনেছেন। মিঃ লিঙ্কের ঘরখানায় ঢুকলেই মন প্রসন্ন হয়ে যায়—যেন আরাম আর আয়েসেরই আলোয় তা ঝলমল করে। আশ্চর্য হাওয়ার কিছু নেই যে এই মানুষটি এখনও অবিবাহিতই রয়ে গেছেন। মজার ব্যাপারটা হল এই তারা নিজেদের যেরকম আরামে রেখে দিতে পারেন পৃথিবীতে তেমন কম মহিলাই আছেন যারা তাদের এই আরাম আর আয়েস দিতে পারবেন।

আমরা স্ত্রীরা যখন ঘর সাজানো আর সৌন্দর্যের কাজটি করি আমরা কখনই মনে রাখি না যে ঘরের পুরুষটির আরামের জন্য কি কি প্রয়োজন। একবার প্যারী শহরে আমি ছোট ছোট অদ্ভুত কিছু চীনা ছাইদান কিনেছিলাম। আর আমার স্বামী কি করলেন শুনবেন? তাহলে শুনুন, তিনি একটা দোকানে গিয়ে প্রকাণ্ড আকারের কাচের

কয়েকটা জিনিস কিনলেন আর সেগুলো ঘরের টেবিলে সাজিয়ে রাখলেন। উদ্দেশ্য ছিল অতিথিরা এলে ওইগুলোই ব্যবহার করবেন। আসল কথা হল পুরুষরা যা করেন তা যে সব সময়েই খারাপ তা নয়, বরং অনেক সময় সেগুলো চিত্তাকর্ষকও হয়ে ওঠে। মোটেই খারাপ দেখায় না। অন্যদিকে বেচারি আমি! আমার কিনে আনা প্যারীর পাত্র করুণার পাত্রই হয়ে রইল। যদি তাই কখনও দেখেন আপনার স্বামী ঘরের জিনিসপত্র একেবারে লণ্ডভণ্ড ওলোট পালোট করতে আরম্ভ করেছেন, তাহলে নিঃসন্দেহে ধরে নেবেন আপনার গিন্নীপনায় কোথাও বেশ বড় রকম ত্রুটি রয়ে গেছে। আপনার স্বামী কি মেঝেয় খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলতে চান? সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ধরে নেবেন তার কফির টেবিলটা মোটেই পছন্দ হয়নি। তিনি যেখানে সেখানে সিগারেটের ছাই ফেলে ঘরটাকে নোংরা করে আপনাকে দিশাহারা করে ফেলতে চান? তাহলে আপনার কাজ হবে তাকে বড় আকারের ছাইদান এনে দেওয়া। নিজের ঘরখানা তিনি কি নানা সখের জিনিস বিদেশ থেকে আনা সংগ্রহ ইত্যাদিতে ভরে রাখতে নির্দিষ্ট জায়গা ব্যবহার করেন না? সেসব যেখানে সেখানে অন্য সব জিনিসের সঙ্গেই রেখে দেন? তাহলে মনে রাখবেন কোথাও আপনার ত্রুটি আছে। ঘরের মানুষটিকে সুখী করে তুলতে পারাই হচ্ছে তাকে ঘরে আটকে রাখার শ্রেষ্ঠতম কৌশল।

(৩) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা

ব্যস্ততায় ঘেরা সুন্দর কোন একটা ঘরে থাকার চাইতে অধিকাংশ পুরুষই সুব্যবস্থায় ভরা তাঁবুতে থাকাই পছন্দ করেন। সময় মত খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা, সকালের প্রাতরাশ পরিবেশনে দেরী, সেটা শেষ করতে না করতেই মধ্যাহ্ন ভোজের সময় এসে পড়া, অগোছালো বিছানা, ইত্যাদি পুরুষকে ঘরের প্রতি ক্রমশঃই অসুখী করে তোলে। আর এর পরিণতিও অনেক সময় বিস্ময় হয়ে ওঠে—তাদের বাইরের রমণীর দিকে টান দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমার নিজের স্বামীর কথাই এবার বলছি। একদিন কথা প্রসঙ্গে সে আমায় বলেছিল

যে একবার একটি মেয়েকে ও ভালবেসে তার সঙ্গে বাইরে গিয়েছিল কিন্তু মেয়েটি সুন্দরী হলেও তার বাড়িটা ছিল সম্পূর্ণ অগোছালো। মনে হয়েছিল বাড়িটায় সবেমাত্র রুশ বাহিনী যেন মার্চপাস্ট করেছে।

(৪) আনন্দময় পরিবেশ

কোন ঘরের পরিবেশ ভাল কি মন্দ যাই হোক না কেন তার জন্য কিন্তু গৃহিণীরাই দায়ী থাকেন। ঘরে একজন স্ত্রী হিসাবে আপনি যে পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছেন তা আপনার স্বামীর সাংসারিক কাজকর্মকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করবেই। ১৯৫১ সালে 'ফরচুন' নামের সাময়িকপত্রের কোন সমীক্ষায় জানা যায় প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত ভদ্রলোকের জীবন কথা। তার একটা উদ্ধৃতিই সাময়িকপত্রে ছাপা হয়। উদ্ধৃতিতে ছিল : 'কর্মক্ষেত্রে আমরা পুরুষের পরিবেশ রক্ষার কাজটি করি কিন্তু ঘরের চৌহদ্দী এড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার সেটা হারিয়েও বসি।' মহিলা হিসাবে আমরা আমাদের স্বামীদের কোন দেহমন থাকুক চাই না, আবার এটাও চাই না যে তারা তাদের জীবিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকুক। অথচ একই সঙ্গে আমরা কামনা করি যে নিজের এলাকায় তারা উন্নতি করুক আর পারদর্শিতা অর্জন করুক। ঘরের পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ আর মধুর করে তুলতে পারলে তবেই আমাদের কামনা পূর্ণ করা সম্ভবপর হবে।

লস এঞ্জেলেস পারিবারিক জনসংখ্যা ইনসটিটিউটের পরিচালক ডঃ পল পাসিনো মনে করেন যে কোন ঘর হল কর্মজীবনের ঝড় ঝাপটা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশ্রয়স্থল। তিনি বলেন আধুনিক যুগে জীবন হল চড়ুইভাতির মত। সারাদিন কোননা কোন ভাবেই সংগ্রাম করতে হচ্ছে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, সুখের জন্য। যখন ছুটির বাঁশি বাজে পুরুষ চায় ঘরে ফিরে শান্তি, সমন্বয়, কল্যাণ আর প্রেমলীলার নিকেতনে। পুরুষটির মধ্যে লোকে হয়তো নিকৃষ্ট স্বভাব দেখে থাকতে পারে কিন্তু একজনকে রমণীর মত সদগুণগুলোই তাকে আকৃষ্ট করবে। তিনি তার স্বামীর চরিত্রের মহৎ দিকটাই দেখতে পাবেন। তিনি এছাড়াও যা করবেন তা হল সমস্যাগ্রস্ত স্বামীর ভারের সঙ্গে নিজের ভারটাও চাপিয়ে

দিয়ে তাকে বিব্রত করা থেকে নিরত থাকবেন আর কোনভাবেই নতুন কোন সমস্যা সৃষ্টি করবেন না। এছাড়াও স্ত্রী হিসেবে তার কাজ হবে পরম নিষ্ঠায় স্বামীর দৈহিক আর মানসিক শক্তি বাড়িয়ে তোলা এবং তাকে রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব পরম স্নেহে পালন করা। যে স্ত্রীর তার সংসারে এমন মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করতে জানেন ডঃ পাসিনোর মতে তিনিই তার স্বামীর জীবনের শূন্যতা পূরণ করতে পারেন আর গৃহিণী হিসাবে নিজের দায়িত্ব আর ভূমিকার কথাটিও উপলব্ধি করতে পারেন।

৫. একটি অনুভূতি ও নিজের সংসার

নিজস্ব পারিবারিক গৃহ এক অনন্য সুখের আকর। এখানে এক অপূর্ব অনুভূতি—আর সেই চমৎকার অনুভূতি গৃহকর্তাকে দেয় সুখানুভূতির পরশ। গৃহস্বামী এরই সঙ্গে নিজেকে পরিবারের রাজা বলেই যদি ভেবে নেন তাহলে দোষাবহ কিছু থাকে না। কিন্তু নিজের বাড়িতে পরিবারের কর্তাব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর কুশাসনের শিকার হন আর তার হৃদয়হীনতা তাকে ভাবতে শেখায়, তিনি জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছেন তাতেও তাকে দোষ দেয়া যায় না। এর ফলে স্বামীটির মন থেকে সমস্ত শান্তিই বিদায় নেয়। আর এর পরিণতিতে এমন ঘটনাও বিচিত্র নয় যে তিনি সব কিছু থেকে অব্যাহতি পেতে চাইবেন। গৃহস্থালীর কাজ অথবা পরিবারের [illegible] জন্য কিছু প্রয়োজন হলে যেমন, কিছু আসবাবপত্র অথবা ঘর সাজানোর জন্য দরজা জানালার একটা নতুন পর্দা ইত্যাদি এগুলো কেনা [illegible]টার জন্য সব সময় স্বামীর মতামত নি[illegible] [illegible] দায়িত্বে সব কিছু কেনাকাটা করার পর কেবল বিলের টাকা [illegible] জন্যই স্বামীকে বললেন না। মনে রাখবেন আপনার [illegible] ভালবাসার ঝিলিক থাকুক কোন স্বামীই মনে মনে তার তারিফ [illegible] না [illegible] রকম আকর্ষণীয় সোফা না কেনা হলে আপনি [illegible] করবেন না, তবুও স্বামীর কেনা দোলনা চেয়ারটা আপনাকে ভাল [illegible] গ্রহণ করতে হবে। ক্রমশঃ দেখতে পাবেন আপনার স্বামীর রুচিজ্ঞান আপনারই মত প্রখর আর প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছে। এসব ব্যাপারে তার মতামতের গুরুত্ব দিলে সংসার তাকে

আরও আকর্ষণ করতে শুরু করে দেবে তা বলাই বাহুল্য। যদি রান্নাবান্নার কাজে তিনি আপনাকে সাহায্য করতে চান তাহলে রবিবারের রাতের কাজের চাপ তার জন্য কম রাখুন—অবশ্য তাতে আপনাকে হয়তো সামান্য বাড়তি এক পরিশ্রমের ঝুঁকি নিতে হবে। গৃহস্থালীর কাজ আর সমস্যা একজন পুরুষের কাছে আপনার মতই গুরুত্বপূর্ণ—এগুলোকে আপনি যেমন বড় করে দেখতে অভ্যস্ত আপনার স্বামীও তাই। তাকে তাই অনুভব করতে দিন যে তিনি ছাড়া সব অসম্পূর্ণ। আমি একজন তরুণী স্ত্রীকে জানি অল্প খরচে বাড়ি ঘর চমৎকারভাবে সাজিয়ে তুলতে যার জুড়ি মেলে না। কোথায় কোন্ রঙটি মানান সই, কোন্ নকসার পর্দা কোন্ দরজায় টাঙানো উচিত এই সব বিষয়ে তার রুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না। যে লোকটির সঙ্গে ওর বিয়ে হয় তিনি চমৎকার একজন ভদ্রলোক। তিনি সব সময়ে পাইপ টানেন। মহিলাটির সূক্ষ্ম রুচি রচনার মধ্যে তিনি সমাজতন্ত্রী কর্মী ইউনিয়ন লীগে যে রকম স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন বাড়িতেও সেই রকমই বোধ করেন। তিনি তার স্ত্রীকে গভীরভাবেই ভালবাসেন। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যখন মাছ শিকারের আনন্দে মেতে ওঠেন তখন তার বিশালত্ব বেশ বোঝা যায়। তার মনের বিশালত্বের জন্য কিন্তু তার স্ত্রীর ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

ঘর অর্থাৎ সংসার সম্বন্ধে অবশ্য বেশি আলোচনা আর না করলেও চলবে। এখন আমরা আসল লক্ষ্য থেকে দূরে চলে যেতে পারি। একটা কথাই শুধু মনে দরকার, আর তা হল সমস্ত পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হল গৃহকে সুন্দর আর নিরাপদ করে তোলা। স্বামীকে সুখী করতে হলে যা কিছু করা দরকার তা হল তাই (১) গৃহ বা সংসারকে চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রে পরিণত করুন। (২) সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা করুন। (৩) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর নিয়ম রক্ষা করুন। (৪) সংসারকে ঝগড়া বিবাদবিহীন শান্তির নীড় করে তুলুন। (৫) দুজনের মিলিত স্পর্শেই সংসারকে আনন্দময় করুন।

॥ আঠাশ ॥

সময় অপচয় করবেন না

সারাদিন রাতের মোট পরিধি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা, তাই না? তাহলে এই অল্প সময়ে বিশ্বের একজন ব্যস্ততম মহিলা কিভাবে নানা কাজ সম্পন্ন করতে পারেন! আমেরিকার বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের স্ত্রী মিসেস রুজভেল্টকে কেউ কর্মবিমুখ বা অলস অপবাদ দিতে পারেনি। লেখাপড়া করা আর নানা রকম কাজ, তারই সঙ্গে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করার জন্য তৎপরতা চালানো এই সব কাজের মধ্যেই তিনি অহরহ ডুবে থাকতেন। তার বয়সের তুলনায় মাত্র অর্ধেক বয়স হয়েছে এমন তরুণীরাও কিন্তু একসঙ্গে এত কাজ করতে গিয়ে ভয়ানক হতাশ হয়ে পড়ত। অথচ মিসেস রুজভেল্ট সাবলীল গতিতে নিজের কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করে চলতেন। কখনই তার সময়ের অভাব হয়েছে এমন কথা শোনা যায়নি। একদিন নিউইয়র্কে আমি তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। সেই সময় তিনি ডিমোক্রেটিক দলের এক সভায় যোগ দেওয়ার জন্য বের হচ্ছিলেন। যাই হোক তাকে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি এত কাজ করেন, তা সত্ত্বেও আপনার কোন সময়ের অভাব হয় না কেন?' তিনি হেসে জবাব দেন, 'আমি কখনও সময়ের অপচয় করি না।' তিনি এরপর সময় সঙ্কুলান কিভাবে হয় সে সম্পর্কে চমৎকার ব্যাখ্যাও দিলেন। তিনি বললেন লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আর নানা সভা সমিতিতে যোগদান করার মাঝখানের সময় তিনি খবরের কাগজের জন্য প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেন আর ঘুম থেকে ওঠেন কাকডাকা ভোরে।

আমরা সবাই মিসেস রুজভেল্টেরই মত চব্বিশ ঘণ্টা হাতে পাই। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল আমরা সকলেই কেবল বলি সময় নেই। সময়ের অভাবে আমরা বই পড়তে পারি না, আত্মউন্নয়ন শিক্ষা পদ্ধতিতে যোগদান করতে পারি না, ছেলেমেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যেতে সময় পাই না। নিজের আর সংসারের কাজে লাগে এমন

অনেক কিছুই আমরা করতে পারি না। কিন্তু কেন পারি না? এর সোজা উত্তর হল: সংসারের কাজের জন্য।

ডঃ পল পাসিনো তার 'ম্যারেজ ইজ হোয়াট ইউ মেক ইট' গ্রন্থে লিখেছেন যে সংসার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত গৃহিণীরা এই ধারণা পোষণ করেন যে তাদের অতিরিক্ত খাটুনি খাটতে হয়। অভিযোগটা অবশ্যই পরীক্ষা নিরীক্ষার দাবী রাখে। কোন মহিলা যদি তার সময়কে সুনির্বাচিতভাবে ব্যয় করেন তাহলে নিজের এই ফলাফল দেখে অবাক হয়ে যাবেন। এ বিষয়ে তাই উপদেশটি হল বিষয়টির তাৎপর্য লক্ষ্য করে নিজেকে দিয়ে ভাল কিছু করার চেষ্টা করুন। এক সপ্তাহ ধরে জেগে থাকার মুহূর্তে আপনি কি কি কাজ করেছেন বা করতে পারেন নি সেগুলো কাগজে লিখে ফেলুন। যদি বেশ মন দিয়ে সততার সঙ্গে লিখে রাখতে পারেন তাহলে দেখতে পাবেন সপ্তাহে যে যে কাজগুলোর সবচেয়ে বেশি সময় দিয়েছেন সেগুলো হল এই: টেলিফোনে গল্প করা, প্রতিবেশীদের সঙ্গে আড্ডা মারা, খাওয়াদাওয়ার পর বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করা। কেনাকাটায় সময় দেওয়া এই সব। এক সপ্তাহের এই রোজনামচা আর খতিয়ান পর্যালোচনা করলে আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন কিভাবে আপনার জীবনের মূল্যবান সময় বয়ে চলেছে। এই সাপ্তাহিক হিসেবের আলোয় আপনি আপনার সময়ের 'বাজেট' তৈরি করে নিন না কেন? এর মধ্য থেকেই নির্ধারণ করে নিন কোন্ কাজের জন্য দৈনিক কত সময় ব্যয় করবেন। দেখবেন আপনার সময়ের বৃথা অপচয় আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। বরং আশ্চর্য হয়ে দেখতে পাবেন আপনার সময় উদ্বৃত্ত হয়ে গেছে।

নিউইয়র্কে 'নিউ স্কুল ফর সোশ্যাল রিসার্চ' কর্তৃপক্ষ একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করেছেন। এই কোর্সের নাম হল 'সমাজে নারী: মানবিক সম্পর্কের কারখানা।' মিস এলিস রাইসক নামে একজন ব্যবসায়ী আর শিক্ষিকা এখানে শিক্ষাদান করেন। মহিলাদের সমাজে যথোপযুক্ত মর্যাদা আর স্বীকৃতি লাভের জন্য করণীয় বিষয় শেখানোই

এই শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রথম কাজ হল প্রত্যেক ছাত্রী কিভাবে নিজের সময় ব্যয় করছে তার একটা তালিকা তৈরি করা। মিস কুক নামে একজন শিক্ষিকার কথা হল যখন ছাত্রীরা নিজের চোখে দেখতে পায় যে কত সময় উদ্দেশ্যহীভাবে বৃথা নষ্ট হয়, বিশেষ করে টেলিফোনে গল্পগুজব, বৃথা যেখানে সেখানে ঘোরা ইত্যাদিতে, তখন তারা নিজেরাই চমকে যায়।

মিস কুক এও জানিয়েছেন যে কোন ছাত্রী যখন তার নিজের সময় সম্বন্ধে চার্ট বা তালিকা তৈরি করে তখন সে একটা বিষয় পরিষ্কার দেখতে পায়—তাহলে তার পক্ষে বাজে গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে সময় নষ্ট করা চলবে না। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে সকলকেই তাই করতে হবে। তিনি উপলব্ধি করেন যে অন্যান্য চমৎকার সব কর্মসূচীগুলোর প্রতি সুবিচার করতে হলে অবশ্যই গোয়েন্দা কাহিনী পড়ার মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে।

এরই সঙ্গে আবার কারও অপেক্ষায় নিরর্থকভাবে বসে থাকা, অহেতুক কোথাও যাওয়ার সময় বাসের জন্য হাপিত্যেস করে দাঁড়িয়ে থাকা, এদিক ওদিক বৃথা ঘোরাফেরা করা। এই সব কাজেরও একটা হিসাব রাখা দরকার। কেননা দৈনিক চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের বরাদ্দ থেকেই এইসব মুহূর্ত নিঃশেষ হয়ে চলে। এই সব মুহূর্তকে কি আমরা বেশ লাভজনক ভাবে কাজে লাগাতে পারব না?

অনেকেই কিন্তু এই সব মুহূর্ত কাজে লাগান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রায়ত প্রধান বিচারপতি মিঃ হার্লান এফ. স্টোন একবার ডিগ্রী কলেজের ছাত্রদের বলেন, 'পৃথিবীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজই মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে—বসে থাকলে ওই পনেরো মিনিট বৃথা নষ্ট হত।' থিয়োডোর রুজভেল্ট যখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন তার ডেস্কের ভিতর সবসময় একখানা বই খুলে রেখে দিতেন। কথাবার্তা আর লোকজন ইত্যাদির দেখা সাক্ষাতের মাঝখানে তিনি যে দু'তিন মিনিট সময় পেতেন সেইটুকু ওই বই পড়ার কাজে ব্যবহার করতেন। তার ছেলে জুনিয়র রুজভেল্ট বলেছেন যে তাঁর

বাবা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট শোবার ঘরে একখানা কবিতার বই রাখতেন। তার উদ্দেশ্য ছিল পোশাক পরার সময় কবিতা মুখস্থ করা। এই প্রসঙ্গে তাই বলা দরকার আমরা অনেকেই নিশ্চয় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মত কর্মব্যস্ত নই যে কবিতা পড়ারও সময় পাব না। অহঙ্কার করছি না আমি, এই বইটি রচনা করার সময় প্রয়োজনীয় লেখা-পড়ার কাজ সৌখীন বৈঠকখানায় বসেই সেরে নিয়েছি। আমি নিজে এটা লক্ষ্য করেছি যে ড্রেসিং টেবিলের উপর কোন বই রেখে দিলে প্রসাধন করার সময়েও ইচ্ছে থাকলে বিরক্তিকর কাজের ফাঁকে সে বই পড়ে ফেলা যায়। আপনি নিজেও ঠিক করতে পারেন যে বিভিন্ন সময় কিভাবে নষ্ট হয়। ওই সব সময়কে কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন। কখনও আপনি কি কোন বিদেশী ভাষা শেখার কথা ভেবেছেন? কখনও সময় ধরে ভাল লেখা বই পড়তে চেয়েছেন? চেয়েছেন গান-বাজনা ধৈর্য্য ধরে শুনতে? নিজের রূপ লাবণ্য বাড়ানোর জন্য সময় দিয়েছেন? ছবি আঁকা, সঙ্গীত চর্চা, লেখা বা খেলাধূলায় সময় ব্যয় করেন আপনি? এর উত্তরে হয়তো আপনি বলবেন, না আপনার কোন সময় নেই।

এই প্রসঙ্গে তাই বলতে চাই, সৃজনশীল মানুষরা যা করেন আপনিও তাই করে দেখুন না। অর্থাৎ আপনার সময় সূচীকে লিপিবদ্ধ করুন। আমরা অনেকেই এক সাড়া জাগানো বই 'চীপার বাই দা ডজন' বইয়ে জিলবার্ট পরিবারের কাহিনী পড়েছি। পরলোকগত ফ্রাঙ্ক জিলবার্ট পেশায় ছিলেন গণিতশাস্ত্রের একজন পথিকৃৎ মানুষ। তিনি ও তাঁর স্ত্রী পরিশ্রম এবং সময় বাঁচানোর জন্য নানা পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা ব্যবসা আর প্রকল্পের মত সংসার জীবনেও সমান কার্যকর ছিল। তাদের সন্তান সন্ততির সংখ্যা ছিল ১২ জন। ছেলেমেয়েদের তারা ঘুম থেকে এই বলে তুলতেন যে, সময় খুবই মূল্যবান। তাই তাকে যথাযথভাবে সৃষ্টিধর্মীকাজে ব্যবহার করতে হবে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা হাত মুখ ধুয়ে স্কুলে যাওয়ার মুখে কণামাত্র সময়ও অপব্যয় করতে দেয়া হত না।

ফিলাডেলফিয়ার পেনসিলভেনিয়ার মিঃ সালভাটর এস, গুজাডি একজন নামকরা প্রযুক্তি উপদেষ্টা। তার যথেষ্ট পসার। তাঁর স্ত্রী এবং সহকর্মী মিসেস গুজাডি স্বামীর সেক্রেটারির কাজ থেকে শুরু করে হিসাব রক্ষক, পার্সোনেল ম্যানেজার ইত্যাদির ভূমিকায় সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও সামাজিক নানা রকম কাজকর্মে অংশ নেন। মিসেস গুজাডি এছাড়াও তাঁর সংসারের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দক্ষতার ওই সব নীতি নিয়ম অনুসরণ করেন, যেগুলো তাঁর স্বামী অফিস পরিচালনার বেলা মেনে চলেন।

এখানে ভদ্রমহিলার একখানা চিঠির উদাহরণ রাখছি। এটা তিনি আমাকে লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'আমাদের শ্লোগান হল ঝোপ ঝাড় সব নির্মূল কর, যেন প্রত্যেক দিন আমরা ফুলের সৌরভ পাই। এর অর্থ হল এই যে করণীয় কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। যাতে আমরা যে সব বিষয় বেশি পছন্দ করি সেগুলো উপভোগ করার জন্য বেশি অবকাশ পাওয়া যায়।' তিনি নিজেদের সম্পর্কে লিখেছেন : 'আমাদের তিনটি স্বাস্থ্যবান সন্তান আছে। পছন্দসই একখানা বাড়িও রয়েছে। স্বামীর সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন, পরিবারের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক দায় দায়িত্ব পালন ইত্যাদি কাজের সবই কর্তব্য হিসেবে আমাকেই পালন করতে হয় তাই আমার সময়কেও দ্বিগুণ করে নিতে হয়। তারই জন্য আমাকে প্রয়োজনীয় সব সুবিধা খুঁজে রাখতে হয় আর স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় কোন্ কোন্ কাজ তাকে করতে হবে। আমাকেই স্বামীর অগ্রগতির সব চিন্তা ভাবনা মাথায় রাখতে হয়।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি লক্ষ্য করেছি যে পেশাগত উৎকৃষ্ট চিঠি পত্রের চমৎকার পরিকল্পনাগুলো শিশুর দুধের বোতল পরিষ্কার করাব বা অন্যান্য কাজ কর্ম করার সময় মনে আসতে পারে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করার মুহূর্তে আমরা ব্যায়াম করার কাজটা করে নিই আর হাসি ঠাট্টায় সময় কাটাই। অবশ্য আমাদের কাজের সূচী পরিবর্তনও করা যায় সেটা বাঁধাধরা কিছু নয়। কখনও কখনও আমরা আগেকার

সূচী বদল করি—তার নির্দিষ্ট সমস্যা বা পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করি। একসঙ্গে কাজ করা, চিন্তাভাবনায় পরস্পরের শরিক হয়ে ওঠা আর আমাদের নিজের নিজের এলাকা বাড়িয়ে তোলার ইচ্ছা আমাদের জীবনকে ঢের বেশি বৈচিত্রময় আর আশীর্বাদে ভরিয়ে তুলেছে। এটা সম্ভব পর হয়েছে কারণ আমাদের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে পরস্পরের সমঝোতার মধ্য দিয়ে আর একবার কোন কাজ শুরু করার পর তাকে শেষ করার অদম্য ইচ্ছায়।'

এটা থেকেই পাঠকপাঠিকারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন গুজার্ডি পরিবার কৃতকার্য হওয়ার মত দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী একটি পরিবার। তাঁরা জানেন কিভাবে বাঁচতে হয়, কাজ করতে হয়। দুটো বিষয়কে একসঙ্গে গেঁথে কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয় সে কৌশল তারা চমৎকার আয়ত্ত করেছেন। মিসেস রুজভেল্ট যেমন সময় নষ্ট করতেন না তারাও ঠিক তাই-ই। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে আপনার পরিচিত যেসব কর্মব্যস্ত মানুষ ঠিক ঠিক সময়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করেন তাদের কিন্তু কখনই সময়ের অভাব ঘটেনা। বরং আলসে লোকদের তুলনায় তাদের সময় যথেষ্টই বেশি থাকে। স্থানীয় রেড ক্রশ অভিযানের নেতা কে? টিকিট বিক্রি করার কাজটি কে করেন? কর্মহীন নিঃসন্তান মহিলারা কি? যাব একটা চাকর আছে, বিছানাতেই প্রাতরাশ শেষ করেন, সন্ধ্যায় ব্রিজ খেলায় অংশ নেন? না, না, মনে করবেন না আপনাকে কটাক্ষ করতেই কথাগুলো বলছি। সম্ভবতঃ একজন কর্মব্যস্ত স্বামীর তরুণী স্ত্রী যিনি তিন সন্তানের মা, পেশায় তিনি হয়তো মেট্রন, এই সমস্ত কাজের মহান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাকে নিজের হাতে সংসারের যাবতীয় কাজ করতে হয় আবার রবিবার দিন তিনি গির্জায় প্রার্থনা সঙ্গীতেও অংশ নেন।

এটা ঠিকই যে এই ধরণের মহিলারা ঢের বেশি কর্মশক্তির অধিকারিণী হয়ে থাকে। কারণ তারা কিভাবে নিজেদের সব ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে ঘর সংসার গুছিয়ে নিতে হয় সেটা শিখে নিয়েছেন আর সবার উপরে সময়ের মূল্য সম্বন্ধে তারা অত্যন্ত সচেতন আর ওয়াকিবহাল থাকেন।

একথা পরীক্ষিত সত্য যে সময়ের অপচয় করা বিপুল অর্থ ব্যয় করার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। অর্থ রোজগার করা যায়, কিন্তু যে সময় একবার চলে যায় তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। আর্থিক অপচয় পূরণ করা যায় সময়ের অপচয়কে কখনও না। সময়ের অপচয় রোধ কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে কয়েকটি নিয়মের কথা এখানে আপনাদের জন্য উল্লেখ করছি :

(১) **সময় জরিপ করুন :**

আপনি প্রত্যহ যে সময় ব্যয় করেন সে সম্পর্কে নিষ্ঠার সঙ্গে একটা জরিপ করার কাজটি করুন। এইভাবে এক সপ্তাহ ধরে এই জরিপের কাজ করতে থাকুন। ভাল করে অনুধাবন করে দেখে নিন সময় কোথায় যায়।

(২) প্রত্যেক সপ্তাহে পরের সপ্তাহের জন্য আগাম প্রতিটি দিনের কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রাখুন। মনে রাখবেন যুক্তিসঙ্গত সময়ে দৈনিক কাজগুলো সমাধা করলে স্নায়ুর উপর চাপ কমে—ক্লান্তি আর অবসাদও দূর হয়ে যায়। দায়িত্বশীল মানুষদের যদি এই পদ্ধতি সুফল দিতে পারে, তবে আমি বা আপনি বা অন্য যেকোন মানুষের বেলাতেও এটা সুফল আনবে। আপনার দৈনিক কর্মসূচী পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, অপ্রত্যাশিত কিছু নতুন কাজও উপস্থিত হতে পারে সেটাও মনে রাখতে হবে। তবে মোটামুটিভাবে একটা সময় সূচী অনুসরণ করুন। যেমন ধরুন রোজ রোজ দোকান থেকে হাঁটাহাঁটি করে মালপত্র কেনার চেয়ে এক সপ্তাহের জিনিস কিনে রাখুন। এতে পরিশ্রম বাঁচবে সময়েরও সাশ্রয় হবে। একসঙ্গে মালপত্র কেনার মধ্যে আর্থিক সুবিধাও থাকে। পরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকলে অল্প সময়েই খাওয়ার ব্যবস্থাও করে ফেলা যায়। প্রতিদিন সামান্য পরিমাণের জন্য যে পুষ্টির ব্যবস্থা করা যায় একসঙ্গে ব্যবস্থা করলে তার চেয়ে বেশি পুষ্টির ব্যবস্থা করা সম্ভব।

(৩) বিভিন্নভাবে সময় কাজে লাগান।

সময়াভাবে কাজটি করতে পারেন নি, এমন কোন কাজ বেছে

নিয়ে সেটা সমাধা করার ব্যবস্থা করুন। এ কাজটি করবেন আপনার পাওনা অবসর সময়টুকু কাজে লাগিয়ে। এজন্য কোন দুঃখ করবেন না।

(৪) একটি ঘণ্টাকে দু'ঘণ্টায় পরিণত করুন।

মিসেস গুজার্ডি এটাই করতেন। তিনি স্বামীর বিক্রির অভিযান সফল করার জন্যই তা করতেন। তিনি একটা কাজে নিবিষ্ট থাকার মধ্যেই অন্য কোন কাজ করতে থাকেন। অর্থাৎ এক বিষয়ের কথাই মনে মনে চিন্তা করে চলেন। এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে সময়কে দ্বিগুণ করা যাচ্ছে না কি? ধরুন রান্নার ফাঁকে অনায়াসেই কোন চিঠি পত্র বা অন্য কিছু লেখার বিষয় সহজেই চিন্তা করা চলে। শিশুকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে অনায়াসেই সেলাইয়ের কাজটি শেষ করে নেওয়া যায়। এইভাবেই এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টায় পরিণত হতে পারে।

(৫) বিশ শতকের সময়রক্ষকের পদ্ধতি শিখুন।

দৈনিক সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন, ক্রেতা গবেষণা কেন্দ্রের বুলেটিন, ডাকযোগে বইপত্রের গ্রাহক সংগ্রহ, ডাকবিভাগ ও টেলিফোনের ব্যবহার ইত্যাদি নিঃসন্দেহে সময় সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যেই চালু হয়। যে সব জিনিস আগে থেকে ডাকযোগে আনার ব্যবস্থা করা যায় তা নিঃসন্দেহে সময় বাঁচানোর তাগিদ থেকে উৎপন্ন।

(৬) সময় বাঁচানোর জন্য ক্রয় কৌশল শিখুন।

আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম জানা থাকা, বিশেষ বিশেষ জিনিস কেনা বা বেচা সম্পর্কে অবহিত থাকা আর একই সময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যত বেশি কিনে রাখা সম্ভব ক্রেতার পক্ষেও সত্যিই লাভজনক কাজ। সুচিন্তিতভাবে কেনাকাটা একটি বুদ্ধিমানের কাজ। অবশ্য এজন্য সতর্কতাও চাই। 'কিভাবে কিনতে হয়' এটা জানা থাকলে আপনি আর্থিক ও সময়ের, দুটি দিক থেকেই লাভবান হতে পারেন। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়েছে পৃথিবীর সব দেশেই।

(৭) কাজের প্রতিবন্ধকতা দূর করুন।

একটু চেষ্টা করলেই আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটায় এই ধরণের অনভিপ্রেত টেলিফোনের ঝনঝনানি বা দরজায় কলিং বেল টেপার শব্দ

শুনে আপনি উদাসীন থাকার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন। হয়তো আপনি কোন কাজ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এমন সময় টেলিফোন অথবা কলিং বেল বেজে উঠল। কাজের সময় এই ধরণের ডাকাডাকি নিঃসন্দেহে বিরক্তি উদ্রেক করে তা বলাই বাহুল্য। ~~মাত্রণ~~ আপনি এগুলো যদি এড়িয়ে চলেন তাহলে যারা আপনাকে ডাকাডাকি করেন তারা বেশ তাড়াতাড়িই বুঝতে পারবেন আপনাকে একটা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া ডাকা চলবে না। এতে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হন সেটাই তারা বুঝতে পারবেন। মনে মনে তাদের আপনার সময়জ্ঞানকে প্রশংসা করতেই হবে।

'হাউ টু লিভ অন টোয়েন্টিফোর আওয়ার্স এ ডে' গ্রন্থটিতে লেখক মিঃ আর্নল্ড লিখেছেন যে সময় সরবরাহ ব্যাপারটা সত্যিই অলৌকিক কোন ব্যাপার···সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাবেন যে আপনার জীবনের চব্বিশটি ঘণ্টা মন্ত্রবলেই যেন প্রকৃতি আপনার মূলধনের সঙ্গে একই সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন। এই সময়, এই জীবনাংশ একান্তভাবেই আপনার—মানুষের জীবনের সবার সেরা অধিকার। দিনের চব্বিশ ঘণ্টায় আমাদের মধ্যে কারা বেঁচে থাকেন? বেঁচে থাকার কথা বলতে আমি অস্তিত্ব রক্ষার কথা বলছি না অথবা হই হুল্লোরের বিষয়ও বোঝাচ্ছি না ··আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই যিনি সারা জীবন ধরে বলেন না, 'আর একটু সময় পেলেই আমি অনেক পরিবর্তন আনতে পারতাম।'

মনে রাখতে হবে 'আমরা আর কখনই এর চেয়ে বেশি সময় পাব না। আমাদের হাতে সময় আছে, সব সময় ছিল— আর তা ভবিষ্যতেও থাকবে।

The busiest man has the largest time at his disp.
— Gladstone

॥ উনত্রিশ ॥

বক্তব্য সংক্ষেপ করুন

মার্জোরি উইলসন হলেন বর্তমান কালের একজন প্রথম শ্রেণীর রূপলাবণ্য বিশারদ আর সদাচারণ বিশেষজ্ঞ। 'আপনি যে ধরণের মহিলা হতে চান' আর 'কিভাবে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করবেন' বই

ছুটি রচনা করে তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। তিনি যে সব নীতি প্রচার করেছেন তিনি নিজেই সেগুলি অনুসরণ করে বরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি স্বয়ং বিপুল পরিমাণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর নিজে গৃহস্থালীর কাজও প্রচুর করেন। এ সব সত্ত্বেও তিনি নিজেকে আকর্ষণীয় আর রমণীয় রাখতে পারেন। পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করার সময় তাকে চমৎকার ফিটফাট দেখায়। তাঁকে কখনই ব্যস্ত বা সন্ত্রস্ত মনে হয় না। খুব সম্প্রতি আমি ও আমার স্বামী তাঁর আমন্ত্রণে এক রবিবারের নৈশভোজে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে অতিথি ছিলেন সেদিন আমাদের নিয়ে মোট আট জন। তাদের অনেকেই বিখ্যাত নেতা। সেদিনের ওই ভোজসভা নানা হৃদয়গ্রাহী আলোচনা আর চমৎকার পরিবেশে যেন মুখর হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানটিকে বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয় সেদিনের পরিবেশ যেন বাতাসের মতই স্বচ্ছ আর মনোমুগ্ধকর ছিল। মার্জোরি আমাদের নানা সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করেছিলেন। এ কাজটি করতে তাব যেন কোন কষ্টই হচ্ছিল না। মেনুর মধ্যে ছিল মুরগীর রোস্ট, আঙুরের স্যালাড, ফল মেশানো ঠাণ্ডা আইসক্রিম। যেমন স্বাদ ওগুলোর তেমনই চমৎকার। পরিবেশন করার জন্য কোন পরিবেশক বা পরিচারিকা দেখতে পাইনি। মার্জোরি নিজেই সব করলেন। আমি মার্জোরিকে প্রশ্ন করলাম কিভাবে তিনি এমন বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন যে খুবই সহজে। সব কিছুই সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে। এরপর তিনি বিরাট ভোজের আয়োজন কিভাবে করেছেন তার বর্ণনা দিলেন। অনেক মহিলাই মনে করেন যে একদল অতিথির জন্য খাওয়ার আয়োজন করার কাজ তেমন সহজসাধ্য কাজ নয়। এর জন্য চাই অব্যাহত পরিশ্রম বেশ কয়েক ঘণ্টার। কেননা খাদ্য নির্বাচন, নতুন কোন সুখাদ্য তালিকায় ঢোকানো আবার সেটা পরিবেশন। অতিথিরা এসে পড়লেন ওই কাজের মধ্যেই আবার তাদের অভ্যর্থনার কাজও থাকে। বেচারি গৃহকর্ত্রীর দম ফেলার সময় থাকে না। তার অবস্থাটা অনুমান করে নিন একবার।

আর একটা উদাহরণ দিই। ১৯৪৮ সালে আমরা যখন ইউরোপে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম, সেখানে একজন অধ্যাপক আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভদ্রলোকের বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার পর দেখলাম সেখানে তার স্ত্রী ছিলেন না। আমরা অধ্যাপকের কাছে তার স্ত্রীর কথা জানতে চাইলে তিনি বললেন তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরে চাকরবাকরদের কাজের তদারকি করছিলেন। ইতিমধ্যে ভদ্রমহিলা এসে পড়লেন। আমাদের সঙ্গে তার যৎসামান্য কথাবার্তা হল। বুঝতে পারলাম তিনি এখানে থাকলেও তার মন পড়েছিল রান্নাঘরে। তাই তিনি একটু পরেই আবার রান্নাঘরে ছুটলেন। এরপর খাওয়ার ব্যবস্থা হল। রান্না চমৎকার ~~হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য~~। ভদ্রমহিলা তার রান্নার মেনু আর তদারকিতে এমনই বিব্রত হয়েছিলেন যে কারও দিকে আর নজর দিতে পারলেন না। নিমন্ত্রিতদের এক একটি পদ শেষ হওয়ার পরেই তিনি বারবার সেই রান্নাঘরে ছুটে যাচ্ছিলেন। অবশেষে চমৎকার সুস্বাদু সব খাদ্য শেষ হলে সবাই যেন হাঁফ ছেড়েই বাঁচলাম। এরচেয়ে বরং কোন রেঁস্তোরায় গেলে ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করা যেত. তার সঙ্গও পেতে পারতাম। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই 'শর্টকাট' পদ্ধতির কথাটা জানতেন না।

এই শর্টকাট পদ্ধতিটি আজকাল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, বিশেষ করে আজকালকার ব্যস্ততা মাখানো দিনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহিণীদের এই শর্টকাট বা সংক্ষিপ্ত ও স্বল্প পরিশ্রমে কাজকর্ম সমাধা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রচুর মেধা আর উদ্ভাবনী শক্তি ব্যয় করা শুরু হয়েছে। শুকনো ফলমূল ঠাণ্ডা রাখা, খাদ্য হিসেবে প্যাকেটে ভরা মাংস ইত্যাদি কত রকম সহজ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে—এর সবই গৃহিণীদের যন্ত্রণা কমানোর জন্য আর পরিশ্রম লাঘব করার উদ্দেশ্য নিয়েই। তাহলে আমরাই বা এসব সুযোগ গ্রহণ করব না কেন? যদি জীবনের কোন ক্ষেত্রে কর্মশক্তি ও সময়ের ব্যবহার বেশিরকম গুরুত্ব আর তাৎপর্যপূর্ণ হয় আর তারই সঙ্গে জানা দরকার এই কর্মশক্তি ব্যয় করার মধ্য দিয়ে আদর্শ স্ত্রী ও মা হওয়া সম্ভব। সারাটা দিন রান্না-

ঘরের কাজে লেগে থাকার ফলে ক্লান্ত, শ্রান্ত একজন স্ত্রীর পক্ষে কোন ভাবেই নিজেকে আকর্ষণীয় বা স্বামীকেও আকর্ষণীয় করে তোলা সত্যিই কঠিন। আমি বিশ্বাস করি কোন পুরুষ কাজের শেষে ঘরে ফিরে ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে একজন সজাগ স্ত্রীকেই কাছে পেতে চাইবেন। এই বিষয়ে নানা রকম জরিপের ফলশ্রুতিতে জানা গেছে দক্ষতা অর্জন আর কাজের মান বাড়িয়ে তুলতে ব্যর্থ হওয়াই হচ্ছে গৃহিণীদের প্রধান অন্তরায়। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের গৃহাঙ্গন রক্ষণাবেক্ষণের কাজে শর্টকাট বা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। যেক্ষেত্রে পাঁচ ধাপ যাওয়াই যথেষ্ট সেক্ষেত্রে আপনি কি আরও বেশি ধাপ গিয়ে সময় নষ্ট করতে চাইবেন? তাই আপনার কাজকর্ম পরীক্ষা করে নিন আর দেখুন আপনি আপনার দক্ষতা বাড়াতে পারেন কি না। মনে রাখবেন ক্ষেত্রবিশেষে দ্রুততম ব্যবস্থাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রাতরাশ তৈরি করার সময় আপনি বারবার রান্নাঘরে না গিয়ে যা যা দরকার একবারে নিয়ে এলেই সময় সাশ্রয় করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, বারবার যাওয়া আসার পরিশ্রমও লাঘব করতে পারবেন। পরিষ্কার করার জন্য রাখা কাপড় বা ঝাড়ন ইত্যাদি হাতের কাছে রাখাই বুদ্ধিমতীর কাজ, তাতে অহেতুক খোঁজার ঝামেলা পোহাতে হবে না। হাতের কাছে একটা স্পঞ্জ থাকলে ঘর সাফাই সহজ হয়। বাথরুমে পরিষ্কার করার বেলাতেও একথা খাটে। প্রতিদিন সব পরিষ্কার রাখতে পারলে অনেক শ্রম ও সময় বাঁচানো যায়। সপ্তাহ ধরে জমে ওঠা নোংরা আবর্জনা পরিষ্কারের কথা ভাবলে একটু অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেনই। তাই নয়?

দোতলা বাড়ি থাকলে কারও নিচের তলার জন্য আলাদা সরঞ্জাম থাকা দরকার। সব যেন হাতের কাছে থাকে। ঝাড়া মোছার কাপড়, সাবান পালিশ ইত্যাদি হাতের কাছে না থাকলে অনেক সময় ইচ্ছে থাকলেও সাফাইয়ের কাজ করা হয়ে ওঠে না। মূল কথাটা হল গৃহস্থালীর কাজের জন্য সেখানে যা দরকার আগে থেকেই সেখানে

সেটি যেন সাজিয়ে রাখা থাকে। এই প্রসঙ্গে একটা পরামর্শের উল্লেখ না করে পারছি না। সেটি এই রকম :

১। **নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র :** যেমন, টুথপেষ্ট, সাবান, তেল, একসঙ্গে বেশি করে কিনে রাখলে টাকাপয়সার দিক থেকেও সাশ্রয় হয়, দ্বিতীয়তঃ সময়ও বাঁচে।

২। পরিকল্পনা : কোন কিছু কেনাকাটার আগে কোন জিনিস কতটা দরকার, কত দামের মধ্যে—পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি রঙ পর্যন্ত আগেই ঠিক করে দোকানে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। এসব ঠিক না করে দোকানে ঢুকলে ক্রেতাকে প্রায়ই অপ্রস্তুত হতে হয়। রঙ, মান, দাম ইত্যাদি ঠিক করতে প্রচুর সময় লাগে আর খরচও ঢের বেশি হয়।

৩। ক্রেতা রিচার্স সার্ভিস : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বহু উন্নত দেশে ক্রেতা রিচার্স সার্ভিসের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। এই সার্ভিস কর্তৃপক্ষ মাসিক বুলেটিনের আকারে আর বার্ষিক তালিকা বা ক্যাটালগ আকারে ক্রেতাদের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর দর, দামর ওঠানামা, গুণ, গুণগত পরিবর্তন আর নতুন আবিষ্কার সংযোজন করে ক্রেতাদের সব সময় অবহিত রাখেন। এই সমস্ত ক্যাটালগ ও বুলেটিনে মোটরগাড়ি থেকে টুথপেষ্ট পর্যন্ত এমন কোন জিনিস নেই যার তথ্য থাকে না। অনুন্নত দেশগুলোতে এই সুবিধার প্রচলন না থাকলেও নিজের পরিবারের চাহিদার জিনিসপত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা যায়। আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে দাম বেশি হলেই জিনিসের গুণগত মান কখনই বেশি হয় না। অনেক কম দামী জিনিসও গুণগত দিক থেকে উৎকৃষ্ট হতেও পারে।

(৪) **তালিকা রাখুন :** স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর যদি না হয়, তাহলে যে কেউ প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্রের তালিকা রাখলে চমৎকার সময় সাশ্রয় করা যায়। নববর্ষের উৎসব পালনের জন্য বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের জন্য কোন্ কোন্ জিনিস দরকার হতে পারে তার একটা তালিকা অবশ্যই আগে করে ফেলবেন। বাজারে যাওয়ার সময় বা মালের বায়না দেবার সময় একটা ফর্দ থাকা চাই-ই। একজন শ্রেষ্ঠ

কবির কবিতা বা একজন দার্শনিকের তত্ত্ব আর প্রিয় পরিজনের নাম ছাড়া অন্য কিছু মাথায় ঢুকিয়ে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করবেন কেন। বাকি সব তালিকা করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। শর্টকাট করার এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করলে আপনার অবাঞ্ছিত সময় অলৌকিক ভাবে রাখা যাবে। মূল কথাটি হল পদ্ধতিগত বিন্যাসের মধ্যদিয়ে কাজ যেমন সহজসাধ্য হয়ে ওঠে, তেমনই আবার সময় ও অর্থের অপচয় বন্ধ হয়ে যায়।

এবারে যে সব কাজ আপনি করতে পছন্দ করেন না অথচ করতে বাধ্য হন সেগুলি সংক্ষিপ্ত এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করব। এগুলি এই রকম ঃ

১। **কাজের পদ্ধতি বিশ্লেষণ :** কোন কাজে কখন নিজেকে লাগাবেন সেটা আগেভাগেই ঠিক করে ফেলুন। কিভাবে অযথা সময় ও শ্রম ব্যয় করছেন তার হিসেব রাখুন। যেসব বিষয় আপনি পছন্দ করেন না সেই কাজ ত্রুটিপূর্ণভাবে শেষ হওয়া অস্বাভাবিক মোটেই নয়।

২। **পরামর্শ ঃ** আপনার বান্ধবীদের কাছ থেকে পারলেই পরামর্শ নিন। আপনার স্বামীকে অবজ্ঞা করবেন না, তারও পরামর্শ নেবেন। পুরুষ মানুষ হিসেবে সাংসারিক বিষয়ে তার জ্ঞান নেই একথা ভাববেন না। মনে রাখবেন শর্টকাটের ক্ষেত্রে পুরুষদের অবদান প্রচুর।

৩। **দক্ষতা অর্জন :** যে সব কাজে আপনি অপটু বা ঈপ্সিত পথে তা সমাধা করতে পারবেন না বলেই ভাবেন সেগুলো বেশ সতর্কতার সঙ্গেই করতে চাইবেন। দক্ষতা কখনও আপনা আপনি আসে না। পৃথিবীতে যে সব কাজ করণীয় সেগুলো মনে রাখা চাই সুষ্ঠুভাবে করতে হবে। সদিচ্ছা থাকলে দক্ষতা আসবেই।

৪। **একটি সতর্কবাণী :** বাগানে ফুটে থাকা ফুলের শোভা বাড়িয়ে যদি সৌরভ পেতে চান তাহলে গাছের নিচের আগাছা সাফ করা চাই। কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন আগ্রহের আতিশয্যে যেন আগাছার সঙ্গে ফুল ছিঁড়ে না ফেলা হয়। শর্টকাট করতে গেলে অনেক সময়েই এটা হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। যে সব কাজে আপনি আনন্দ পান,

আপনার পরিবারের সকলে সুখী হন সেগুলো শর্টকাট করার দরকার কোথায়? কোন কোন মহিলা সেলাই করা, নানা স্বাদের রান্না করা এইসব পছন্দ করেন। আপনার বেলায় যে রকম ইচ্ছাই হোক সেটা ভালভাবেই সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। দেখবেন তাতে ঢের বেশি তৃপ্তি পাবেন। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক যে পদ্ধতিই কাজে লাগানো হোক না কেন তার প্রধান উদ্দেশ্যই হল অনেকটা কম সময়ে অন্যান্য কাজ শেষ করে সৃজনশীল কাজে বেশি সময় দেওয়া।

সংক্ষেপে সপ্তম অধ্যায়ের নিয়মগুলি

১। আপনি গৃহিণী হওয়ার জন্য গৌরব বোধ করুন।

২। স্বামীর সংসারকে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ও বিনোদনের ক্ষেত্রে পরিণত করুন। আপনার সংসার সকলের জন্য গড়ে তুলুন।

৩। সময়ের সুবিধা কাজে লাগান।

৪। শর্টকাট পদ্ধতি বা সংক্ষিপ্ত পথে কাজকর্ম সহজতর আর স্বচ্ছন্দ গতির করে তুলুন।

অষ্টম অধ্যায়

॥ ত্রিশ ॥

স্বামীকে কিভাবে জনপ্রিয় করবেন

জনপ্রিয় করার তিনটি কৌশল মনে রাখবেন। সামান্য সচেষ্ট হলেই মহিলারা তাদের স্বামীদের জনপ্রিয় করে তুলতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হল কিভাবে? সেই তিনটি পদ্ধতির কথাই এবার আপনাদের বলছি:

১। **স্বামীকে প্রিয় করে তুলুন:**

বহু বছর আগে আমি ও আমার স্বামী জেনি অটরিকে দেখতে যাই। এই সময় তিনি ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে রেডিওর অভিনয় করছিলেন। ওই সময়কার একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। জেনি ও তার সুন্দরী স্ত্রী ইনার সঙ্গে আমরা আহার পর্ব সমাধা করতে যাওয়ার সময় অটোগ্রাফ শিকারি ছেলেমেয়েদের ভিড় কাটিয়ে আমার

যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সকলেই জেনিকে চায়। আমাদের হাতে সময় প্রায় ছিল না। তা সত্বেও জেনি হাসিমুখে কিশোর কিশোরীদের দিকে তাকিয়ে তাদের অটোগ্রাফ খাতায় সই করে দিতে লাগলো। আমি জেনির স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম সে দেরী হওয়ার জন্য বেশ বিরক্তবোধ করছে। তিনি আমার চোখের ভাষা বুঝে হাসিমুখে বললেন যে জেনি কাউকেই ফেরাতে পারেনা, কাউকে সে না বলে না। বিশেষতঃ শিশু ও কিশোর কিশোরীদের। জেনির স্ত্রীর এই কটি মন্তব্য জেনির প্রীতিকর দিকটাই তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিল। কথাটা আরও বিশদ করেই বলা যায়। আর তা হল হাজার হাজার ফ্যানের চিঠিপত্র, সাময়িকপত্র এবং সংবাদের চেয়েও কিন্তু মিসেস ইনার স্বামী সম্পর্কে ওই কটি কথা তার চরিত্রের বিশেষ দিকই স্পষ্টতর করে তুলেছিল। মিসেস ইনার মন্তব্য থেকে আমি স্পষ্ট ভাবেই বুঝতে পারছিলাম যে জেনি অত্যন্ত কোমল আর উষ্ণ আবেগে ভরা মানুষ। জেনি অটরি সত্যিই একজন আকর্ষণীয় পুরুষ।

এখানে একটি প্রশ্ন তুলব। যে সব পুরুষ এই ধরণের আকর্ষণীয় নন তাদের স্ত্রীদের এই ব্যাপারে করণীয় কিছু আছে কিনা। আমার মত হল, 'হ্যাঁ আছে বইকি।' আমি একজন মহিলাকে জানি যাঁর স্বামী সামাজিকভাবে ব্যর্থ। কিন্তু তা সত্বেও সমাজ তাকে সহ্য করতে পারত শুধু একটি মাত্র কারণেই—আর তা হল তাঁর স্ত্রী। ভদ্রলোক এককথায় ছিলেন অসম্ভব জেদী, বিতর্ক প্রিয় আর অসহিষ্ণু। কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রীর কাছ থেকে তার ছোটবেলার দুঃখকষ্ট পূর্ণ জীবনকথা শোনার পরেই কিন্তু তার প্রতি আমাদের সমস্ত বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণার ভাব দূর হয়ে মন পূর্ণ হয়ে যায় সহানুভূতিতে। ভদ্রলোকের স্ত্রী জানান যে শৈশবেই তাকে আশ্রয় আর অন্ন সংস্থানের জন্য আত্মীয় থেকে আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় নিতে হয়। সমস্ত শৈশবের দিনগুলোতে তিনি কারও কাছেই কণামাত্র স্নেহ মমতার স্পর্শ পাননি, শুধু অপমান আর নিগ্রহ তার ভাগে জোটে।

এই সব কাহিনী শোনার পর ভদ্রলোকের ওই ধরণের আচরণে

একটা কারণ বুঝতে আমাদের আর অসুবিধা হল না। তাঁর স্ত্রী হয়তো তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারেন নি কিন্তু স্বামীর ভুল ত্রুটির কারণ সকলের কাছে ব্যাখা করে তার প্রতি সবাইকে সহানুভূতিশীল করে তুলতে পেরেছেন। এর দামটাও নেহাত কম নয়। বিতৃষ্ণা থেকে সহানুভূতি—দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরু। একজন মানুষ যতটাই কৃতকার্য হবেন, তার প্রয়োজন নিঃসন্দেহে ততটাই কৃতকার্যময়ী স্ত্রী, যিনি তার স্বামীকে সুন্দর ও মার্জিত রুচির মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারবেন। এই ধরণের স্ত্রী ইতিহাসে বহু সমাজ বিদ্বেষী স্বামীকে যে কিভাবে রক্ষা করেছেন তার ভুরি ভুরি নিদর্শন রয়েছে।

২। স্বামীর গুণের বিষয় প্রকাশ করুন :

স্ত্রী হিসেবে আপনার স্বামীর গুণ আর ব্যক্তিত্বের কথা বন্ধুবান্ধবদের কাছে প্রচার করার বা তুলে ধরার সবচেয়ে ভাল উপায়টি হল পারিবারিক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির পরিকল্পনা এমন ভাবেই করা চাই যার মধ্য দিয়ে স্বামীর গুণ আর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হয়। যাতে এই গুণের প্রতিফলন ঘটে এবং অন্যের কাছে তিনি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন এমন পথই নেওয়া দরকার। মনে রাখবেন রুটিন মাফিক দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে একজন লোককে যতটা জনপ্রিয় করে তোলা যায় তার চেয়ে ঢের বেশি করা যায় পরিকল্পিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। এই সম্বন্ধে দু একটা উদাহরণ রাখছি এখানে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যামেরন শিপ মঞ্চ ও চিত্রকারকদের জীবনী লেখক হিসাবে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছেন। লোকজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আর বন্ধুত্বলাভের দিকে তার বিশেষ একটা ঝোঁক আছে। তাঁর স্ত্রী যখন বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ জানান তখন এমনভাবে সব পরিকল্পনা আর ব্যবস্থা করেন যাতে তার স্বামীর নানা গুণ প্রকাশ পায় আর সকলে তাঁর প্রশংসা করতে পারেন। এই রকমই একজন হলেন নিউইয়র্কের ডঃ যোশেফ ক্রাইস। তিনি একজন বিখ্যাত শিশুরোগ বিশারদ। এরই সঙ্গে আবার ডঃ ক্রাইস একজন চমৎকার সখের যাদুকরও। বাড়িতে যখন অতিথিদের আগমন ঘটে, ডঃ ক্রাইস

তখন নানা রকম যাদুর খেলা দেখিয়ে তাদের মুগ্ধ করেন। তাঁর স্ত্রী এই যাদুর খেলা দেখানোর ব্যাপারে স্বামীকে নানা ভাবেই সাহায্য করেন। এই ধরণের মানুষেরা সত্যিই ভাগ্যবান যেহেতু তাঁদের স্ত্রীরা নিজেদের জাহির বা পরিচিত করার বদলে তাঁদের স্বামীদের প্রশংসা আদায়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, আর তাদের সুখ্যাতির দিকে এগিয়ে দেন। স্বামীর প্রতি তাদেব এই আনুগত্য তাঁদের দাম্পত্য জীবনের গভীর সুখের সৃষ্টি করে যার মূল্য তাদের অর্থাৎ স্ত্রীদের পরিচিতির চেয়ে হাজার গুণ বেশি দামী।

(৩) বুদ্ধিমতী স্ত্রী হয়ে উঠুন :

প্রায়ই এটা লক্ষ্য করা যায় যাদের কোন কাজের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয় আর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যারা নিজেদের উপর আস্থা রাখেন, তারাই আবার সামাজিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন। তারা হালকা কথাবার্তা বলেন না—বরং বলা যায় বলতে জানেন না। একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রী নিঃসন্দেহে এই ধরণের মানুষের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু। বুদ্ধিমতী স্ত্রী ঘরোয়া আলাপের ক্ষেত্রে স্বামীকে অনেক কথার খেই ধরিয়ে দিতে পারেন। যেমন ধরা যাক, কথাবার্তার ফাঁকে স্ত্রী স্বামীকে বললেন, ‘গত সপ্তাহের সেই অভিজ্ঞতার কথাটা তোমার মনে আছে জিম? দোকানদার তোমায় কি বলেছিল? স্বামী এক্ষেত্রে সেই ঘটনার কথাটা সবিস্তারে বর্ণনা করতে পারেন। এই ধরণের অবস্থায় স্বামীর তেমন বাকপটুতা না থাকলেও তিনি ক্রমেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবেন তাতে সন্দেহ নেই। লাজুক মানুষও তা পারবেন।

একবার একটা কাহিনী আমার মনে পড়ছে। একজন মেট্রন আমাকে বলেছিলেন তিনি কিভাবে তার ঘরকুনো স্বামীকে নানা রকম সামাজিক কাজকর্মে জড়িত করতে পেরেছিলেন। তিনি পুরো ঘটনাই আমাকে অকপটে শুনিয়েছিলেন। মহিলার স্বামীর নাম ওয়াল্টার। ভদ্রলোক অত্যন্ত সজ্জন আর সদালাপী। কথাটা অবশ্য তার ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধব আর কাছের মানুষ ছাড়া কেউ জানত না। গভীর আত্মচেতনায় মগ্ন

থাকার জন্য ওয়াল্টারকে কেমন যেন সব ব্যাপারেই নিস্পৃহ আর উদাসীন দেখাত। অথচ তার স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল স্বামীকে সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তোলা।

কাজটা ভদ্রমহিলার পক্ষে মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কারণ স্বামীকে সমাজ চেতনাহীন অবস্থা থেকে সমাজ সম্বন্ধে উৎসাহী করে তোলাটাই ছিল আসল কাজ। মহিলা জানতেন তার স্বামীর ফটো তোলার ঝোঁক আছে আর বিভিন্ন ধরণের ফটোগ্রাফীতে তিনি বেশ আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। মহিলা ইতিমধ্যে তার স্বামীকে কিছুই জানতে দিলেন না। তার স্বামী কাজে বাইরে গেলে ফটোগ্রাফী সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন কাউকে তিনি খুঁজে আনতেন আর স্বামী ফিরলে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। একই বিষয়ে আগ্রহী দেখে ওয়াল্টার তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিতেন। এর ফলে কথা বলতে বলতে ওয়াল্টার আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়তেন আর তার নিজের স্বরূপও প্রকাশ হয়ে পড়ত। এইভাবে তিনি ফটোগ্রাফীর সীমানা পার হয়ে অন্য সব বিষয়েও আলোচনা আরম্ভ করতেন। তার স্ত্রী তাকে কথাবার্তার মাঝখানে গল্পের সূত্র জোগান দিয়ে সাহায্য করতেন। নানা ভাবে আলোচনায় এই রকম অংশ নিতে নিতে ওয়াল্টারের চরিত্র সম্পুর্ণই বদলে যায় আর তিনি এরপর ক্লাবমুখী ও পার্টি ইত্যাদির প্রিয় হয়ে পড়েন। তিনি হয়ে পড়েন সম্পূর্ণ একজন সামাজিক জীব। পরিবারের লোকজন ওয়াল্টারের ওই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে যান—ঘরকুনো ওয়াল্টারকে যে ঘরে পাওয়াই দায় হয়ে পড়ে। ওয়াল্টারের স্ত্রীকে যখন লোকে বলত, 'তোমার স্বামীতো চমৎকার মানুষ' কথাটায় তিনি আনন্দে অধীর হয়ে যেতেন।

এই রকম একজন চামড়ার ব্যবসায়ীর কথা আমি জানি। ভদ্রলোকের চমৎকার জ্ঞান ছিল নানাধরণের আগ্নেয়াস্ত্র উৎপাদন সম্বন্ধে। আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে পড়াশোনাতেও তার প্রচুর উৎসাহ ছিল। অথচ তার স্ত্রীর কথাটা জানা থাকলেও এ বিষয়ে কাউকেই কিছু জানান নি। আমার মনে হয় মহিলা যদি কথাটা সকলকে জানাতেন তাহলে তার স্বামীর সুনামের ভাগ তিনিও পেতে পারতেন। তার নিশ্চয়ই উচিত ছিল স্বামীকে সকলের কাছে প্রিয় করে তোলা। 'স্ত্রীরই উচিত সবক্ষেত্রে স্বামীর বাড়তি শ্রেষ্ঠ গুণের কথা বাইরের মানুষকে জানানো।

।। একত্রিশ ।।

স্বামীর গুণও দোষ

আপনার স্বামীর সম্বন্ধে অন্যরা যে ধারণা পোষণ করেন তা অনেক ক্ষেত্রেই আপনার স্বামীর প্রতি আপনারই ধারণার প্রতিফলন হতে পারে। একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। কোন একটা জিনিসের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় আমি একজন ডিলারকে ফোন করি। ভদ্রলোক সেসময় দোকানে ছিলেন না। তাঁব স্ত্রী টেলিফোনে তাঁর হয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি অনেক কথাই আমায় বলেন। আলাপ শেষ করার আগে তিনি জানান যে তাঁর স্বামী এই সব ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। আমার ইচ্ছা হলে তিনি আমার ঘর দেখে আসার ব্যবস্থা করে দেবেন। মহিলাটি আরও বললেন যে আমার ঘর দেখে আসার পরেই তিনি আমার প্রয়োজন সম্বন্ধে সমস্ত জানাতে পারবেন। যাই হোক এরপর ভদ্রলোক আমার ঘর দেখার জন্য এলে আমার ধারণা হল ভদ্রলোক সত্যিই একজন বিশেষজ্ঞ মানুষ। ভদ্রলোক আমার পূর্ব পরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও আমার পরিষ্কার ধারণা জন্মায়, তার অভিজ্ঞতার কোন সীমা নেই। তার প্রতি আমার যে বিশ্বাস জন্মায় তা নিঃসন্দেহে তার স্ত্রীর জন্যই। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে এমন কোন ব্যক্তি বা মহল নেই যা এই সব ক্ষেত্রে কোন স্ত্রীকে হারাতে পারে। যে কোন একজন মানুষের সত্যিকার গুণগত খ্যাতি বা পরিচিতি বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের স্ত্রীদের উপর নির্ভর শীল। তাদের কেউ যে একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কোন কাজে প্রসিদ্ধ সেটা তাদের স্ত্রীরাই অনেকক্ষেত্রে প্রচার করেন।

মানব চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে একজন লোককে আমরা যেভাবে উপস্থিত করি, চরিত্রারোপ করতে চাই, একান্ত অজ্ঞাতসারে তিনি সেই চরিত্রেরই অধিকারী হয়ে পড়েন। কোন ছেলে যদি অন্য একটি ছেলেকে বিদঘুটে বলে খেপাতে থাকে তাহলে এমনও দেখা যায়

সে কেমন জড়সড় হয়ে বিদঘুটে হয়ে পড়তে থাকে। আবার উল্টো-ভাবে কোন একজনকে অনবরত যদি তার বুদ্ধিমত্তা জন্য প্রসংসা করতে থাকা হয় সে কিন্তু সত্যিই বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ অহরহ দিতে থাকে। তাই একজন মানুষের সঙ্গে এমনই আচরণ করুন যেন সে সত্যিই দক্ষ। দেখতে পাবেন এর ফলে মানুষটি অবশ্যই কৃতিত্ব অর্জন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে শুরু করবে আর তার আচরণে ও এর প্রতিফলন ঘটবে।

বিভিন্ন পেশার মানুষের স্ত্রীদের লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁরা স্বামীদের সম্পর্কে অনুকূল ধারণা প্রদান করতে অভ্যস্ত। যেমন, প্রস্তাবিত কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে অক্ষমতা জানাতে গেলে তাদের স্ত্রীদের কথা হল, তাদের নিশ্চয়ই পার্টিতে যোগ দিতে ইচ্ছে করে কিন্তু তারা তা পারেন না যেহেতু তাদের স্বামীরা তাদের প্রতিষ্ঠানে কাজের পাহাড়ে চাপা পড়ে থাকেন। অথবা প্রাসঙ্গিকভাবে তারা বলেন 'ববের আগামী সপ্তাহে আঞ্চলিক মেডিক্যাল কনফারেন্সে বক্তৃতা দিতে হবে। এ নিয়ে সে এত ব্যস্ত যে তাকে প্রায় দেখতেই পাই না বাড়িতে।' এই সব মানুষ কখনই নিজেদের গুণের বিষয় জাহির করতে পারে না—কোন রুচিবান মানুষই তা পারেন না। তাই এক্ষেত্রে যদি তার স্ত্রী কোন সময় স্বামীর কৃতিত্বের কথা প্রচার করেও থাকেন তাতে দোষাবহ কিছু থাকে না। অবশ্য স্ত্রী যদি সাধারণ ভদ্রতা আর রুচিবোধের সীমা অতিক্রম না করেন।

একদিন কোন একটি অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে আমার একান্ত প্রিয় তারকা অ্যান্টনী ক্যাম্বল কুপারের দেখা হওয়ার সুযোগ হয়। মিঃ কুপার সস্ত্রীক ছিলেন। মিঃ কুপারকে বহু সিনেমা আর নাটকে অভিনয় করতে দেখেছি। মিঃ কুপার সম্পর্কে আমার আগ্রহ লক্ষ্য করে তাঁর স্ত্রী মিঃ কুপার সম্পর্কে অনেক কথাই শোনালেন।

যদি ওই ভদ্রমহিলা স্বামীর ব্যক্তিত্বের ওই সব দিক সম্বন্ধে আমাকে না জানাতেন তবে এই সম্পর্কে কিছু জানা আমার পক্ষে আদৌ

সম্ভবপর হত না। ভদ্রমহিলা আমাকে শোনালেন লণ্ডনের নানা রহস্যের কথা, নানা ধরণের ট্রেনিংয়ের কথা আর মিঃ কুপারের কয়েকজন বিখ্যাত তারকার সঙ্গে অভিনয়ের কাহিনী। এই সব কাহিনী শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কুপারের সম্পর্কে আমার ভালবাসা আরও বেড়ে গেল এতে। মিসেস কুপারকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারিনি।

আর একটি কাহিনীর উল্লেখ করছি এবার। প্রসিদ্ধ ব্যালে নৃত্যশিল্পী মোসলিন লার্কিনের সঙ্গে রোমান জেসনিস্কির বিয়ে হয়। প্রায় এক বছর আগে মিঃ ও মিসেস জেসিনস্কি একটি নৃত্যশিল্পী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন। তারা ওই নৃত্যপ্রদর্শন উপলক্ষ্যে প্রায় সারা দেশ ভ্রমণ করেন। মোসলিন যখন শিশু নৃত্যশিল্পী ছিল তখন থেকেই আমি চিনতাম। ওকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, 'মোসলিন, কাজকর্ম কেমন চলছে?' মোসলিন উত্তরে বলল, 'চমৎকার। জামকার (জেসনিস্কির ডাক নাম) ইচ্ছে ছিল একটা বড় দলের নেতৃত্ব দেয়। এই দলের নেতৃত্ব নিয়ে ওর সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে।'

শিল্পী হিসেবে দক্ষ হলেই কারও দল পরিচালনার ও প্রশাসনিক দক্ষতা জন্মায় না, পারদর্শিতাও জন্মায় না। সুতরাং জেসনিস্কি কোন দল পরিচালনা করছে জানার পর তার চরিত্রের অন্য দিক সম্বন্ধে আমি সচেতন হলাম। বলা বাহুল্য এই দিকটি তার সত্তাকে আরও উজ্জ্বল করেছে। বিখ্যাত লোকেরা জানেন যে উঁচুদরের কোন মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে. এই কথাটি উপযুক্ত কৌশলের সঙ্গে প্রকাশ করতে জানে এমন একজন মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়া জীবনে কত মূল্যবান ও অপরিহার্য।

শিকাগো শহরের জুনিয়র অ্যাসোসিয়েশন অব কমার্সের এক সভায় মিঃ কুশম্যান বিজেল বলেন যে স্ত্রীদের তুচ্ছ করা বা তাদের কাজের অবমূল্যায়ণ করা অনুচিত। মিঃ বিজেল অ্যাসোসিয়েশনের উদীয়মান ব্যবসায়ী আর প্রশাসকদের বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের বাগে আনো।' মনে রাখবেন আপনাদের স্ত্রীরাই শ্রেষ্ঠ বিক্রেতা বা সেলসম্যান হতে

পারেন, যদি না তারা আতিশয্যের আশ্রয় নেন। তিনি, আপনার পক্ষে যা সম্ভব নয় সেই রকম মধুরতা মিশিয়ে আপনার গুণকীর্তন করতে পারেন।

এ সবই স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব। স্বামীর গুণের দিকগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়াও তিনি স্বামীর দোষত্রুটিগুলো লঘু করে দেখাতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা কেউই ত্রুটিমুক্ত নই। স্ত্রীর ভুল ত্রুটি অবশ্যই থাকে—কিন্তু সে ত্রুটি ঘরের বা সাংসারিক জীবনেই আবদ্ধ থাকে। কিন্তু একজন পুরুষের ভুল ত্রুটি তার জীবন সাফল্যের প্রতি-বন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের নাম ও চেহারা মনে রাখার ব্যাপারটাই ধরা যাক। কর্মব্যস্ত মানুষেরা এর গুরুত্ব মনে মনে উপলব্ধি করেন। তাদের অধিকাংশই স্বীকার করবেন এত মানুষের চেহারাও নাম মনে রাখা সম্ভব নয় বা সহজ নয়। এইজন্য স্বামীর স্মৃতির স্বল্পতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না করে স্ত্রীই লোকজনের নাম আর চেহারা মনে রাখতে পারেন। এবং কোন ব্যক্তিকে সঠিকভাবে চিনে নিতে স্বামী যখন অন্ধকারে হাতড়াবার মত অবস্থায় পড়েন তখন তার স্ত্রী স্বচ্ছন্দে তাকে সাহায্য করতে পারবেন।

অনেক কর্মব্যস্ত লোকের মত আমার স্বামীর পক্ষে সব মানুষের নাম ধাম আর চেহারার কথা মনে রাখা সম্ভব হয় না। তাই আমরা একটা ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছি। যখন বেশ কিছু লোকজনের সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় তখন আমরা কয়েকজনের নাম জেনে নিই। কারও সঙ্গে কথা বলার সময় আমি তাদের পুরো নাম এমনভাবে উচ্চারণ করি যেন আমার স্বামী শুনতে পান। এটা অতি সামান্য একটা উপায় অথচ এর সাহায্যে আমি আমার স্বামীকে নানা অসুবিধা থেকে উদ্ধার করেছি। নাম শোনা আর মনে রাখার জন্য আমি কোন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইনি। কিন্তু নাম মনে রাখার জন্য আমার স্বামীর চেয়ে আমার সময় অনেকটাই বেশি। প্রচেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে অনেক স্ত্রীই স্বামীর স্মৃতি শক্তির সহায়ক হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠতে পারেন। অনেক বিদুষী স্ত্রীই স্বামীর শিক্ষাগত অথবা

প্রশিক্ষণগত ত্রুটি দূর করতে পারেন। পৃথিবীর অনেক মহান ব্যক্তিই যারা নিজের ভাগ্য গড়ে তুলতে পেরেছেন, তাদের বিঘ্ন সঙ্কুল জীবনকে স্ত্রীরাই সহজ সরল মসৃণ করে তুলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট জনসন বিয়ের পর স্ত্রীর কাছে লেখাপড়া শেখেন। আজকাল পৃথিবীতে এমন লোকের সংখ্যা কম নয় যারা অর্থ উপার্জনের জন্য এতবেশি কাজে ব্যস্ত থাকেন যে অন্য কিছু চিন্তা করা বা জানার কোন অবকাশ থাকে না। তাদের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্না স্ত্রীর প্রয়োজন অনেক আর তাদের ভূমিকাও যে অনন্য তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

কোন কোন লোক আছেন যারা অত্যন্ত বিনম্র। আপনার স্বামী যদি ওই ধরণের লোকদের একজন হয়ে থাকেন তা হলে তাকে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু সেটা কিভাবে করবেন? এজন্য কয়েকটা পদ্ধতির উল্লেখ করছি :

১। অতীতে আপনার স্বামী যে যে বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন তাকে সেগুলো স্মরণ করিয়ে দিন।

২। যখনই সম্ভব নানা বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করে তার আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিন।

৩। এমন বন্ধুবান্ধব লাভ করার চেষ্টা করুন যারা তাকে প্রশংসা করবেন আর উৎসাহ দেবেন। আপনার স্বামীর পরিচয় তার প্রকৃতি জানার সঠিক মাপকাঠি নাও হতে পারেন। তা সত্ত্বেও তার বাহ্যিক আচরণের উপর নির্ভর করেই লোকে তার সম্পর্কে অভিমান পোষণ করবে। তবে তাকে সজ্জন মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন না কেন?

অষ্টম অধ্যায়ের সূত্র

স্বামীকে যেভাবে জনপ্রিয় করা যায় :

১। তাঁকে প্রিয় করে তুলুন—তার প্রতিভার প্রচার ঘটান। তাঁর শ্রেষ্ঠ দিকটি উন্মোচন করুন।

২। আপনি হয়ে উঠুন একজন দক্ষ সাংবাদিক। তাঁর দোষ প্রায় অদৃশ্য করে তাঁর সমস্ত গুণকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলুন।

নবম অধ্যায়
স্বামীর স্বাস্থ্য ও সম্পদ রক্ষা করুন

॥ বত্রিশ ॥
আয় বুঝে ব্যয় করুন

গল্প, উপন্যাস, সিনেমা নাটকে আনন্দ উৎপাদক অজস্র উপকরণ থাকে আমাদের কাছে তা আর অজানা নয়। সহজে আসা, সহজে যাওয়া গল্প উপন্যাসের স্বাভাবিক উপকরণ। সৌন্দর্য ও দায়িত্বহীনতা উপন্যাসে একই মাধুর্যে পাশাপাশি চলতে থাকে। কিন্তু সংসার জীবনটায় দারিদ্র্য আর আর্থিক অক্ষমতার মত মারাত্মক আর কিছুই নেই। যে লোক নিজের আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করে সে কখনই কৃতকার্য হতে পারে না—তিনি অবিবেচকের মত অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় নামেন। অমিতব্যয়ী স্ত্রীও স্বামীর কাছে বিরাট বোঝার মত।

পাঁচ কি দশবছর আগে এক ডলারের বদলে যা পাওয়া যেত আজকের দিনে তা পাওয়া যায় না। ডলারের দাম আজ অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। অথচ এই ডলার পেয়েই আগেকার মত সংসার চালানোর চ্যালেঞ্জ একজন গৃহিণীকে গ্রহণ করতে হয়। জিনিসপত্রের দাম যেমন বাড়ছে, জীবনধারণের ব্যয়ও তেমনই বাড়ছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালানোও ঢের বেশি কঠিন হয়ে পড়ছে। সাধারণ বিশ্বাস এই যে আয় বাড়লে আর এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। কিন্তু বলার কথাটা হল এই প্রত্যাশা কিন্তু সবক্ষেত্রে মোটেই ঠিক হয় না। কারণ এটা প্রমাণিত সত্য যে অতিরিক্ত আয় অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কানাডার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জনসাধারণদের কিভাবে ব্যয় করা উচিত, হাতে টাকা এলে যাতে উড়ে না যায়, সেইসব বিষয়ে নানা উপদেশ সম্বলিত পুস্তিকা বিতরণ করতে অভ্যস্ত।

বর্তমান বইটি লেখার প্রস্তুতির সময় একটি পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক মনস্তত্ত্বের বই আমার হাতে এসে পড়ে। লেখক মনস্তাত্বিক

ব্যক্তিটির এক বিশেষ দুর্বলতা ছিল—তিনি কোন পারিবারিক বাজেট বরদাস্ত করতে পারতেন না। তার মতে পরিবারের আয় ব্যয় কোন ঝামেলার ব্যাপার নয়। হাতে যখন প্রচুর টাকা থাকে তখন আমরা ইচ্ছামত খরচ করি—যখন তা থাকে না তখন সংযম করি।

আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে একমত যে তার পদ্ধতি বেশ সহজ। টাকা থাকলে খরচ করব, না থাকলে করব না। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই এই পদ্ধতিকে কোন ভাবেই সত্যিকার বুদ্ধিদীপ্ত অর্থনীতি বলে না। তাঁর উক্তির মধ্যে সুন্দর এক দুশ্চিন্তাহীন আমেজ আছে যা আমাদের গল্প উপন্যাসের খেয়ালী চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যতক্ষণ না আমরা তার কথার আসল অর্থ চিন্তা করতে শুরু না করি। পরিকল্পনা-হীন ব্যয়ের অর্থই হল আপনার আয় প্রায় সকলেরই ভোগে লাগছে। একমাত্র আপনি ছাড়া, মুচি, রুটিওয়ালা, মোমবাতি বিক্রেতা সকলেই আপনার আয়ের উপর নানাভাবে দখলীস্বত্ব কায়েম করছে। পরিকল্পনা আর ব্যয়ের মাধ্যমে আপনি ও আপনার পরিবারের মানুষ শুধু উপার্জিত অর্থের একাংশ ভোগ করতে পারছেন। বাজেটের অর্থ কিন্তু উদ্দেশ্য বিহীন ব্যয় বা চুলচেরা হিসাবের তালিকামাত্র নয়। এটা হল আপনার কাছে যে টাকা আছে বা আসছে তার সাহায্যে বেশি পরিমাণে জিনিস পত্র কেনার পরিকল্পিত এক কর্মসূচি। একটি সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা বাজেট আপনাকে আপনার ঈপ্সিত জিনিস কেনার সুযোগ এনে দেবে আর আপনাকে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সুযোগও দেবে। এর মাধ্যমে আপনার সংসার গড়ে উঠবে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হবে, অবসরের দিনগুলোয় আসবে নিশ্চিন্ততা—আপনার স্বপ্ন হয়ে উঠবে একসময় বাস্তব। বাজেট অনুযায়ী ব্যয় করলে আপনি কেনা-কাটার ব্যাপারে কোথায় হ্রাসবৃদ্ধি করা দরকার, কোন্‌টা বাদ দেওয়া উচিত, কোন্‌টার সংযোজন চাই, এসব সহজেই বুঝতে পারবেন। আপনি যদি বরাবর বাজেট সম্পর্কে সচেতন না হন, তাহলে বাজেটানুগ হওয়ার পদ্ধতিটি লিখে ফেলুন। কিভাবে পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করতে হয় তাও অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে আরম্ভ করুন।

আপনার স্বামীকে জীবনযুদ্ধে জয়ী করে তোলার ক্ষেত্রে আপনি যে মস্ত এক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন তা হল যতদূর সম্ভব তার আয় ব্যয়ের সাহায্যে চাহিদার সঙ্কুলান করা আর তাকে আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা। তিনি যদি টাকা আয় করার ব্যাপারে উদাসীন থাকেন আপনি তাহলে তার টাকার ব্যাগের শিকলে পরিণত হতে পারেন। টাকা পয়সার ব্যাপারে তিনি যদি আবার রক্ষণশীল হন তাহলে তাকে উৎসাহ দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার কাছাকাছি ব্যাঙ্কের নিশ্চয়ই নিজস্ব বাজেট থাকে বা এ বিষয়ে তাদের উপদেষ্টাও থাকা সম্ভব। তাহলে পারিবারিক বাজেট কিভাবে তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে তাদেরই সাহায্য নিন না কেন? তারা নিশ্চয়ই আনন্দের সঙ্গে আপনাকে পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করবেন না। বিনা খরচেই ব্যাঙ্ক আপনার সেবায় তৈরি থাকবে। এ ছাড়া আরও নানা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান থেকে পারিবারিক বাজেটের উপর নানা ধরণের পুস্তিকা বা বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। এই সব পাঠ করলে আপনি নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন। তবে সাবধান, প্রকাশিত কোন বাজেট অনুযায়ী নিজের বাজেট তৈরি করবেন না। গ্রহণীয় আর ঠিক ঠিক কার্যকর হওয়ার জন্য আপনার নিজস্ব বাজেট আপনাকেই তৈরি করতে হবে—আর সেটা করতে হবে আপনার নিজের সামর্থ্য ও প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেই। মনে রাখবেন কোন এক পরিবার ঠিক আর একটি পরিবারের মত হতে পারে না—দুটো কখনই এক নয়। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। আপনার অভাব, অভিযোগ, চাহিদা আপনার চেহারার মতই অন্যদের চেয়ে আলাদা।

এবার বাজেট সম্পর্কে আপনাকে কিছু ধারণা দিতে চাই। যেমন, তালিকা রাখুন:

১। আপনার টাকা কোথায় যাচ্ছে তা যদি বুঝতে না পারেন তাহলে খরচের একটা তালিকা রাখতে শুরু করুন। অনুসৃত পথের ত্রুটি যদি ধরতে না পারা যায় তাহলে কোনভাবেই অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব হবে না। কোথায় কিভাবে ব্যয় কমাতে হবে সেটা ধরতে না পারলেও খরচ কমানো যাবে না। অতএব কিছুদিনের জন্য

নমুনা হিসাবে একটা খরচের তালিকা তৈরি করে নিন। ধরা যাক সময় তিন মাস। আর্নল্ড বেনেট আর জন ডি. রকফেলার এই ধরণের বাজেট অনুসরণ করতেন। আমিও সেই পথ অনুসরণ করে থাকি। যদিও আমি চেকের মাধ্যমে বিলের টাকা মিটিয়ে দিই, তা সত্ত্বেও আমি প্রত্যেক মাসে একটা ব্যয়ের তালিকা তৈরি করে ফেলি। বছরে মোট একটা দিনই ঘরের কাজ করি। ফলে বছরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কত হল, কোন্ খাতেই বা কত, তার সবই আমি বলতে পারি। এর ফলে যদি দেখি খরচ বেড়ে যাচ্ছে তাহলে সেটা নিয়ন্ত্রণও করতে পারি। এটা করার সত্যিই দরকার আছে। কোথায় আপনার টাকা যাচ্ছে একবার বুঝতে পারলেই হল। ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্যয়ের তালিকা হাতের কাছে রাখি। যদি আমার সন্দেহ হয় যে পোশাকের ক্ষেত্রে টাকা বেশি ব্যয় হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গেই বাজেটের রেকর্ডে চোখ বুলিয়ে নিই। তাতেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়।

আমি এক দম্পতির কথা জানি, যারা এইভাবে আয়ের আর ব্যয়ের হিসাব রাখতে শুরু করেন আর বেশ অবাক হয়েই দেখতে পান যে একটি মাসের জন্য তাদের প্রায় ৭০ ডলার ব্যয় হচ্ছে। হিসাব দেখার পর তারা ঠিক করেন টাকাটা তারা এবার অন্য কাজেই ব্যয় করবেন।

২। আপনার পরিবারের প্রয়োজনের দিকে নজর রাখার বাজেট তৈরি করুন :—বছরের যে সব ব্যয় নির্দিষ্ট, যেমন বাড়ি ভাড়া, ধার শোধ, জিনিসপত্র কেনাকাটা, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদির হিসাব রাখা চাই। পারিবারিক বাজেটের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে জটিলতার দিক। বাজেটের এই দিকের সিদ্ধান্তে, পারিবারিক সহযোগিতা আর আত্মত্যাগের প্রশ্ন জড়িত। সবকিছুই আমাদের পক্ষে পাওয়া সহজ নয়। তবে কোন্ কোন্ জিনিস অতি জরুরী আর কোন্গুলো পরে হলেও চলে তা আমরা ঠিক করতে পারি। এইসব সিদ্ধান্ত কেমন জানেন? যেমন ধরুন, আপনি তেমন ভাল বাড়ি পছন্দ করেন না, অথবা জমকালো কাপড় পছন্দ করেন। লণ্ড্রীতে কাপড় পাঠাতে চান না বরং বাড়িতে কম খরচে কাপড় কাচার পর পয়সা জমিয়ে টেলিভিসন

কিনতে চান। স্পষ্টতই এগুলো হচ্ছে আপনার পরিবারের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়। মনে রাখবেন, চটজলদি? কোন বাজেটে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা থাকে না।

৩। বার্ষিক আয়ের দশভাগ যেন পরিবার পায় :—একটা কৌশল সকলের পক্ষে বেশ কার্যকর। সেটা হল নিজেকে আর পরিবারকে পাওনাদার বলে ভাবতে থাকা। এই জন্যই কমপক্ষে আপনার আয়ের দশভাগ সঞ্চয় করান বা বিনিয়োগ করুন। আপনি গাড়ি কিংবা বাড়ির জন্য একটি তহবিল গঠন করলেও অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, আপনি যদি স্বামীর আয়ের দশভাগ সঞ্চয় করতে সক্ষম হন তাহলে সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও খুব বেশি বছর লাগবে না। আমি জনৈক কৃপণ আমেরিকান ভদ্রলোকের কথা জানি। ভদ্রলোকের নীতি ছিল যেমন করেই হোক আয়ের দশভাগ তিনি বাঁচাবেনই। এজন্য তার যত রকম অসুবিধাই হোক তিনি তা সহ্য করতেন। তার স্ত্রীর কাছে শুনেছি একবার মন্দার সময় তাদের বেশ কষ্টেই দিন কাটাতে হয়। ওই সময় তার মাইনে বেশ কমে যায়। মহিলাকে তখন বেশ সতর্কতার সঙ্গে সংসার চালাতে হয়, ব্যয় সঙ্কোচও করতে হয়। তাকে সংসারের প্রতিটি জিনিস কিনতে গিয়ে দরাদরি করতে হত। অন্যদিকে তার স্বামী বাসভাড়া বাঁচানোর জন্য রোজ অনেকটা পথ হাঁটতেন। মাঝে মাঝে ভদ্রলোকের স্ত্রী ওই দশভাগ সঞ্চয়ের কথায় রেগে যেতেন, কারণ এত কষ্ট তবু সঞ্চয়! ভদ্রমহিলা বলেন আজ তিনি তাঁর স্বামীর প্রতি সত্যিই কৃতজ্ঞ কারণ সেসময় ওই সঞ্চয় করেছিলেন। ভদ্র মহিলা বলেন আজ তার কাছে সেদিনের সঞ্চয় নিজস্ব ঘরে পরিণত হয়েছে।

৪। দুর্দিনের জন্য তহবিল :—অধিকাংশ বাজেট বিশেষজ্ঞ এই পরামর্শ দিয়ে থাকেন যে তিন মাসের সমপরিমাণ অর্থ দুর্দিনের জন্য সঞ্চিত রাখা একান্ত প্রয়োজন। জরুরী বা এমার্জেন্সী ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্টেই এই টাকা রাখা যায়। তাঁদের মতে একাজ প্রত্যেকেরই করা উচিত। অবশ্য তারা এমন কথাও বলেন যে উন্মত্তের মত আবেগে

সঞ্চয় করা একেবারেই অনুচিত। অযৌক্তিকভাবে সঞ্চয় করতে থাকলে বহু জরুরী কাজে ঘাটতি দেখা দেয়, কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হওয়ার অবস্থা এসে পড়ে। একসঙ্গে অনেক টাকা সঞ্চয় না করে বরং অল্প অথচ নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করতে শুরু করলে সঞ্চয়ের আনন্দ উপভোগ করা যায়—আর পরিবারের আর্থিক অনটনও থাকে না।

৫। বাজেটকে পারিবারিক উদ্যোগ করে তুলুন :—উপদেষ্টারা মনে করেন যে পারিবারিক বাজেট তৈরি করার কাজে পরিবারের প্রায় সকলেরই সহযোগিতা আর উৎসাহ থাকা একান্ত দরকার। মাঝে মাঝে পরিবারের সদস্যরা বাজেট বৈঠকে উপস্থিত থেকে নানা আবেগময় অভিযোগের সমাধান ঘটাতে পারেন। এতে অনেক সুরাহা হবে। টাকা পয়সা সম্পর্কে সব মানুষের ধারণা কখনও এক রকম হয় না। অভিজ্ঞতা, রুচি, মানসিক প্রবৃত্তি ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে টাকা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। একথা সত্যি যারা এসম্পর্কে ভাবেন তারাই বলবেন, এটা পরীক্ষিত সত্য।

৬। জীবনবীমা মুখী হয়ে উঠুন :—মেরিয়ান স্টিভেন্স হলেন ইনস্টিটিউট অব লাইফ ইন্স্যুরেন্সের মহিলা বিভাগের পরিচালিকা। সুতরাং বীমা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর উপর অতুলনীয় দক্ষতায় তিনি আলোচনা করতে পারতেন। আসলে ভদ্রমহিলার বীমা সম্বন্ধে বিপুল অভিজ্ঞতা ছিল। এ সম্পর্কে আলোচনা করার সময় মিসেস স্টিভেন্স গৃহিণীদের কিছু প্রশ্ন করা উচিত বলে মন্তব্য করেন। প্রশ্নগুলো এই রকম : যেমন, আপনি কি জানেন জীবন বীমার পলিসি গ্রহণ করলে আপনার পরিবারের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে কোনগুলো পূরণ করতে হবে? আপনি কি জানেন স্থায়ী ও অস্থায়ী পলিসির মধ্যে পার্থক্য কোথায় আর দুটোই বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক? আপনি কি জানেন যে আধুনিক জীবন বীমার লক্ষ্য হল দুরকম। যেমন যদি বীমাকারী অপ্রত্যাশিতভাবে মারা যান তাহলে সম্পাদিত বীমাচুক্তি তার পরিবারকে রক্ষা করবে, আর যদি তার অকালে মৃত্যু না হয় তবে বার্ধক্যের সময় ওই টাকা তার জীবনে মূলধনের রূপ নিয়ে আসবে?

এই ধরণের আরও নানা প্রশ্নই আপনার পরিবারের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয়। এই সব প্রশ্নের উত্তর কেবল আপনার স্বামীর জানা থাকলেই চলবে না। পরিবারের অন্যতম পরিচালিকা হিসেবে আপনারও এসব জানা থাকা দরকার। ঈশ্বর না করুন কোনভাবে আপনাকে একাকী থাকতে হলে এই সব জ্ঞান আপনাকে বিপদ সঙ্কুল দিনগুলিতে যথেষ্ট ভাবে দুশ্চিন্তা মুক্ত করবে।

'বিল্ডিং সাকসেসফুল ম্যারেজ' নামক গ্রন্থে লেখক জুডিমন ও মেরী ল্যাভিস মন্তব্য করেছেন যে পরিবারের ব্যয় সংক্রান্ত কাজে স্বাভাবিক ভাবেই বিবাহিত জীবনের খাপ খাওয়ানোর প্রশ্নটি জড়িত হয়ে পড়ে। টাকাই যে সব কিছু নয়, এটি অতি সত্য। কিন্তু কিভাবে আমরা নিজের নিজের উপার্জন দূরদৃষ্টির সঙ্গে ব্যয় করব তা জানার উপরেই আমাদের মনের সুখশান্তি, স্বামী আর পরিবারের মঙ্গল ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বর্তমানকে না মেনে মাঝে মাঝেই বলে ফেলেন অমুক লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারত কিন্তু হয়নি, ওই লোকটির মত আমার স্বামীও যদি বিরাট অঙ্কের মাইনে পেত ! এই ধরণের অভিলাষ পোষণ করে বৃথা সময় আর রূপ নষ্ট না করে আমাদের উচিত স্বামী যা উপার্জন করছেন তাই ব্যয়ের ব্যাপারে অনেক সতর্ক আর সুবিবেচক হয়ে ওঠা। তাই নিচের নিয়মগুলো মেনে চললে বিশ্বাস রাখি সেটা হওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব। নিয়মগুলো এই রকম :

১। একটি বাৎসরিক বাজেট তৈরী করে ফেলুন।

২। আপনার আয়ের দশভাগ সঞ্চয় করুন।

৩ দুর্দিনের জন্য একটা তহবিল তৈরি করুন

৪। বাজেটকে পারিবারিক বিষয় করে তুলুন।

৫। জমানো সম্পর্কে সজাগ থাকুন।

হিন্দু শাস্ত্রে, আয়ের অর্দ্ধেক সঞ্চয় করতে বলে
Save half i.e. 50% of your Income.

॥ তেত্রিশ ॥

স্বামীর জীবন আপনারই হাতে

অকাল মৃত্যুর হাত থেকে কিভাবে স্বামীকে রক্ষা করবেন :

আপনার স্বামীকে হত্যা করতে হলে অস্ত্রশস্ত্র বা রিভলবারের দরকার নেই। তাকে একনাগাড়ে মেদবহুল আর শর্করা জাতীয় খাদ্য বহুদিন ধরে খেতে দিন। অন্ততঃ তার শরীরের ওজন পনেরো থেকে বিশগুণ না বাড়া পর্যন্ত নিষ্ঠাভরেই কাজটি করে চলুন। একবার ভাবুন এবার স্বামীর অবর্তমানে কি রকম ঘটতে পারে। কথাগুলো কেন বললাম শুনবেন? তবে শুনুন। পুরুষদের অকাল মৃত্যুর জন্য এই অতিরিক্ত খাওয়ার ব্যাপারটা অনেকটাই দায়ী। আর সেজন্য স্ত্রীদের দোষী করা যায় অনেকক্ষেত্রেই। বিশেষজ্ঞদের মতে অনেক পুরুষই পঞ্চাশ বছরের ওদিকে? মারা যান। এই অকালমৃত্যুর হার স্ত্রীদের তুলনায় শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ বেশি।

দুঃখের বিষয় হলো বেশির ভাগ পুরুষই এজন্য মহিলাদের দায়ী করতে চান। মেট্রোপলিটান লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর ডঃ লুইস আই. ডাবলিন এই প্রসঙ্গে কি বলেন শুনুন। একখানি সাময়িকপত্রে তিনি লিখেছেন : 'আপনার স্বামীকে হত্যা করবেন না' নামে একটি প্রবন্ধ। তাতে তিনি বলেছেন, 'একটি বিরাট বীমা প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান প্রধান হিসেবে কাজ করে চল্লিশ বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি জেনেছি যে যারা অকালমৃত্যু বরণ করেন তাঁদের স্ত্রীরা অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীদের জীবনরক্ষা করতে পারতেন যদি তারা নিষ্ঠার সঙ্গে সহধর্মিনীর দায়িত্ব পালন করতেন।' ডঃ ডাবলিনের পক্ষে এই তথ্য মানা স্বাভাবিক। কারণ তিনি দেহের ওজন বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার সম্পর্কে তুলনামূলক বিশ্লেষণ আর অধ্যয়ন করেছেন। তিনি এই বিষয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের একজন। নিউইয়র্কে মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে সহযোগী চিকিৎসক ডঃ হার্বার্ট পোলক 'টু ডেজ

উইম্যানে' প্রকাশিত 'হোয়াই হাজব্যাণ্ডস উই টু ইয়ং' নামক প্রবন্ধে বলেন, 'স্বামীকে সুস্থ রাখার জন্য আপনার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে তার পরমায়ু বৃদ্ধি করতে পারে। এই মুহূর্তে আপনার স্বামীর পরমায়ু বৃদ্ধির ক্ষমতা আপনারই হাতে রয়েছে।'

প্রত্যেকেই চায় দীর্ঘজীবি হতে। পরমায়ুর প্রত্যাশা প্রত্যেকেরই। স্বামীর ওজন যদি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় তাহলে সে সম্ভাবনা কিন্তু অনেকটাই কমে যায়। আমেরিকার ওহিও রাজ্যের ক্লিভল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত এক চিকিৎসা বিষয়ক সম্মেলনে এই মন্তব্য করা হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

ক্যারিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক চিকিৎসকের ভাষায় যুদ্ধ বিগ্রহ সত্ত্বেও সাদা চামড়ার মানুষ বন্দুকের গুলি বা অস্ত্রের আঘাতে যত না মারা যায় তার চেয়ে ঢের বেশি মারা যায় কাঁটা ছুরি, চামচের আঘাতে অর্থাৎ মাত্রা ছাড়া খাওয়ার ফলে।

স্বামীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমরা আমাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না। অধিকাংশ লোকই বার্ধক্যকে ভয় পান, অথচ প্রয়োজনে অল্প আহারও করে থাকেন। বার্ধক্যে সাধারণভাবেই কায়িক পরিশ্রম শক্তি কমে যায়। স্বামীকে তাই দীর্ঘজীবি করতে হলে আমাদের উচিত খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কড়া নিয়ম কানুন মেনে চলা। অল্প ক্যালোরী কিন্তু কর্মশক্তি বাড়াতে পারে এমন খাদ্যই নির্ধারণ করা হয়ে চলেছে স্বামীর আয়ুষ্কাল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। এছাড়াও প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে দেরী করবেন না। তিনিই আপনাকে এই ব্যাপারে সুপরামর্শ দিতে পারেন। তবে এটা ঠিক তিনি যা বলবেন তা হল কোন্ জাতীয় খাদ্য খেলে বা বর্জন করলে আপনার স্বামীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে আর তিনি কর্মক্ষম অবস্থায় দীর্ঘজীবি হতে পারবেন। অর্থাৎ তার ওজন হ্রাস পাবে, কর্মশক্তি বাড়বে।

ডঃ ইউজিন হোয়াইটহেডের মতে প্রথমত চর্বিযুক্ত খাবার বর্জন করতে হবে। তাঁর মতে দৈনিক তিনবার যে খাদ্য গ্রহণ করা হয় তার পরিমাণ সমান হওয়া দরকার। তিনি আরও মনে করেন যে

প্রতিবারের খাদ্যে সমপরিমাণ সব রকম প্রোটিন থাকা চাই-ই। লক্ষ্য রাখবেন যেন ঘরে তৈরি করা খাদ্য অনুত্তেজক হয়।

ডঃ রবার্ট ভি, সেনিগার একজন খ্যাতনামা মনস্তাত্ত্বিক। তিনি বাল্টিমোর সাইক্যাট্রিকন ইনষ্টিটিউটের প্রধান সাইকিয়াট্রিস্ট। তিনিও এই বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। তার কথা হল যদি দরকার হয় খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হবে। এই সময় স্বাস্থ্যকর প্রাতরাশই চাই আপনার স্বামীর জন্য।

আমার একজন বান্ধবী এই রকম সকালে শয্যাত্যাগ করার ফলে চমৎকার ফল পেয়েছেন। মহিলার নাম মিসেস ক্লার্ক ব্রাইনস।

মিঃ ব্রাইনস-কে প্রত্যেকদিনই তার ব্রিফকেসে ভরে প্রচুর কাগজ-পত্র বাড়িতে আনতে হত। তিনি বাড়িতে ওই সব কাগজপত্র দেখতেন। কিন্তু তিনি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন যে বিকেলের দিকে তার কাজ করতে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। মিসেস ব্রাইনস স্বামীকে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে আর সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। পরামর্শ মত কাজ করার পরেই দেখা গেল তাতে চমৎকার ফল হয়েছে। স্বামীর ক্লান্তি আর থাকেনি। এখন তাই তাদের সকালে তাড়াহুড়ো করে প্রাতরাশ সারতে হয় না। কোন ব্যস্ততাই আর নেই। হাতে সময় থাকায় স্বামী প্রাতরাশ সারার পর ধীরে সুস্থেই তার কাগজপত্র পড়ে নিতে পারেন।

আপনিও যদি এই রকম ব্যস্ত মানুষ হন তাহলে খুব সকালে শয্যা ত্যাগ করার অভ্যাস করুন, তাতে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন এটা বলতে পারি।

এই সব কারণেই স্বামীকে দীর্ঘজীবি ও কর্মক্ষম স্বাস্থ্যেভরপুর রাখতে গেলে কিছু নিয়ম পালন অভ্যাসে পরিণত করুন।

নিয়মগুলি এই রকম :

১। স্বামীর শরীরের দিকে নজর রাখুন। তার দেহের ওজনের হেরফের লক্ষ্য রাখা চাই। কোন বীমা কোম্পানীকে বিশেষ চার্ট পাঠানোর অনুরোধ করুন। সেই চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে আপনার স্বামীর

ওজন পরীক্ষা করে দেখবেন। লক্ষ্য রাখবেন তার ওজন ১০ ভাগের মত মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়েছে কি না। এ রকম দেখলেই চিকিৎসকের সাহায্য ও পরামর্শ নিতে দেরী করবেন না। তার মত অনুযায়ী স্বামীর খাদ্য তালিকা বানিয়ে নেবেন।

তাকে কখনই পেটেন্ট ওষুধ খেতে দেবেন না। ওজন কমানোর ওষুধ কখনই না, একমাত্র ডাক্তারের পরামর্শ মতই চলবেন। ডাক্তার যে খাদ্য তালিকা দেবেন তাই আকর্ষনীয়ভাবে আপনার স্বামীকে দিন ও ডাক্তারের সহযোগিতা করুন। এই সব খাদ্যই মনে রাখবেন সকলের উপকারী। বারবার এই কথা বলে কখনই কিন্তু আপনার স্বামীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবেন না। বরং দেখবেন যে খাদ্য স্বামীকে দিচ্ছেন তা যেন সুস্বাদু ও দেখতে লোভনীয় হয়।

২। বাৎসরিক ডাক্তারী পরীক্ষা :

স্বাস্থ্যবান থাকার শ্রেষ্ঠ পথ হল রোগ প্রতিরোধ করা। এটাই ওষুধ। প্রাথমিক পর্যায়ে যদি রোগ ধরা পড়ে তাহলে হৃৎযন্ত্রের পীড়া, ক্যান্সার, যক্ষ্মা, ডায়াবিটিস ইত্যাদি রোগ থেকে মৃত্যুহার অবশ্যই কমে যাবে। আমেরিকার ডায়াবিটিস রোগ সংক্রান্ত গবেষণা সমিতির পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় বিশ লাখের মতই ডায়াবিটিস রোগী আছেন। আশ্চর্য ব্যাপার হল এদের অর্ধেকেরও বেশি জানেন না তারা ডায়াবিটিস রোগে আক্রান্ত। দুঃখের কথা হল যে অনেক লোক মোটর গাড়ির যত্ন করেন, অথচ নিজের শরীরের যত্ন নিতে চান না। অতএব লক্ষ্য রাখা দরকার আপনার স্বামী যথারীতি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন কি না। চোখ, কান, গলা, বুক ইত্যাদি নিয়মিত পরীক্ষা করানো অত্যন্ত দরকার।

৩। স্বামীকে বেশি কাজ করতে দেবেন না :

অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে বহু লোকেরই। সবাই চায় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত আর কৃতকার্য হতে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অনেকদিন বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই। তখন চাকরিতে উন্নতির অর্থ হবে দেহমনের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ। এই কারণেই আপনার স্বামী

অতি উচ্চাভিলাষী হয়ে থাকলে তাকে বেশি পদোন্নতি প্রত্যাখ্যান করার মত সাহসী করে তুলুন। প্রকৃত অবস্থা এই যে আমেরিকানরা আজকাল বিভিন্নভাবে' উত্তেজনার এমন শিকার হয়ে পড়ে যে ধর্মকথা? শোনার অবকাশ তাদের আর নেই।

সুতরাং বেশি আয় করার অর্থ যদি স্নায়ুর উত্তেজনা, অশান্তি আর অকালমৃত্যুর কারণ হয় তাহলে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পথটি হবে অল্প আয়েই সন্তুষ্ট থাকা। স্বামীকে তাই উত্তেজনা মুক্ত রাখুন আর দীর্ঘজীবি করার কাজ করুন। স্বামী যদি বেশি পরিশ্রম আরম্ভ করেন তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করুন আর অল্পে সন্তুষ্ট থাকার জন্য অনুপ্রেরণা দিন। অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীর মনোভাবের উপরেই স্বামীর সাংসারিক প্রচেষ্টার গতিধারা বহুলাংশে নির্ভর করে। তাই স্বামীর উপর প্রতিক্ষেত্রে প্রভাব খাটাতে শুরু করুন।

৪। পরিমিত বিশ্রাম :

লক্ষ্য রাখবেন স্বামী যেন প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্রামের সুযোগ পান। অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করার সবচেয়ে সেরা উপায় হল ক্লান্ত হওয়ার আগেই বিশ্রাম নেওয়া। সামান্য বিশ্রাম আশ্চর্যজনক ফল দেয়। দুপুরে মধ্যাহ্নে ভোজের পর অন্ততঃ ১০ কি ১৫ মিনিট যদি বিশ্রাম করতে পারেন আর তারপর কাজ শুরু করেন, চমৎকার উপকার হবে।

এছাড়া নৈশভোজের আগে স্বামীকে সামান্য ঘুমিয়ে নিতে বলতে পারেন। এর ফলে চমৎকার উপকার হয়ে আয়ু বৃদ্ধির ব্যবস্থা হবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সেনাবাহিনীতে মার্চ করার পর সৈন্যদের ১০ মিনিট বিশ্রাম নিতে দেওয়া হয়। ৭০ বছর বয়সের পরেও বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক সমারসেট মম কর্মক্ষম ছিলেন। মম বলেছেন প্রত্যেকদিন আহারের পর ১৫ মিনিট ঘুমিয়ে নেওয়াই তার জীবনীশক্তির গোপন রহস্য। দুপুরে খাওয়ার পর ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতেন। এরকম আরও বহু উদাহরণ নানা বিখ্যাত মানুষের জীবন থেকে দেওয়া যায়।

৫। পারিবারিক জীবন সুখী রাখুন :

ঘ্যানর ঘ্যানর বা খুঁত খুঁত করা বা সর্বদাই কোন না কোন বিষয়ে অভিযোগ করা স্ত্রী স্বামীর অগ্রগতির প্রতিবন্ধক কথাটা মনে রাখা ভাল। কারণ, স্ত্রীর আচরণ স্বামীর মন ভারাক্রান্ত করে তোলে আর তিনি কাজে ভালভাবে মনোনিবেশ করতে ব্যর্থ হন। এই ধরণের স্ত্রীরা স্বামীর স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে ওঠেন।

দুঃখ ভারাক্রান্ত কিংবা ক্রোধের বশবর্তী মানুষ সাধারণতঃ দুর্ঘটনা প্রবণ হয়ে থাকেন। মনের দিক থেকে তারা অবরুদ্ধ হয়ে থাকায় তাদের স্নায়ু তেমন জোরালো ভাবে কাজ করতে পারে না। এই ধরণের মানুষ অনেকসময় পথেঘাটে গাড়ি চাপা পড়তে পারেন, অন্যদেরও ক্ষতির কারণ হন। কারখানায় কাজ করলে তারা মেশিনের দুর্ঘটনাতেও জড়িয়ে পড়তে পারেন। এই ধরণের মানুষের জীবন বেশ ঝুঁকির আর দুঃখেরও হতে পারে। এই ধরণের লোকেরা আবার মানসিক অশান্তি কাটানোর জন্য খাওয়া সম্বন্ধে খেয়াল করেন না, তারা অমনোযোগী হয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হ্যারী গোল্ড এই মত পোষণ করেন।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে সফলতার বৃহত্তম দিক হল জীবনকে উপভোগ করার ক্ষমতা। পছন্দ করি বা না করি আমাদের স্ত্রীদের স্বামীর দৈহিক ও মানসিক মঙ্গল বিধান করার দায়িত্ব নিতেই হবে। 'আমার জীবন তোমারই হাতে' যেকোন মানুষের জীবন সঙ্গীত হতে পারে।

নবম অধ্যায়ের সূত্র

কিভাবে স্বামীর স্বাস্থ্য ও সম্পদ রক্ষা করবেন

১। আয় অনুযায়ী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হোন।

২। নিজের স্বাস্থ্যের মত স্বামীর স্বাস্থ্যেরও যত্ন নিন আর লক্ষ্য রাখুন: (ক) তার ওজনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে কিনা। (খ) রীতিমত স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছে কি না। (গ) তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে কি না। (ঘ) তিনি যথেষ্ট বিশ্রাম পাচ্ছেন কি না। (ঙ) তার পারিবারিক জীবনে শান্তি আছে কি না।

।। চৌত্রিশ ।।

আসুন ভালবাসার মান উন্নত করি

নিউইয়র্ক সিটি ইউথ হাউসের সেক্রেটারি মিঃ ইয়েল এইচ উইলার্ড ম্যাসাচুসেটস-এ অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে কিশোর অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে শিশুর প্রতি ভালবাসার অভাববোধ। শিশু যখনই ভাবতে শুরু করে যে কেউ আমাকে ভালবাসেনা তখন তার প্রবণতার বিকৃতি ঘটতে চায় আর সে অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হতে শুরু করে।

ওকলাহোমা অঙ্গরাজ্যের ফেডারেল রিফরমেটরীতে কিশোর কয়েদীদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যে শিক্ষণ ব্যবস্থা আছে তাতে কাজ করার সময় আমি ও আমার স্বামী এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।

এই সব হতভাগ্য কিশোরদের জন্য গভীর ভালবাসা আর মমত্ববোধের অভাবই প্রধান সমস্যা বলে মনে হয়। আমাকে একটি কিশোর জানিয়েছিল যে তার মা কখনও তার চিঠিপত্রের জবাব দিত না। ছেলেটি যখন তার মাকে জানাল যে সে জেলখানার একটি কোর্সে যোগ দিয়েছে আর তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটছে, তখন তার মা চিঠির জবাব দেন। এই চিঠিতে তার মা জবাবে লেখেন যে কিছুতেই তার কিছু হওয়ার নেই, তাকে জেলেই থেকে যেতে হবে।

'১৯ বছর বয়সী টমী একজন কিশোর অপরাধী। জেলখানায় সে ১০ বছরেরও বেশি কাটিয়েছে, সঙ্গে রিফরমেটরীতেও। সে বলে, আমার যা প্রয়োজন তা হল আমাকে স্নেহ, মায়া, মমতা ভালবাসা দেবে এমন কেউ। কেউ আমাকে কখনও কামনা করেনি, ভালবাসেনি এত বয়স হওয়া পর্যন্ত। কেউ বড়দিনে আমাকে সামান্য উপহারও দেয়নি।'

আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই যেসব ছেলেমেয়েদের স্নেহ মমতা

বঞ্চিত করে রাখা হয় তারা শেষ পর্যন্ত অপরাধের কাজে লিপ্ত হবেই। বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ কর্মে জড়িয়ে পড়েই তারা স্নেহ মমতার ঘাটতি পূরণ করতে চায়। খাদ্য না পেলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেমন অখাদ্য খেতে অভ্যস্ত সেই রকমই সহানুভূতি বঞ্চিত কিশোর কিশোরীরাও যেন ওই রকম খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে।

ভালবাসার উপরেই আমাদের সমস্ত উদ্যম, অনুভূতি, আর জীবনী শক্তি নিয়ে আমরা টিকে থাকি। ভালবাসাকে আশ্রয় করেই এই সব গড়ে ওঠে আর ভালবাসার অভাবেই আবার আমাদের মানসিক সুকুমার কোমল প্রবৃত্তি যেন শুকিয়ে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডব্লিউ, অলপোর্ট মনে করেন যে কেউ যদি ভাবতে পারে 'আমি অকৃত্রিম ভালবাসা পাচ্ছি আর নিজেও ভালবাসতে পারছি' তাহলে এই পরিতৃপ্ত অনুভূতিতে স্বাভাবিক দেহ-মন নিয়ে একজন মানুষকে বিখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে।

মানবজীবনে প্রেম হল পরমাণু শক্তির মত। ভালবাসা ও প্রেম অলৌকিক ব্যাপার ঘটাতে পারে, এমন কি ঘটিয়েও চলেছে। স্বামীর জীবনে আপনার ভালবাসার গুরুত্ব অত্যন্ত মৌলিক। আপনার ভালবাসা অকৃত্রিম বলে আপনি স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যবিধান আর তার কৃতকার্যতার অন্তরায়গুলো দূর করে দেওয়ার জন্য মনে প্রাণে অনুপ্রাণিত হবেন।

স্বামীর প্রতি আপনার ভালবাসা সন্তানদের মঙ্গল বিধানের কাজেও প্রভাব ফেলবে।

এখন বলছি আমরা কিভাবে ভালবাসার মান উন্নত করতে পারব। কিছু পরামর্শ এখানে উল্লেখ করছি :

১। ভালবাসার দৈনন্দিন প্রকাশ :

একবার আমার স্বামীর কাছে জনৈকা মর্মাহত সদ্য বিধবা মহিলা একখানা চিঠি লেখেন। চিঠিতে মহিলাটি অনুতাপ করে লেখেন যে তিনি তার স্বামীকে যে কত গভীরভাবে ভালবাসতেন আর তার জীবন

কত অপরিহার্য ছিল, অথচ তার স্বামী সেকথা কোনদিনই জানতে পারেন নি আর পারবেনও না। সেদিন যে ফিরে আসবে না।

মহিলার জীবনের ওই ঘটনা কি অস্বাভাবিক কিছু? দুর্ভাগ্যক্রমে মোটেই না। পনেরো শ'র বেশি বিবাহিত ব্যক্তির উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভালবাসা প্রকাশের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পুরুষরা খুঁত খুঁত স্বভাবের স্ত্রীদের কাছে দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যর্থ হয়েছেন। ডঃ লুই এম. টারম্যান ও তার সহকর্মীরা এই সমীক্ষা চালান।

অনেক মহিলাই সংকটের সময় মহৎ ভূমিকা পালনের যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু স্বামীকে প্রাত্যহিক জীবনের মুহূর্তগুলো ভালবাসায় পূর্ণ করে তুলতে ব্যর্থ হন। অথচ ভালবাসাই দাম্পত্য জীবনের মূল কথা। স্বামী চাকরি হারাতে পারেন, নানা কঠিন রোগে আক্রান্ত হতে পারেন, এমন কি কোন কারণে জেলে যেতেও পারেন, তাই নগন্য স্ত্রীর অবদান তার কাছে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জীবন যখন স্বাভাবিকতার পথ ধরে চলতে থাকে তখন স্ত্রী এত বেশি উদাসীন বা ব্যস্ত থাকেন যে স্বামীকে তার জীবনে কতখানি প্রয়োজন তা জানাবার অবকাশ পান না।

একবার মাত্র ভেবে দেখুন যে মহিলারা নিরাপত্তা, সন্তানলাভ, নিজের সংসার পরিচালনা, বার্ধক্যে ঠিকা ঝিতে পরিণত না হওয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, অথচ সেক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ৮০ কি ৯০ জন পুরুষ বিয়ে করেন শুধুমাত্র ভালবাসা ও প্রেমের তাগিদেই।

তবুও ৯০ ভাগ মহিলাই মনে করেন যে তাদের খোশামোদ করাই পুরুষের কর্তব্য। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, যেসব মহিলা স্বামীকে ভালবাসেন না, স্বামীর অবহেলা অসহ্য, স্বামী তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেননা বলে ভাবেন বা অভিযোগ করেন তারা নিজেরাই ভালবাসা ও প্রশংসার আসল মূল্যটি জানেন না। সমালোচনা করে ত্রুটি আবিষ্কার করাটাই তাদের অভ্যাসে পরিণত। ডঃ উইলিয়াম মিনেজার বলেন যে ওই ধরণের মানসিকতার মহিলারা নিজেকে এতবেশি ভালবাসেন যে অন্যদিকে তাকানোর বা অন্যকে ভালবাসার

অবকাশই তাদের থাকে না। অন্যদিকে যেসব মহিলা ভালবাসার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ও উদার তারা স্বামীর কাছ থেকে অপরিসীম ভালবাসা লাভ করেন।

বিয়ের সম্পর্কের ওপর বিশেষজ্ঞ ডরোথি ডিক্স যে মন্তব্য এ সম্পর্কে করেন তার উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন 'স্ত্রীদের সর্বক্ষণের অভিযোগ এই যে স্বামী সম্মান দেখান না। নানা ভাবেই অসম্মানের বোঝা তাকে বহন করতে হয়, স্ত্রীর খাওয়া পরার দিকে নজর দেন না, স্বামীর আচরণে সামান্য ভালবাসার চিহ্ন ফুটে ওঠে না। কিন্তু অভিযোগ-কারিণী স্ত্রী নিজেই যে এই ধরণের নিষ্প্রাণ আচরণ করেন আর দেখে আশ্চর্য হন, তার স্বামী কোন সুন্দরী মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছেন এবং সেই মহিলা তার স্বামীর নানা প্রশংসা করে চলেছেন। হৃদয় এবং এই ভালবাসা শুধু যে স্ত্রীদেরই একচেটিয়া প্রাপ্য নয়, এই সব মহিলার সেটা বোঝা দরকার। তাদের জানা উচিত স্বামীরাও ভালবাসার কাঙাল।

কোন কোন স্ত্রী আবার স্বামীর এই দিকটির সুযোগ নেন। কোন কিছু চাইলে তারা সেটা না পাওয়া পর্যন্ত স্বামীকে ভালবাসায় বঞ্চিত করেন। মেরীল্যাণ্ড আপীল আদালতের কোন মামলায় বিচার্য বিষয় ছিল স্বামীর মাইনের যত টাকা স্ত্রী দাবী করবেন সেটা না পাওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর বাক্যালাপ বন্ধ করার আইনতঃ অধিকার আছে কি না! আদালত স্ত্রীর দাবী বাতিল করে অভিমত প্রকাশ করে যে স্ত্রী ভালবাসার উপর কোন আর্থিক মূল্য আরোপ করতে পারেন না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার অভাবকে কেউ একবার 'খাদ্যাভাব' বলে উপমা দিয়েছিলেন। উপমাটা যে চমৎকার তাতে সন্দেহ নেই। কারণ কোন পুরুষ কেবল মাত্র রুটিই খাননা, তার কেক খাওয়ার প্রয়োজনও থাকে; আর এই কেক খাওয়ার ব্যাপারটা চাই কিছু সময় অন্তর।

১। সুরসিকা হয়ে উঠন :

অনেক স্ত্রী আবার সম্পূর্ণ দক্ষ হওয়ার মানসিকতার শিকার হয়ে থাকেন। যেমন তারা চান তাদের ছেলেমেয়েরা অবশ্যই ভদ্র হবে, রান্নাবান্নার কাজ কর্মে কোন ত্রুটি থাকবে না, পরিবেশনের কাজ সুচারু

হবে, বাড়িটি ঝকঝকে থাকবে। যারা এমন ধরণের নিপুনতার ভক্ত, তারা তুচ্ছ নগন্য বিষয়ে এত বেশি মনোযোগ দিতে বাধ্য হন যে আসল ব্যাপারে মন দেওয়া তাদের পক্ষে নেহাত কঠিন বা অসম্ভব হয়ে যায়। মনে রাখা চাই সব ব্যাপার সহজভাবে, হৃষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারলে, হতাশায় না ভুগে বরং সব সরলভাবে মানিয়ে নিতে পারলে দাম্পত্য জীবনে প্রেমের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। জর্মজেন নাথানের আতিশয্যপূর্ণ একটি মন্তব্যের মধ্যে একটি সত্য রয়েছে—তাঁর মতে গভীর ভালবাসা ও সুষ্ঠু গৃহকর্ম একসঙ্গে কখনই চলতে পারে না। যখন কোন বাড়ি অত্যন্ত সাজানো গোছানো দেখি তখনই আমার ধারণা হয়, আর পরে এই শিক্ষা হয় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসা এক্ষেত্রে বাড়ি সাজানোয় যতটা ব্যয় হয়েছে ; ততটাই মনের দিক থেকে শীতল হয়ে পড়েছে। আবার যে মহিলা স্বামীকে যত বেশি ভালবেসেছেন তিনি আবার সুগৃহিণী হিসেবে ততখানিই ব্যর্থ। মিঃ নাথান একজন অবিবাহিত মানুষ হলেও কিন্তু তার মন্তব্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

৩। উদার হয়ে উঠন :

বিবাহিত জীবনে 'ফিফটি ফিফটি' বা আধাআধির কোন ব্যাপার থাকে না। প্রেমের মূল কথাটি হল নিজেকে স্বামীর কাছে নিঃস্বার্থভাবে উজাড় করে দেওয়া। যে সব স্ত্রী একান্ত বিশ্বস্তভাবে স্বামীর প্রতি অনুরক্ত এবং পার্থিব সুখের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত তারাও আবার সামান্য ব্যাপারে বিভ্রাট ঘটান। সামান্য উদারতার জন্যই এমন ব্যাপার ঘটতে পারে। যেমন স্ত্রীরা অনেক সময় বিয়ের পর স্বামীর পুরনো বন্ধুদের সহ্য করতে পারেন না, তাদের ঈর্ষা করেন।

যদি আপনার স্বামী কখনও বলেন, 'আজ একজন পুরনো বান্ধবীকে দেখতে গিয়েছিলাম'। সেকথা শোনার পর তিনি আপনাকে এখনও ভালবাসেন কিনা জিজ্ঞাসা করা একদম নীচতার পরিচায়ক, এটা সঙ্কীর্ণতা। যদি সেই মহিলাটি স্বামীর পুরনো প্রেমিকা হয়েও থাকেন উদারতার সঙ্গে কথাটা মেনে নিন। দেখবেন স্বামী সেকথা ভুলে যাবেনই।

আমার জীবনের কথা মনে পড়ছে। মার সঙ্গে বিয়ের আগে বাবা একজন মোহময়ী স্বর্ণকেশী তরুণীকে ভালবাসতেন। মা যখন সেই মহিলার প্রশংসা করতেন, লক্ষ্য করে দেখেছি বাবা কত ভদ্র আর নম্র হয়ে উঠতেন। বাবা মনে করতেন মা ওই মহিলার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী আর আকর্ষণীয়া, মা তা জানতেন। তবুও মা বাবার রুচির প্রশংসা করতেন আর বাবা খুবই খুশি হতেন।

৪। সামান্য জিনিসের প্রশংসা করুন :

বিয়ে করেছেন বলেই একজন মানুষ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রশংসা ও ধন্যবাদ কামনা করেন না এ কথা ঠিক নয়। মনোরম কোন সন্ধ্যায় তিনিও ধন্যবাদ আশা করেন। স্বামী স্ত্রী যা করছেন তার সবটাই 'তার অবশ্য করণীয়' মনে করলে এক সময় স্বামী কিছুই করতে চান না। স্ত্রীকে সুখী করার জন্য স্বামী যা যা করেন তার উল্লেখ আর প্রশংসা করা প্রত্যেক স্ত্রীরই কর্তব্য। এর স্বীকৃতি দেওয়া চাই।

আমাদের অনেকেই স্বীকার করি না যে স্বামী প্রতিদিন আমাদের কত সেবা করেন, কত কাজ করে দেন। এর একমাত্র কারণ হল আমরা কাজগুলো স্বামীদের দিয়েই করিয়ে নিতে অভ্যস্ত।

একবার আমি লক্ষ্য করি যে আমার স্বামীকে বেশ অসহায় মনে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও একবার তিনি গ্রীষ্মকালে ইউরোপ গেলে লক্ষ্য করলাম ঘরের ছোট খাটো কতই না কাজ তিনি করে রাখতেন। অথচ এ সবের জন্য কোনদিনই তার প্রশংসা করিনি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনি। এখন তার অনুপস্থিতিতে আমাকেই নিজের হাতে এসব কাজ করতে হচ্ছে।

৫। সুবিবেচক হয়ে উঠুন :

স্বামী যখন জুতো খোলার পর চট করে একটু হালকা হওয়ার চেষ্টা করেন তখন কোন বিবেচক স্ত্রীর সাজগোজ করে বাইরে যাওয়া উচিত নয়। স্বামীর প্রতি গভীর ভালবাসা থাকলে স্বামী কখন কি চান স্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই সেটা উপলব্ধি করতে পারেন। এবং স্বামীর

সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের আলোয় নিজেকে উদ্ভাসিত করে তার কাছে ভালবাসার ফসল আদায় করতে পারেন।

বিয়ের মধুচন্দ্রিমা যাপনের সময় আমার অভিজ্ঞতার ব্যাপারে এটা আমি চমৎকার উপলব্ধি করেছিলাম। আমাদের বিয়ের প্রথম সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম ওকলাহোমা শহরে। সেই সময় আমার স্বামী সপ্তাহ ধরে বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্বভাবতই মধুচন্দ্রিমার সময় কাটানোর জন্য আমি স্বামীর অনুরাগ আর ভালবাসার প্রত্যাশায় ছিলাম। কিন্তু আমার স্বামীর দেখাই পাইনি। তিনি নানা বক্তৃতা, কাজকর্মে এত ব্যস্ত যে আমার কথাটা হয়তো মনে নেই। এদিকে আমি একা হোটেলের ঘরে বসে সময় কাটিয়ে চলেছি। অথচ এজন্য আমি একটু ক্ষুণ্ণ হলেও রাগ করতে পারিনি। স্বামীকে যখন পাই তাকে প্রদর্শনীতে নিয়ে যেতে আমার আপত্তি হয়নি।

আজ আমি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করি। বিরক্ত হয়ে কখনও তিনি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন নি। ভালবাসার আলোয় তিনি আমার জীবন ভরিয়ে দিয়েছিলেন।

একজন স্ত্রীর পক্ষে এ সব কি বিনা প্রচেষ্টায় সম্ভব বলে ভাবেন আপনারা? স্ত্রী আজীবন স্বামীকে গভীর ভালবাসায় পরিপূর্ণ করে রাখেন একথা কি তারা ভাবেন?

হ্যাঁ, আপনি বাজী ধরতে পারেন তিনি সেটা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। আমি এখনও 'এ' গ্রেডে পড়েন এমন কোন মহিলাকে অনাদৃত বা অসম্মানিত হতে দেখিনি। এই মুহূর্তে আমার টেবিলে একখানা চিঠি রয়েছে। চিঠিটি লিখেছেন ব্রিটিশ কলম্বিয়া থেকে মিঃ ওয়ারনেক অ্যাঙ্গাস। চিঠিতে অন্যান্য ভাগ্যবান স্বামীদের কথা বলতে গিয়ে মিঃ অ্যাঙ্গাস নিজের সম্পর্কে লিখেছেন যে তিনি অন্য সব স্বামীর তুলনায় বেশি ভাগ্যবান। তিনি লিখেছেন:

'আমি আমার স্ত্রীর প্রতি গভীরতম সম্ভ্রম আর স্বীকৃতি এই কথা বলে দিতে চাই যে, যদি আমার জীবনের বত্রিশ বছর পিছনে চলে যেতে পারতাম আর বর্তমানে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা যদি বজায়

থাকে, তাহলে পারলে আবার তাকেই আমার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতাম, যদি অবশ্য সেও আমায় গ্রহণ করত। জীবনে আমি যত সাফল্য অর্জন করেছি তার সবেরই মূলে রয়েছে আমার স্ত্রীর প্রেমময় সান্নিধ্য।'

'ভালবাসা অমূল্য সম্পদ। 'ভালবাসা ছাড়া সম্মান ও সম্পদের কোন দাম নেই। আপনার ভালবাসায় যদি আপনার স্বামী প্রকৃত সুখী হন তাহলে জেনে রাখুন আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা আরও বহুগুণ বেড়ে যাবে।

নিচের এই নিয়মগুলো মনে রাখতে চেষ্টা করুন :

১। স্বামীকে উন্নত পর্যায়ের ভালবাসায় পূর্ণ করুন এবং সেটা করবেন,

(ক) আপনার ভালবাসার প্রকাশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে,

(খ) সুরসিকা হয়ে,

(গ) নিজের অনুভূতিতে উদারতা সৃষ্টি করে,

(ঘ) স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে আর প্রশংসা করে,

(ঙ) সুবিবেচক হয়ে উঠে।

মহিলারা দশ সেকেণ্ডে জবাব দেবেন ?

টিক মারুন :—	হ্যাঁ	না
১। আপনি কি জানেন আপনার ভালবাসার মান কতখানি উন্নত ?	☐	☑
২। আপনি কি জানেন একজন যোগ্য স্ত্রী হওয়ার গোপন রহস্য কি ?	☐	☑
৩। আপনি কি সত্যিই একজন সুগৃহিণী ?	☐	☑
৪। আপনি কি জানেন আপনার স্বামীর আয় বৃদ্ধির জন্য আপনি তাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন ?	☐	☑
৫। আপনি কি জানেন স্বামীর ভালবাসা পেতে গেলে আপনার করণীয় কি ?	☐	☑